স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

কমলা দাশগুপ্ত

বসুধারা প্রকাশনী

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজয়ন্ত বসু, বি.এ.,
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিশ্বনাথ দাস

মুদ্রাকর : শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ,
মনোরম প্রিণ্টার্স,
৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

শহীদ দীনেশ মজুমদারের

পুণ্যস্মৃতিকে স্মরণ ক'রে

সেই সব অজ্ঞাত অখ্যাত দেশপ্রেমিককে

অর্পণ করলাম

যাঁরা স্বাধীন ভারত আনতে চেয়ে

'নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে'

নিজ মর্ত সীমা চূর্ণ ক'রে চলেছিলেন।

পরিচিতি

রামমোহন রায়ের সময় থেকে বাংলায় যে রেনেসাঁস বা বহুমুখী নবজাগরণ দেখা দেয়, চিরদিনের ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় বস্তু। একদিকে সে প্রেরণা যোগায় বুদ্ধির মুক্তির (Emancipation of Reason), অপরদিকে সে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে টেনে নিয়ে আসে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাদীক্ষা,—শিক্ষার চেয়েও বড় ক'রে ধরে দীক্ষাকে। সে শিক্ষা, সে-দীক্ষা আচারে অনুষ্ঠানে শত যুগ ধ'রে চাপা পড়েছিল। যে জাতের একদিন দীক্ষামন্ত্র ছিল 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', নিরেট আবরণের অন্তরালে সেই জাতের মানুষের জীবন হয়ে উঠলো একান্ত স্বার্থকেন্দ্রিক। জাত দাসত্ব দুর্গতির অধোবিন্দুতে (nadir) নামলো। তারপর, গত শতাব্দীর নব-জাগরণের দিনে মুক্তবুদ্ধির (emancipated reason) আলোতেও দেখা গেল, ঐ 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র সত্য আজও সত্য—সে এক শাশ্বত সত্য।

জাতের জীবনে এই সত্যের প্রেরণা এল বিগত শতাব্দীর শেষ ও বর্তমান শতাব্দীর উন্মেষণে লেখকের উদ্দীপনায়, কবির গানে, নাট্যকারের ইঙ্গিতে, সন্ন্যাসীর বাণীতে। সেই প্রেরণা ফুটে উঠলো রাজনীতির ক্ষেত্রে পর পর তিনটি আন্দোলনে। এই তিনটি আন্দোলনেরই তুলনা ইতিহাসে খুব বেশী নেই—প্রথম, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন; দ্বিতীয়, বিপ্লবান্দোলন; তৃতীয়, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনের কোনোটিই স্বয়ম্ভু নয়—ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এর

প্রত্যেকটাই বাংলার রেনেসাঁসের সন্ততি। আবার এরা একে অন্যকে উদ্বোধিত করেছে, একে অন্যের কাছে প্রাণ পেয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে মুক্তবুদ্ধিতে জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা উপলব্ধি করলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র। যৌবনে তাঁরাই ছাত্রসমাজে প্রচার করলেন ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনাদর্শ; পরে একদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হোতা হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরাই। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব-জাগরণের মূর্ত প্রতীক, যুগান্তর আন্দোলনের এঁরাই প্রবর্তক, রেনেসাঁস আর বিপ্লবান্দোলনের মাঝখানে সেতু। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসক বিপ্লবান্দোলনের প্রথম নামকরণ করলো anarchism বা নৈরাজ্যবাদ; পরে আখ্যা দিল terrorism বা সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু বিপ্লবকে চিনে যাঁরা সেদিন বিপ্লবের দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা বলতেন, আমরা মরব, জাত জাগবে—আমাদের জীবনদানে জাত প্রাণ পাবে। এ নৈরাজ্যবাদীর ভাষাও নয়, সন্ত্রাসবাদীর ভাষাও নয়—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র শীর্ষস্থানীয় সাধকের কথা। ফলে, আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর এমন সব চরিত্র ফুটে উঠলো—যার তুলনা জগতের যে-কোনো দেশের ইতিহাসের অনুরূপ অধ্যায়ে খুব বেশি নেই।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেমন বিপ্লবান্দোলনের প্রসারে সহায় হ'ল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর চাঞ্চল্যও তেমনি দেশব্যাপী ক্ষেত্র প্রস্তুত করলো মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের। ঋষির দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁর পথের আদর্শ—অহিংসা, আধুনিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের উপায় হিসাবে অহিংসা—নিলেন এক অনাগত অদূর ভবিষ্যৎ থেকে। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপ্লবান্দোলন: দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী মহামতি গোখ্‌লের প্রতিষ্ঠিত Servants of India Society-র মতো অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিপদের দিনে ভারতীয় বিপ্লবীরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে বিপ্লবচেষ্টা করেছে—এ কথা যেদিন প্রকাশ পেল, ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে গেল—আইনের নামে সে রাওলাট আইনের মতো এক ক্রূর অরাজকতা সৃষ্টি করতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর আত্মা শিউরে উঠলো—অন্য সমস্ত কাজ, সংকল্প আর আদর্শ ছেড়ে ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু অসাড় ঘুমন্ত জাতকে জাগাবার জন্যে বিপ্লবীরা পথ ধরেছিলেন ন্যূনতম সংখ্যকের চরমতম দুঃখবরণের; আর, জাগ্রত জাতকে ধাপে ধাপে তৈরী ক'রে তুললেন মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন পথে—প্রথম, মাত্র সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা; দ্বিতীয় স্তরে, বিদেশীর আইন অমান্য; আর শেষ স্তরে, 'ভারত ছাড়ো'—'করব, না হয় মরব'; বহুসংখ্যকের স্বল্পতম দুঃখবরণ থেকে শুরু ক'রে মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে গান্ধীজী সমস্ত জাতকেই মন্ত্র দিলেন—মৃত্যু কিংবা স্বাধীনতা—ঐ 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপ। সমগ্র নির্জিত জগৎই আত্মসম্মানবোধ ফিরে পেল, বেঁচে উঠবার রাস্তা চিনলো।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তার মাত্র চল্লিশ বৎসর, এমন কি, বিশ বৎসর আগেই কে ভাবতে পেরেছিল—পরাধীন দেশে জন্মেছে কিন্তু স্বাধীন দেশে মরবে? আমরা সবাই তো সেদিন ধ'রে নিয়েছিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে কর্মীরা কয়পুরুষ ধ'রে মরবে, জাত জাগবে, জীবনমরণ সংগ্রাম চলবে, তারপর, কোনো এক অজানা ভবিষ্যতে এক অজানা পথে আসবে দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু এ অসম্ভব যে সম্ভব হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বর্তমান জগতের গতি, যোগ্য নেতৃত্ব আর দেশের নবজাগরণের সৃষ্ট চরিত্র।

এমনি কতকগুলি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত—বাঙালী নারী-কর্মীদের চরিত্র। কমলার নিজের জীবন শুরু হয় বিপ্লবদলের কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে। তারপর কয়েকটি বন্ধু ও সহকর্মী মিলে নারীদের ভিতর এমন একটি দল গড়ে তোলেন যার সঙ্গে তুলনীয় দল সে-যুগে অল্পই ছিল। এমন সময় দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল আইন-অমান্য-আন্দোলনের বন্যা। সেই বন্যার মুখে তিনি ভেসে যেতে চাইলেন না, অল্পসংখ্যক সঙ্গীসাথী নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন পরিপূর্ণ আত্মাহুতির সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু এমন আত্মাহুতির লোভ ক'জনেরই বা সেদিন সার্থক হয়েছে? কমলারও হয়নি। বরং দায়িত্ব এসে পড়েছে, নেতৃত্ব নিতে হয়েছে। নেতৃত্ব নিয়ে এক-হাতে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, অপর হাতে বোমা-পিস্তল সংগ্রহ ও বিলি-বণ্টন ক'রে বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এর কিঞ্চিৎ আভাস আছে তাঁর আগে-লেখা 'রক্তের অক্ষরে' বইতে। কিন্তু তাঁর চরম আত্মাহুতি হ'ল যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে এসে অন্য নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাথে মিলে ১৯৩৮ সালে পৃথক বিপ্লবীদলের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিপ্লবীদের সেদিনকার প্রধান যুক্তি হ'ল: কংগ্রেসই যখন সর্বভারতের

বিপ্লবীসংঘে পরিণত হয়েছে, তখন পৃথক দল রেখে আন্দোলনকে খণ্ডিত করব কেন? কায়মন দিয়ে এর পর থেকে কমলা কংগ্রেসের কাজ করেছেন এবং প্রভূত দায়িত্ব নিয়েছেন।

শ্রীমতী কমলার ব্যক্তিগত জীবনের এতটুকু পরিচয় এখানে অবান্তর নয়—কারণ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর দানের ভিতর তাঁরও দান সামান্য নয়; নিজে তিনি লিখতে গিয়ে নিজের দানের উল্লেখ সযত্নে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঈষৎ পরিচয় দেবার মুখ্য উদ্দেশ্য সেটি নয়। উদ্দেশ্য, এই কথাটুকু শুধু বলা যে, তিনি যেমন ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে করেছেন বিপ্লবী-দলের কাজ, তেমনি প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গেই ক'রে গেছেন কংগ্রেসের প্রচার-কাজ এবং তেমনি গঠনমূলক কাজ। সুতরাং তিনি সর্বশ্রেণীর কর্মীর কাজই গভীর শ্রদ্ধা ও দরদ দিয়ে দেখতে পেরেছেন। তিনি ছোট ছোট আলেখ্যগুলি তুলে ধরেছেন যেন এক এক জন নেতা ও কর্মীকে ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দিচ্ছেন। সকলের জীবনের সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নানা কারণে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সে-হিসাবে এ ইতিহাস অসম্পূর্ণাঙ্গ হ'তে বাধ্য।

কিন্তু সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা এবং বিস্ময়ের কথা—এত সংখ্যায় বাঙালী নারী যে স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে আত্মত্যাগের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, একখানি বইতে সেই পরিচয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা চিন্তা করতে গেলে অবাক হয়ে যাবেন। বাঙালী পুরুষদের পক্ষে তাঁরা যা করেছেন, তার অনেকখানি পর্যন্ত তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়,—অনেকখানি অবশ্য আছে, যা চিরদিন ইতিহাসের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে; আর, বাদবাকী অনেকখানি সম্পর্কে এমন প্রশ্নও অস্বাভাবিক হবে না যে, আরও আগে তাঁরা সেটুকু পর্যন্ত করেন নাই কেন? কিন্তু সেকালে আমাদের নারীদের জীবন কি ছিল? শিক্ষিতের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। আর, শিক্ষিত হ'লেই বুদ্ধির মুক্তি হয় না; বুদ্ধির মুক্তি হ'লেই সেবার প্রেরণা, আত্মত্যাগের সংকল্প জাগে না। যুগ যুগ ধ'রে অবরোধের অন্তরালে আমাদের দেশে নারীদের জীবন আর ধর্ম ছিল একান্তভাবে বিশ্বাস, আচার আর অনুষ্ঠান। এর বাইরে আর কিছু মনে আনাও তাঁদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, বুদ্ধিতে ছিল পাপ। দাসত্ব?—সে তো ভগবৎদত্ত, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই একটি অনিবার্য বস্তু। কি পরিবারে,

কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে শুধু মেনে-চলার বাইরে আর যে কোনো বিধিব্যবস্থা হ'তে পারে, আমাদের বাপ-দাদারাই কি তা ভেবেছেন, না, সে কল্পনায় আমাদের উদবুদ্ধ করেছেন? এই পারিপার্শ্বিকের ভিতর গ'ড়ে উঠেও যে বাঙালী নারীরা এত অল্প সময়ে এত সংখ্যায় নানাভাবে দেশসেবার, স্বাধীনতার সাধনার কাজে লেগেছেন, কমলার লেখায় সেই পরিচয় পেয়ে অনেককিছু ভাববার উপাদান পাওয়া যায়, অনেক আশার ভিৎ গ'ড়ে তুলবার মালমশলা পাওয়া যায়।

নারীরাও আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, কথাটা শুনলে—সরলা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সুচেতা কৃপালানী, এমনি দু'পাঁচজনের কথাই আমাদের মনে আসে। কিন্তু এমনি দু'পাঁচজনেই নারীদের দান সমাবদ্ধ থাকলে তেমন বিস্ময়েরও কিছু থাকতো না, খুব একটা আশার ভিৎও গ'ড়ে উঠতো না। কমলা অনেকেরই জীবন কাহিনীর কিছু পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে আরও দিয়েছেন কয়েকটি জেলার মহিলা কর্মীদের এক একটি তালিকা। এ তালিকা যে সম্পূর্ণ এমন মনে করা চলে না। তাছাড়া, শুধু যে কয়েকটি জেলার তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সেই কয়েকটি জেলারই এইসব নাম তিনি দিয়েছেন। এই তালিকাগুলিকে মাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখা সঙ্গত। এতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, বাংলার প্রত্যেক জেলারই বহু নারীকর্মী স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। তার অর্থ, আজ আমাদের সমগ্র নারীসমাজেই কত দ্রুত শুধু বুদ্ধির মুক্তিই শুরু হয় নাই, আত্মত্যাগের আনন্দের আভাসও ছড়িয়ে পড়ছে।

বুদ্ধির মুক্তিতে আত্মত্যাগের দিকে না গিয়ে ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনের দিকেও মানুষ যেতে পারে। আমাদের পুরুষসমাজে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি তাই হয়েছিল। আবার, সার জন অ্যাণ্ডারসনের সন্ত্রাসবাদবিরোধী সংগ্রামের দিন থেকে শুরু ক'রে গত লড়াইয়ের এবং পরবর্তী যুগে আমাদের সমগ্র সমাজে শতাব্দীর প্রথম ভাগের সেই বিরাটত্বের সাধনার, মহত্তর জীবনাদর্শের এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সেই আদর্শনিষ্ঠা, সেই সাধনা, সেই ধৈর্য, সেই স্বপ্নে-ভরা জীবন, সাগ্রহে কঠোরতাকে, ত্যাগকে বরণ ক'রে নেবার সেই প্রতিযোগিতা আজ যেন আমাদের সমগ্র জীবন থেকেই লোপ পেতে বসেছে। কিন্তু এতে নিরাশ হবার কিছু নেই। এ একান্ত স্বাভাবিক। প্রগতি এক সরলরেখাবাহী স্রোত নয়। বাদের প্রতিবাদ হবেই। যা ছিল একদিন

গভীরে, তা-ই ছড়িয়ে যাচ্ছে আজ ব্যাপকে। সেদিনের গভীরের সেই সম্পদ যে একদিন আমাদের সমগ্রের জীবনের একান্ত নিজস্ব বস্তু হয়ে উঠবে এক নতুন বিশ্বসৃষ্টির প্রেরণায়, তারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে গ'ড়ে উঠছেন আজকের আমাদের মা-বোনেরা ; আর, সেই মা-বোনেরা, এই বইয়ে যাঁদের পরিচয় গাঁথা হয়েছে, তাঁদেরই সন্ততি।

ঢাকা

৩০।১২।৫৭

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

ভূমিকা

পরাধীন মাতৃভূমির দাসত্বলেখা ঘোচাতে গিয়ে ভারতের কত নয়নের মণি, কত অন্ধের যষ্টি নিজেদের সোনার সংসার, সুখের নীড় স্বহস্তে ভেঙে ফেলে আপনাকে বিক্ত ক'রে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তার অবধি নেই। ইচ্ছা করে, তাঁদের বেঁধে রাখি জাতির অন্তরের অন্তঃপুরে। আরো মনে হয়, ভবিষ্যতে যাঁরা ইতিহাস লিখবেন তাঁরা উপাদান সংগ্রহ করবেন এবং সেজন্য তাঁদের হাত দিতে হবে গবেষণামূলক কাজেও। কিন্তু আজ যদি কেউ কেউ প্রামাণিক বিবরণ কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রে যান—হোক তা সংক্ষিপ্ত, হোক তা অসম্পূর্ণ—তবে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের পক্ষে কর্মীদের নিজেদের দেওয়া এই তথ্য পেলে হয়তো কিছু সুবিধা হ'তে পারে।

তাই আমার মতো ক্ষুদ্র শক্তির এই অপরিসীম ধৃষ্টতা। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারীর অবদান যতটুকু আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল, তাই ক্ষুদ্র আকারে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং আমার এই লেখা,—যা জীবনচরিতও নয়, ইতিহাসও নয়,—ইতিহাসের কিছু উপাদান মাত্র, উপাদান হিসাবেও অসম্পূর্ণ এবং সেটা কিছু পরিমাণে অনিবার্য। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতো যাঁদের কথা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি, তাঁদের সব কথা সংগ্রহ করতে পারিনি বা সংগ্রহ করেও গুছিয়ে লিখতে পারিনি।—অসম্পূর্ণতা শুধু এটুকুর মধ্যেই নয়। এর আরো একটা দিক আছে, সেটা আরো গুরুতর।

কার্লাইল তাঁর কোনো একটি লেখায় এমনি একটা কথা বলেছেন: ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের অন্তর জুড়ে রয়েছে বড় বড় ঘটনা, বড় বড় মানুষের জীবন-কাহিনী। এই ইতিহাসের ধারাপথে পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের মতো আমাদের চোখের সমুখ দিয়ে চলেছে কত বিরাট ব্যক্তিত্ব, কত যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়, কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত ভাঙা কত গড়া। কিন্তু যে মানুষ প্রথম কোদালখানা তৈরী করেছিল—আমরা জানি না সে কে ছিল, কবে ছিল, কোথায় ছিল। ইতিহাসের পটে তার নাম নেই, আমাদের মনের পটে তার ছবি নেই। কিন্তু সভ্যতা-বিকাশের ক্ষেত্রে সেই মানুষের দান কোনো সাম্রাজ্যের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।······নদীর উপরের ঊর্মিমালাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু এই লীলাচঞ্চল ঊর্মিমালার নীচে যে বেগবান প্রবাহ তা অলক্ষ্য ব'লেই সচরাচর আমাদের অজ্ঞাত। সমাজের জীবনপ্রবাহে এই অলক্ষ্য বেগ সঞ্চার ক'রে চলেছেন যাঁরা, তাঁদের ছবি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরবার কোনো পথ নেই। তাঁরা অখ্যাত, অজ্ঞাত, অনামী।

একথা সমগ্রভাবে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের পক্ষে যেমন সত্য, তার অংশবিশেষ সম্বন্ধেও তেমনই সত্য। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর দানের কথা ভাবতে গিয়ে এই কথাটা বার বার মনে হচ্ছে যে, সেদিনের বিজয়-অভিযানে আমরা দেখেছি শুধু তাঁদের, যাঁরা ছিলেন আমাদের কাছাকাছি, পাশাপাশি বা অন্ততঃ দৃষ্টির সীমার মধ্যে। আমাদের দৃষ্টির নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন তারা ওই অনামী। তাঁদের আলেখ্য স্বতন্ত্রভাবে আমার এই ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে গেঁথে দিতে পারলাম না ব'লে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় সেই অপরিচিত অনামীদের উদ্দেশে আমার সমস্ত অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

'রক্তের অক্ষরে' বই লিখবার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি এই বই লিখতে গিয়েও আমার আত্মবিশ্বাস একেবারেই দানা বাঁধছিল না। কিন্তু আগের বারের মতোই সাহিত্যিকা বাণী রায় আমায় উৎসাহ দিয়েছেন, খুঁটি গেড়ে রেখেছেন যেন আমায় এই বই শেষ ক'রে ঐ খুঁটি পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে। স্নেহভাজন হেমন্ত তরফদার পশ্চাতে থেকে কেবলি বলেছেন—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন, কিছু ভয় নেই। শ্রদ্ধেয় ভূপেনদা (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত) এবারেও আগাগোড়া পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমার মনে সাহস সঞ্চার করেছেন। শ্রদ্ধেয় যাদুদা (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম

দুটো অধ্যায় শুধ্‌রে দিয়ে আমায় শিক্ষা দিয়েছেন ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য রেখে যাবার বিজ্ঞান।

আমি প্রামাণিক বিবরণ রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে যাঁদের কথা লিখেছি সেইসব কর্মীর কাছ থেকেই সোজাসুজি তাঁদের কথা জানতে চেয়েছি সংক্ষিপ্ত আকারে। কেউ মুখে ব'লে গেছেন, আমি লিখে নিয়েছি; কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন, আমি সেসব আমার ভাষায় সাজিয়ে নিয়েছি এবং প্রয়োজনমতো আরো সংক্ষেপ করেছি।

স্থান সংক্ষেপ করবার প্রয়োজনে 'শ্রী', 'শ্রীযুক্তা', 'স্বর্গীয়' প্রভৃতি শ্রদ্ধাবাচক শব্দগুলি বাদ দিয়েছি মনে-মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই।

বর্তমানে আমাদের দেশে সালের ব্যবহার চলেছে তিন প্রকার—খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ। আমি খ্রীষ্টাব্দকে গ্রহণ করেছি সুবিধার জন্য।

এই বই লিখবার রসদ সংগ্রহ করতে অনেকে অনেকভাবে সাহায্য ক'রে আমায় অশেষ ঋণী ক'রে রেখেছেন। তথ্যানুসন্ধানে আমাকে অমূল্য সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছেন ডঃ কালিদাস নাগ, শ্রীসীতারামজী সক্সেরিয়া, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীলীলা রায়, শ্রীআশালতা সেন (এঁরই সাহায্যে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাকিস্তানে অবস্থিত মহিলা-কর্মীদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে), শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি।

'স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী' বই আমি তাঁদের মনে করেই লিখেছি যেসব নারী বাংলাদেশে কাজ করেছেন। তিনি বাঙালী বা অবাঙালী দুই-ই হ'তে পারেন। আবার যেসব বাঙালী নারীর কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ বাংলার বাইরে ছিল, তাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে পারিনি, বইয়ের আকার বেশি বড় করা চলবে না ব'লে। তাই স্বর্গত সরোজিনী নাইডু, শ্রীঅরুণা আসফ আলি প্রভৃতিকে বইতে স্থান দিতে না পেরে আমার রচনা সেদিক থেকেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আমার লেখায় যা কিছু ত্রুটি, যা কিছু অসম্পূর্ণতা—সবকিছুর জন্য আমি মার্জনা ভিক্ষা করি।

১৫ই আগস্ট, ১৯৬০ **কমলা দাশগুপ্ত**

সূচীপত্র

স্বাধীনতা-সংগ্রামে
বাংলার নারী

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা

মর্মভেদী এক নিষ্ঠুর দৃশ্য মহর্ষি বাল্মীকিকে অব্যক্ত বেদনায় অস্থির ক'রে তুলেছিল। তাঁর অমৃত লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল মহাকাব্য—দুঃখসাগরের করুণ ধারায়। স্বতঃস্ফূর্ত সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে যাবার মূলে জেগেছিল এক কাতর স্পন্দন মহাকবির হৃদয়ে। সে হৃদয়স্পন্দন মহাকাব্যের গতিপথে ক্রমে উত্তাল হয়ে, ফেনিল নীল তরঙ্গরাশি নিয়ে এগিয়ে চলল দুঃখসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওপারের আশায়, যেখানে আছে দুঃখসুখের ঊর্ধ্বে এক মহাযাত্রা।

তেমনি পরাধীন ভারতের মুক্তিসাধনার মহাযাত্রায়ও বাংলার নারী ছুটে চলেছিলেন বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু তার পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জীবনে যে দুর্যোগময় তামসী রাত্রি ছিল, তাঁদের সেই অবর্ণনীয় দুর্দশা কয়েকজন মহামানবের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিল এক অসহ্য যাতনা। তাঁরা স্থির হয়ে সে-দৃশ্য সহ্য করতে পারেননি। তাঁদের হৃদয় মন্থন ক'রে জেগে উঠেছিল একটা গতির স্পন্দন। তাঁরা মহাকবি বাল্মীকির মতোই মহাকাব্যের গতি নিয়ে এলেন এদেশের মানুষের পীড়িত লাঞ্ছিত অর্ধাংশের জীবনে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যেপে। সেই গতি তিলে তিলে ক্রমে ক্রমে বেগ থেকে মহাবেগে প্রবাহিত হয়ে আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে অনেকখানি গৌরবের রূপ ধারণ করেছে।

কাজেই বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রাপথে এগিয়ে আসতে বাংলার নারী সহজে বা হঠাৎ পারেননি। অতি ধীর ও কঠিন তাঁদের যাত্রাপথ। তাঁরা ঘন তমিস্রার মধ্য দিয়ে পল গুণে গুণে চলেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বিক্ষুব্ধ আলোড়নের কাহিনী অতি সংক্ষেপে একটু চোখ বুলিয়ে না গেলে, বাংলার নারীর পক্ষে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যাত্রায় যোগদান করা কত যে কঠিন ছিল, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী

ষোড়শ শতাব্দীর 'স্মৃতি'র ব্যবস্থার উপর ছিল তখনকার দিনে বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই অপ্রতিহত গতিতে চলে এসেছিল। এই স্মৃতির ব্যবস্থার মধ্যে আছে —সতীদাহ বিধি, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নারীর মানবিক অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই অধিকার অর্জনের জন্য উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম থেকেই একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩ খ্রীঃ) সেইসময়কার স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক বিষয়ে যা লিখেছেন, তারই একটা অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দিলাম ঃ

> কুলীন ব্রাহ্মণরা তখন বহু বিবাহ করতেন। সারাজীবনের মধ্যে হয়তো স্ত্রীদের এক এক জনের সঙ্গে দু'চারবার মাত্র সাক্ষাৎ হ'ত। স্ত্রীলোকেবা পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন হযে, নানা দুঃখে সারাটা জীবন অতিবাহিত করতেন। যাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ নন অথবা এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করতেন সেখানেও বহু স্ত্রীলোকের দুর্গতির অন্ত ছিল না। রান্না ও শুধুই ঘরের কাজে দাসীর পর্যায়ে তাঁদের রাখা হ'ত এবং সকলের সকল অনুযোগ ও গঞ্জনা তারা সহ্য করতে বাধ্য হ'তেন। অনেক সময়ে সকলের আহারের পর কিছু কিঞ্চিৎ যা পড়ে থাকতো, তাই দিয়েই তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত। দরিদ্র সংসারে তো তাঁদের দুঃখক্লেশের অন্তই ছিল না। আবার ধনীর সংসার হ'লে, স্ত্রীর জ্ঞাতসারে বা দৃষ্টিগোচরে স্বামী বহুক্ষেত্রেই ব্যভিচারে মত্ত থাকতেন। স্ত্রীর মানসিক ক্লেশের অন্ত থাকত না।

রাজা রামমোহনের এই বিবরণ থেকে তখনকার সমাজের একটা দিকের ছবি আমরা পেলাম। সমাজের অন্য দিকটাও কম দুর্বহ ছিল না।

মুসলমান আমল থেকে চলে এসেছিল পর্দাপ্রথা। নারী ঘরের বাইরে বের হ'তে পারবেন না। তাঁরা অসূর্যম্পশ্যা। গঙ্গাস্নান করতে হলেও মেয়েদের পাল্‌কি-সুদ্ধ চুবিয়ে আনা হ'ত।

তখন বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল সর্বব্যাপী। শিশুবয়সে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে, তাদের পরিবারকে একঘরে ক'রে রাখা হ'ত। ঐ শিশুবিবাহকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বলা হ'ত গৌরীদান।

পর্দাপ্রথা ও গৌরীদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আসে অশিক্ষা। বলা হ'ত স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে। তাদের লেখাপড়া শেখা পাপ।

অতএব মেয়েরা রইলেন নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও মূর্খ। বলির পশুর মতো তাদের জীবন। স্মৃতিকার ব'লে দিলেন, তাঁদের কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নেই, পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই, সম্পত্তিতে অধিকার নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ ক'রে সমগ্র শতাব্দী ব্যাপী এই শোচনীয় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। এই সমাজ বিপ্লবের কাহিনীর অতিসংক্ষেপে একটু আভাস দিয়ে যাই।

সেই কোন প্রাচীনকালে কী কারণে যেন ভারতে সতীদাহ নাম দিয়ে নারীবলি শুরু হয়েছিল। অবশ্য সকল নারীই সতীদাহ হ'তেন এমন নয়। কিন্তু ধর্মের নামে এই নারীবলি প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে, মৃত স্বামীর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হ'ত।

শোনা যায়, রাজা রামমোহনের ভ্রাতৃবধূকে সতীদাহ করা হয়েছিল। রুদ্ধ আবেগে ছুটে এসেছিলেন তিনি নারীর জীবনে বেঁচে থাকবার অধিকার দান করতে।

পুস্তিকা লিখলেন তিনি 'সহমরণ ও অনুমরণ। বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তিনি সমাজে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বেন্টিঙ্কের আমলে এই সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ হয়।

রাজা রামমোহনের পরে আবির্ভূত হন আর-এক মহান সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্য, পৌরুষ ও মানবতার মূর্ত প্রতীক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বাংলাদেশ কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, বিধবার বিবাহ দিতে হবে। শাস্ত্রে তার সমর্থন আছে। হিন্দুসমাজ ভয় পেয়ে চীৎকার করতে লাগল। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন প্রধানতঃ তিনজন মানবদরদী মহাত্মা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু। তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই 'বিধবা-বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ হয়।

১৮২৯ সালের 'সতীদাহ নিবারণ আইন' এবং ১৮৫৬ সালের 'বিধবা-বিবাহ আইন' যুগ-প্রবর্তনের দুই সন্ধিক্ষণ। রাজা রামমোহন নারীকে দিয়েছিলেন

জীবনে বেঁচে থাকবার অধিকার। বিদ্যাসাগর নারীকে দিলেন আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই শুধু নন, আমরা পেয়েছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক প্রধান সমাজ-সংস্কারক রূপে। এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তারপর মানবতার পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ শুধু নারীকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই জড়নিদ্রা থেকে, হীনমন্যতা থেকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪ খ্রীঃ) বিধবা-বিবাহ দিতে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, তাঁদের কেউ বিবাহ করতে চান না। জাতিভেদ প্রথা অতি প্রবল। নিজের জাতির গণ্ডীর বাইরে যেতে কেউ রাজী নন। কেশবচন্দ্র বললেন, আমি অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করব। বিবাহ বিবাহই। গণ্ডীর ভিতরে না হ'লে গণ্ডী পার হ'য়ে গিয়ে পরিধি বিস্তীর্ণ করতে হবে। আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের দান এখানে অবিস্মরণীয়। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ সালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অথবা 'তিন আইন'-এর বিবাহ বিধিবদ্ধ করালেন। জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি সেদিন হিন্দুসমাজকে টেনে নিয়ে চললো সামনের আলোকরশ্মির দিকে। তাঁরা সকল জাতির মধ্যে বিবাহের সুফল সমাজকে দেখাতে লাগলেন। এই তিন-আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, বাল্যবিবাহও প্রায় নাই, বহুবিবাহ তো একেবারেই নাই।

সেই অগ্রগতিই পূর্ণ রূপ পেল ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' ও 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন'-এ। এতদিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের দেশের নারী বিবাহ ও সম্পত্তিতে অনেকখানি স্বাধিকার পেলেন।

আবার ফিরে যাই সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের যুগে। বিদ্যাসাগর দেখলেন, কেবলমাত্র সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হ'লেই চলবে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একান্ত প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি জনমনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার জন্য প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর দুই যুগ্ম-সম্পাদক আনতে চাইলেন সমাজে প্রচণ্ড মানসিক বিপ্লব। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ লেখা দিয়ে তাঁরা সমাজকে নাড়া দিতে চাইলেন, সাড়া জাগাতে চাইলেন।

নারী-আন্দোলনের প্রবর্তক এইসব মনীষী উপলব্ধি করেন যে, নারীরা অগ্রণী হয়ে তাঁদের অধিকার বুঝে নেবার প্রচেষ্টায় নিজেরা আত্মনিয়োগ না করলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় সাধারণভাবে নারীজাতির শিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাবের জন্য নারীর মন কুসংস্কারমুক্ত নয়। তাই এইসব যুগপ্রবর্তক মনীষিগণ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের দিকে মনোযোগ দিলেন।

১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন 'বেথুন স্কুল' রামগোপাল ঘোষ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহযোগিতায। বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারি। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা গ'ড়ে উঠবে এই আশঙ্কায বিরুদ্ধবাদীরা চীৎকার করতে লাগলেন—মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে, জাতি যাবে। কুসংস্কারেব এই কঠিন পরিবেশের মধ্যেও কয়েকজন মহাপুরুষ ছিলেন আপন সংকল্পে অটল।

সর্বপ্রথম যাঁরা বেথুন স্কুলে নিজের মেয়েদের স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'সংস্কৃত কলেজ'-এর পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর দুটি মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা দেবীকে তিনি 'বেথুন স্কুল' প্রতিষ্ঠা হবার প্রথম দিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১৮৪৯)। একবছরের মধ্যেই মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়। উইল ক'রে তিনি ত্রিশহাজার টাকা ও নিজের গাড়ীঘোড়া এই স্কুলকে দান ক'রে যান।

১৮৬২ সালে দেখা যায়, ১৫টি স্কুল বেথুন স্কুলের অনুকরণে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ছাত্রীসংখ্যা—৫৩০।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার আন্দোলনে এসে যোগ দেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরম্ভ হয় 'অন্তঃপুর শিক্ষা'র (১৮৬২—৬৩ খ্রীঃ)। অন্তঃপুরে গিয়ে বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র বেথুন স্কুল ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত আরো কতগুলি প্রতিষ্ঠান স্ত্রীশিক্ষা প্রচার এবং সমাজসংস্কার করবার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা ও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের বজ্রমুষ্টির উপর ক্রমাগত চাপ ও আঘাত পড়তে থাকে, ফলে বজ্রমুষ্টির কাঠিন্য ক্রমেই শিথিল হয়ে এল। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করছি: (১) সমাজোন্নয়ন বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), (২) সর্বশুভকরী সভা (১৮৫০), (৩) ব্রাহ্মবন্ধু সভা (১৮৬২),

(৪) বামাবোধিনী সভা ও পত্রিকা (১৮৬৩, ১৮৬৪), (৫) উত্তরপাড়া হিতকরী সভা (১৮৬৪), বরিশাল মহিলা উন্নয়ন সমিতি (১৮৭১), (৭) বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), (৮) ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ (১৮৮০ অথবা ১৮৮১), (৯) ত্রিপুরা জেনানা শিক্ষা সমিতি, (১০) বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা, (১১) মৈমনসিংহ সম্মেলন, (১২) ভিক্টোরিয়া স্কুল (১৮৮২), (১৩) ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (১৮৯০), (১৪) নিবেদিতা বিদ্যালয় (১৯০৩), ইত্যাদি।

এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে ক্রীশ্চান মিশনারীদের দানও কম নয়।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় এক একটি ক'রে সমিতি গ'ড়ে ওঠে এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে কাজ ক'রে যায়।

সাধারণ ঘরের হিন্দু বা ব্রাহ্মদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াতে ও উচ্চশিক্ষা দিতে সাহস করতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সগৌরবে আপন শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন।

১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল ইউনিভার্সিটির সেনেট এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, ছাত্রীরাও ইউনিভার্সিটি-পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পাবার এক বিরাট বাধা দূর হয়ে যায়। বেথুন স্কুল সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হয়। বেথুন স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিভাগের নম্বর থেকে মাত্র একনম্বর কম পান তিনি। তার আরো বেশী অধ্যয়ন করবার স্পৃহা জাগে। গভর্নমেণ্ট বেথুন স্কুলে কলেজ-ক্লাস খুললেন। ১৮৮০ সালে অবলা দাস (লেডি বসু) এনট্রান্স পাস ক'রে স্কলারশিপ পান। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে চেয়ে দরখাস্ত করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন না, তীব্র আপত্তি জানালেন ও প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি একটা উদার দৃষ্টির পরিচয় দেন। তাঁরা অবলা দাসকে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়তে অনুমতি দিলেন।

বেথুন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বি.এ. পাস করেন। ঐ সালেই ব্রাহ্মনেতা দ্বারিক গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাদম্বিনী বসুর বিবাহ হয়। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে অনুমতি চাইলেন। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ এবার এক প্রস্তাব পাস ক'রে তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনিই এখানকার

প্রথম ছাত্রী। তাঁর পরে আসেন বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মিত্র। শ্রীমতী মিত্র ১৮৮৮ সালে মেডিকেল কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। নারী ধীরে ধীরে আপন সুপ্ত শক্তি প্রকাশ করবার পথ খুঁজে পেলেন।

১৮৯০ সালে তিনটি মেয়ে ইংরাজি বিষয়ে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। তাঁদের মধ্যে সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরানী) ছিলেন অন্যতম। রাজনীতির বীজ তখন সুপ্ত ছিল এই মহীয়সী নারীর মধ্যে। পরবর্তী জীবনে এই নারী সমগ্র জাতিকে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যেমন একদিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫ খ্রীঃ) এবং সমগ্র ঠাকুর পরিবারের দান বাংলাদেশের নারী-সমাজকে অনেকখানি অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল।

ঠাকুর পরিবার পাশ্চাত্ত্যের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি। তাঁরা নারীকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে সুখী ছিলেন না। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নারীকে পুরুষের সমান স্তরে উঠিয়ে এনে, আনন্দের সমান অংশ দিতে, জীবনে মানুষের যোগ্য হয়ে বেঁচে থাকবার ও বিকাশ লাভ করবার প্রেরণা দিতে চাইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্রকন্যা ও বধূগণ এই আন্দোলনকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলেছিলেন।

যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও বধূদের গঙ্গাস্নান করতে হলেও পাল্‌কি-সুদ্ধ গঙ্গায় চুবিয়ে আনা হ'ত, সেই ঠাকুর পরিবারের বৌ হয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বহু বিঘ্ন পার হয়ে বিলাত যান। পাল্‌কিতে ক'রেই তাঁকে জাহাজ পর্যন্ত উঠতে হয়েছিল।

বাঙালী মেয়েদের তখনকার দিনের পোশাক ছিল কেবল একটিমাত্র শাড়ী। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন ঐ পোশাকে ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না। স্বামীর অনুরোধে ও আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গুজরাটী মহিলাদের অনুকরণে সভ্য ও সুন্দর পরিচ্ছদ প'রে দেশে ফিরলেন। "দেশীয়তা, শোভনতা ও শালীনতা" এল বাঙালী নারীর পোশাকে।

এই পরিবারের সব মেয়ে ও বধূরা লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। অবরোধ-প্রথা অতি ধীরে ধীরে অপসৃত হ'তে আরম্ভ করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন "শত শত ইংরেজ মহিলার মধ্যে গিয়ে প্রকাশ্য স্থলে বসতেন" তখন

ঐ পরিবারেরই গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিরা রাগে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যখন দুটি আরবী ঘোড়ায় চ'ড়ে গড়ের-মাঠে বেড়াতে যেতেন তখন পথের দু'ধারে লোকে কৌতূহলে ও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতো।

ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে নারী-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার এসেছিল তারই তরঙ্গমালা এই পরিবারের সীমা অতিক্রম ক'রে দুই কূল ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

এইভাবে কঠিন প্রয়াসে স্ত্রীশিক্ষার ও নারী-জাগরণের ধারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, যদিও সে-গতি তখনও সতর্ক, ধীর, বিলম্বিত। ওদিকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, জাতীয়তাবোধ, একতা এবং জাতীয় উত্থানের আকাঙ্ক্ষা নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর মনে জেগে উঠতে থাকে।

আর একদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় পাশ্চাত্ত্য সমাজে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে ফিরে এলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদের মাধ্যমে সমাজসংস্কার, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক প্রেরণা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নতুন প্রাণ, নতুন চেতনার সঞ্চার করে। তিনি বলেন—"হে ভারত, পরানুকরণে ও দাসসুলভ দুর্বলতা সম্বল ক'রে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে? মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না।" বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য জীবন্ত জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষ যেন সমান গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তাঁর সন্ন্যাসের আদর্শে "ব্যষ্টিমুক্তি ছেড়ে সমষ্টিমুক্তির আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে লাগল"। দুর্বল জাতিটাকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? ... তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নতুন ভারত বের হোক্। বের হোক্ লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে, মালো, মুচিমেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বের হোক্ মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বের হোক্ কারখানা থেকে, হাটবাজার থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে। ... এরা একমুঠো ছাতু

খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। ... এই সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, একটি সামান্যতম মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত। এই প্রচণ্ড আত্মত্যাগের প্রেরণা, তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য আকুল আহ্বান দেশটাকে সেদিন প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। নবচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ নারীও সেই জাগরণে সাড়া দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী তখন শেষপাদে এসেছে। কিন্তু পর্দার প্রচণ্ড বাধা তখনো তাকে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে, তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

উচ্চশিক্ষার প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলার নারী ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রচেষ্টায় কঠিন লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলে দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতার বিজয়-অভিযানে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিংশ শতাব্দী

[১৯০৫—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। এ কথাটা শুনতে এখন আর তেমন নতুন, তেমন উত্তেজনাময় লাগে না। কিন্তু এমন একটা সময় গেছে যখন শুধু ঐ স্বাধীন ভারত আনবার জন্য জাতির মর্মে মর্মে জেগেছিল আত্মাহুতি দেবার নীরব সাধনার দৃঢ় সংকল্প। তাদের কাছে স্বর্গের থেকেও অধিক প্রিয় স্বাধীন জন্মভূমি। এঁদের মধ্যে আবার এমন একদল ছিলেন যাদের লোকে বলত পাগল, ক্ষ্যাপা। তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিজেদের নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে 'স্বাধীন ভারত' আনবার পথ সুগম করতে চেয়েছিলেন।

কত ফাঁসী, কত দ্বীপান্তর, কত জেল, কত তিলে তিলে নির্যাতন সহ্য করা, কত বেত আর বেটনের প্রহার, ঘোড়ার পায়ের নীচে কত পিষ্ট দলিত হওয়া, বুলেট ও বিভলভারের সামনে গিয়ে নিজের বুক পেতে দেওয়া, এরোপ্লেন থেকে গুলী-বর্ষণের সামনে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া—এসবই রয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের ভিত্তির নীচে গাঁথা। সেই ভিত্তি গ'ড়ে তুলেছেন বহু অজ্ঞাত, অখ্যাত সৈনিক।

ঐ সমস্ত বীরদের মধ্যে নবজাগ্রত নারীদেরও একটা গৌরবময় অংশ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কার ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল। শত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে নারী-প্রগতি যতই বিস্তৃতি লাভ করে ততই নারী-সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তাঁদেরি মধ্য থেকে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক গগনেও। ক্রমে পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা দেশমাতৃকার ললাট থেকে মুছে ফেলতে তাঁরাও কৃচ্ছ্রসাধনায় যোগদান করেন অধিকতর সংখ্যায়। দেশের লোক সবিস্ময়ে দেখল, নারী যেমন আপন শক্তিতে সমাজে নিজেদের আসন ক'রে নিচ্ছেন, অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে নিচ্ছেন, তেমনি তাঁরা দায়িত্বও গ্রহণ করছেন। দেখতে দেখতে তাঁরা সমাজের চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালেন। ভারতের স্বাধীনতা-

সংগ্রামের ভিতর দিয়েও নারী নিজেদের কেমন ক'রে বিকশিত ক'রে তুলেছিলেন, সে কাহিনী স্মরণীয়।

মানসিক ও সামাজিক বিপ্লবের সুযোগ পেয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে বেরিয়ে এলেন প্রথম নারী, প্রতিভাশালিনী সরলা দেবী চৌধুরানী। কেবলমাত্র নারী-মহলে নন, সমগ্র জাতিরই তিনি সেদিন একজন অগ্নিবাহিকা নেত্রী।

ওদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও দেশপ্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভগিনী নিবেদিতা এসে যোগদান করলেন অরবিন্দের বিপ্লবী দলে ১৯০৩ সালের গোড়াতেই। ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর অমূল্য দান চিরস্মরণীয়। প্রতিভা ও হৃদয়ের সমন্বয়ে অপূর্ব তেজোময়ী এই নারী। শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বামী বিবেকানন্দ একসময় নিজেই নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে এই দেশ চিনিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিবেদিতা আইরিশ মেয়ে ব'লেই এত সহজে ভারতবর্ষকে আপন দেশের মতোই সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালবাসতে শিখেছিলেন। কারণ আইরিশরা ছিল ইংরেজ-বিরোধী এবং নিবেদিতা ছিলেন নিজের দেশে বিদ্রোহী দলের মেয়ে। কাজেই তাঁর স্বদেশপ্রেম পরিণত হ'ল ভারতবর্ষের দেশপ্রেমরূপে।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন "সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ" ছিলেন তাঁর স্বদেশপ্রেম প্রচার করতে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিটা জাগ্রত হোক, এ জাতির লোক মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে উঠুক। নিবেদিতা গুরুর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে এই পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করার প্রয়াসের ভিতর অসামান্য কীর্তি রেখে গেছেন।

নিবেদিতার পরিচয় হয় ঠাকুর-বাড়ী, সরলা দেবী ও বালিগঞ্জের কয়েকজন ইংরেজ শাসনে অসহিষ্ণু তেজস্বী লোকের সঙ্গে। এর মধ্য থেকে একটা গুপ্ত-সমিতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তাতে ব্যারিস্টার পি. মিত্র এবং নিবেদিতা সংযুক্ত ছিলেন।

সরলা দেবীর শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর শক্তি, সাহস ও বীর্য সংগঠনের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন বোম্বাইয়ে তাঁর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (I.C.S.) কাছে যান তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে।

অন্যদিকে ১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) বরোদায় যান। তিনি বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনবার স্বপ্ন দেখতেন। অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে তিনি বরোদার সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদায় অধ্যাপক ছিলেন এবং সেখানে ভাবুকের মতো অবসর সময় অতিবাহিত করতেন। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়লেন তিনি বিদ্বান, দেশপ্রেমিক ও গুপ্ত-সমিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এক চিন্তাশীল যুবকরূপে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে বাংলাদেশে গিয়ে কর্মক্ষেত্র তৈরী করতে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিতে লাগলেন। তারপর অরবিন্দ বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে রাজী হন। অরবিন্দ ঘোষ তার আগে ঠাকুরসাহেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে গুজরাটের গুপ্ত-সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

ওদিকে বিবেকানন্দের তিরোধানের পর, নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে নিবেদিতা গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় যান। এখানে পরিচিত হন তিনি অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। নিবেদিতা অরবিন্দকে উপহার দিলেন বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'। তিনি বালিগঞ্জের গুপ্ত-সমিতির খবরও তাঁকে দিলেন। এই সাক্ষাতেই অরবিন্দ ও নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য একত্রে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিবেদিতা কথা দেন যে, অরবিন্দের পাশেই তিনি দাঁড়াবেন।

বরোদা থেকে চলে আসবার পর নিবেদিতা সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষ পর্যটন করতে করতে যেন আগুন ছড়িয়ে চললেন। তাঁর মাদ্রাজে বক্তৃতার ফলে ১৯০৩ সালে নিবেদিতাকে বেলুড়-মঠের সঙ্গে সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়। কারণ তিনি বেলুড়-মঠ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করলে মঠকে রাজরোষে পড়তে হ'ত।

১৯০২ সালের শেষদিকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেন সরলা দেবীর কাছে, যাতে সরলা দেবী তাঁকে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে সহায়তা করেন। সরলা দেবী তা করেছিলেন। কলিকাতায় এসে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আলাপ ও যোগাযোগ হয়।

১৯০৩ সালে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দকে নিয়ে উঠলেন শ্যামপুকুরে

বিপ্লবের অগ্নিহোত্রী যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে। সেখানে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) পরিচয় ঘটে।

এরপর বাংলায় যখন বিপ্লবীকেন্দ্র সুদৃঢভাবে স্থাপিত হয় তখন তাতে এসে যোগদান করেন বারীন ঘোষ, দেবব্রত বোস, নলিন মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর (মারাঠী যুবক), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভাই) প্রভৃতি। নিবেদিতা তাঁদের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেন। সখারাম শিক্ষা দিতেন অর্থনীতি। সখারাম লিখেছিলেন 'ঝাঁসীর রাণী', 'বাজীরাও' এবং 'দেশের কথা'। 'দেশের কথা' বইয়েব মধ্যে এদেশের অর্থ নৈতিক দুর্গতির ইতিহাস.প'ড়ে যুবকেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আরো ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতেন।

বহু পত্রিকা ও কাগজে নিবেদিতা জ্বলন্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই জানা যায় যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে যায়। হাজাব হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ সুরেন্দ্রনাথের আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনের আগুন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত বাংলাদেশ ক্ষেপে ওঠে। নেতাগণ বিদেশী জিনিস বর্জন ও স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করতে জাতিকে আহ্বান করেন। স্বদেশী আন্দোলন শহর থেকে গ্রামের মধ্যে বিস্তার-লাভ করে।

অরবিন্দের গুপ্ত-সমিতি কাজ ক'বে চলেছে। নিবেদিতার বাগবাজারের বাসা তখন গুপ্ত-সমিতির একটি কেন্দ্র। ছেলেদের শোনাচ্ছেন তিনি বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান: "তোমার দেবতা চায় আজ তোমার জীবন-বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।"

এই বিপ্লবের আহ্বানে তরুণদল উৎসাহে সাড়া দিয়ে উঠলেন।

ওদিকে স্বদেশী-পণ্য-উৎপাদনে জোয়ার এসেছে। দেশলাই, সাবান, কাগজ, কালি, চরকার সুতো প্রভৃতি প্রচলিত হ'তে থাকে।

১৯০৫ সালে বিপিন পালের চরমপন্থী প্রতিষ্ঠান 'স্বদেশী মণ্ডলী' স্থাপিত হয়েছে। ঐ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স (পরে রাজা পঞ্চম জর্জ) কলকাতায় আসেন, তার পূর্বেই 'স্বদেশী মণ্ডলী' তাঁর অভিনন্দন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ সালে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে কলিকাতায় চলে এসে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ঘটনাস্রোত দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চললো।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল-সম্মেলনে অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করলেন ছোটলাট ফুলার-এর দমননীতির প্রচণ্ড রূপ। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করবার জন্য চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে পুলিস নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং পুলিসের অত্যাচারে সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

বরিশাল থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ নিবেদিতার কাছে নিজের সংকল্প ব্যক্ত করলেন। "ফুলার হত্যার আয়োজন চললো যুগান্তরের আড্ডায়"। অরবিন্দ প্রবন্ধ লিখে চলেছিলেন সক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে 'বন্দে মাতরম' কাগজে।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে 'যুগান্তর'-এর একটি প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 'বন্দে মাতরম্' কাগজে অরবিন্দ লিখলেন "আরো অত্যাচার চাই"। নিবেদিতার উপর পুলিসের কড়া নজর লক্ষ্য ক'রে তাঁর হিতৈষিগণ তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে গেলে দেশের কাজ কিছু করতে পারবেন না। বরং কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে গেলে, সেখান থেকেও এদেশের জন্য অনেক কাজ তিনি করতে পারেন।

সেই কথা অনুসারে, নিজের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুই বছরের জন্য নিবেদিতা ১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯০৭ সালে 'বন্দে মাতরম্' কাগজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে রাজদ্রোহের। অরবিন্দ বিচারে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করাতে বিপিন পালের হয় ছয়মাসের কারাদণ্ড।

কিংসফোর্ড-এর ঐ আদালতে বিপিন পালের দণ্ডাজ্ঞার দিনে যে ভীড় হয় তাকে দমন করবার জন্য সার্জেণ্টরা বেটন চার্জ করে। চৌদ্দবছরের বালক সুশীল সেন মার খেয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্টকে প্রহার করে। তার ফলে

মামলা রুজু হয় এবং বালক সুশীল সেনকে বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন এবং বিচারাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন "পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও দুর্জয় সাহসের জীবন্ত বিগ্রহ"। উল্কার ন্যায় তাঁর আবির্ভাব ও মৃত্যু।

ওদিকে মানিকতলায় মুরারীপুকুর বাগানে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন চলেছে। ১৯০৬ সালের জুন মাসে ছোটলাট ফুলারকে হত্যার জন্য আক্রমণ করা হয়। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ছোটলাট ফ্রেজার এর ট্রেন ধ্বংস করবার জন্য লাইনের উপর বোমা ফাটে। "পশ্চাতে নায়ক অরবিন্দ"। তিনি নিজে কিন্তু তখন যথাক্রমে কলিকাতায় শিবাজী উৎসবে ও মেদিনীপুর রাজনৈতিক কনফারেন্সে জনসভায় উপস্থিত। গা ঢাকা দেবার অতিসুন্দর কৌশল।

গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকে গুলী করা হয় ১৯০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। চন্দননগরে মেয়রের উপর বোমা পড়ল। ১৯০৮ সালে ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড এর উপর বোমা ছুঁড়তে গিয়ে কিশোর দুই বালক ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ভুল ক'রে দুজন ইংরেজ মহিলা—মিসেস কেনেডি ও তার কন্যাকে নিহত ক'রে ফেলেন। শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু বরণীয়—এই আদর্শ নিয়ে প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলীতে আত্মবলি দিলেন। অরবিন্দ প্রভৃতি ৪৭ জন গ্রেপ্তার হন আলিপুর বোমার মামলায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবার ফলে তিলকের ছয়বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হয়। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয় ১৯০৮ সালের ১১ই অগাস্ট। ১৯০৮ সালের ৩১শে অগাস্ট আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু। কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসী হয় যথাক্রমে ১৯০৮ সালের ১০ই এবং ২১শে নভেম্বর। কলিকাতা ওভারটুন হল্-এ ১৯০৮ সালের ৭ই নভেম্বর ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হয়। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর পুলিস-অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করা হয়।

অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় একবছর বিচারাধীন অবস্থায় কারাবাসে থাকার পর মুক্তি পান ১৯০৯ সালের ৬ই-মে তারিখে। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেক বিপ্লবীর

কঠিন সাজা হয়। ১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর তাঁদের আপিলের রায় প্রকাশিত হয়।

নিবেদিতা আর বাইরে থাকতে পারলেন না। তিনি ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। তাঁর কলিকাতা আসার কিছুদিন আগেই অরবিন্দ মুক্তি পেয়েছিলেন। অরবিন্দ ও নিবেদিতার পুনরায় সাক্ষাৎ হ'ল। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করলেন—"জেলে একবছর কি ক'রে কাটালেন?" অরবিন্দ জবাব দিলেন—"যোগের অনুশীলন করেছিলাম। গীতার সাহায্যে যোগ আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম।"

অরবিন্দ কাগজ প্রকাশ করেছেন 'কর্মযোগিন্' ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন। 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' এই দুইটি পত্রিকা অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করত।

বীরেন দত্তগুপ্ত হাইকোর্টে ডেপুটি পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলমকে হত্যা করার পর নিবেদিতা খবর পেলেন অরবিন্দকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নির্বাসনে পাঠাবে। লিজেল রেমঁ (Lizel Reymond) লিখিত নিবেদিতার জীবনীতে আছে যে, নিবেদিতা অরবিন্দকে ইংরেজ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দেন।

অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্'-এর সমস্ত ভার নিবেদিতার হাতে তুলে দিয়ে চলে যান চন্দননগরে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পণ্ডিচেরি পৌঁচেছিলেন তিনি ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল। তারপরই 'কর্মযোগিন্'-এর শেষ সংখ্যায় নিবেদিতা তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে পলাতক অরবিন্দের আসল ঠিকানা প্রকাশ ক'রে দিলেন।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা দার্জিলিঙে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বহু নারী নীরবে সকলের অলক্ষ্যে আন্দোলনকে সাহায্য করে গেছেন। একেবারে সামনে এসে প্রত্যক্ষ কাজ তাঁরা না করলেও এই নীরব দানের মূল্য সেদিন কম নয়।

তারই পর এল ১৯১৪ সালের অগ্নিযুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু হয়।

বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল ইংল্যাণ্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে

ভারতবর্ষে অভ্যুত্থান ঘটানো। সে কথা পরে বলছি। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্বে কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড যা সেসময়ে সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি ঘটনার কথা প্রথমে ব'লে নিই।

১৯১৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে বিপ্লবীদের একটি গোপন আশ্রয়স্থলের সন্ধানে গিয়ে গোয়েন্দা-পুলিস নীরোদ হালদার নিহত হয়। এই গোপন আশ্রয়স্থলে তখন নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় রায়, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন ও নরেন ভট্টাচার্য (বিপ্লবী এম এন. রায়) ছিলেন।

১৯১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে হেদুয়ার কাছে গোয়েন্দা-পুলিস ইন্সপেক্টার সুরেশ মুখার্জীকে নিহত করা হয়। তাঁর সঙ্গী ইন্সপেক্টার বনবিহারী মুখার্জী একটা চায়ের দোকানে টেবিলের নীচে ঢুকে বেঁচে যায়।

ঐ সালের ২১শে অক্টোবর মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের একটি ঘটনায় সাব-ইন্সপেক্টার গিরীন ব্যানার্জী নিহত এবং উপেন চ্যাটার্জী আহত হয়।

৩০শে নভেম্বর সার্পেণ্টাইন লেনে এক স্পাই এবং এক কনস্টেবল্‌কে নিহত করা হয়। ১৯১৬ সালের ৪ঠা অগাস্ট সালকিয়ায় দুজন বিপ্লবীর সঙ্গে পুলিসের গুলী-বিনিময় হয়। সতীশ চক্রবর্তী ও যুগল দত্ত গুলী চালাতে চালাতে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে পড়েন। যুগল দত্ত গ্রেপ্তার হন।

১৯১৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি পুলিস সাব-ইন্সপেক্টার মধুসূদন ভট্টাচার্য মেডিকেল কলেজের সামনে নিহত হয়।

অর্থের প্রয়োজনে বিপ্লবীরা তখন কয়েকটি ডাকাতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মধ্যে দুই-একটি ঘটনা উল্লেখনীয়। ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন রায়) প্রভৃতি দিনে-দুপুরে খিদিরপুরে গার্ডনরীচ-মোটর-ডাকাতি ক'রে বার্ড কোম্পানির ১৮ হাজার টাকা হস্তগত করেন। এখানে বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজের নিকট থেকে ডাকাতি-করা এই প্রথম এবং মোটর ব্যবহারও এর আগে কখনো হয়নি।

আর একটি ডাকাতির ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বিপ্লবীরা সেই টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ ক'রে টাকার মালিককে চিঠি দিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং দেশ-স্বাধীন-ব্রত সফল হ'লে সেই টাকা সুদসমেত পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে ১৯১৬ সালের ২৬শে জুন গোপীনাথ রায়

লেনে। ডাকাতির পর ঐ বাড়ির মালিক বাংলায় লেখা একটি চিঠি পান। চিঠিটা নিম্নরূপ ঃ

"নং ২২৫০

বন্দে মাতরম্

স্বাধীন যুক্ত ভারতরাজ্যের বাংলা শাখা।

সসম্মানে বিনীত নিবেদন,

মহাশয়গণ, আমাদের ছ'জন স্বয়ংসেবক কর্মচারী আপনাদের কাছ থেকে ৯৮৯১৲ টাকা কর্জ নিয়ে আসেন এবং ঐ অর্থ উপরোক্ত আফিসে জমা দেওয়া হয়েছে আপনাদের নামে। শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক সুদ দেওয়া হবে। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা কৃতকার্য হ'লে (দেশ-স্বাধীন হ'লে) আপনাদের সুদ সমেত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হবে।

(স্বাক্ষর) বলমগু

Finance Secrotary to the Bengal Branch of
Independent Kingdom of United India"

এবারে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার কথায় আসা যাক। বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল ১৯১৪ সালে ইংরেজ ও জার্মানির মধ্যে। জার্মানদের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে ভারতীয় বিপ্লবীরা ইংরেজকে এদেশে আঘাত হেনে স্বাধীনতার রাস্তা প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। জার্মানির সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার শর্ত ছিল যে, বিপ্লবীরা জাতীয় ঋণ হিসাবে জার্মানির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন। এবং বিপ্লব সফল হ'লে, স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট সেই অর্থ পরিশোধ করবেন। জার্মানি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং তাঁদের বিদেশীয় রাষ্ট্রদূতগণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করবেন। জার্মান সামরিক অফিসারগণ শ্যামদেশে এসে ভারতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তাঁরা বর্মার ভিতর দিয়ে ভারতে অভিযান করবেন। কিন্তু কোনো জার্মান সৈন্য ভারতভূমিতে পদার্পণ করবেন না। বিদেশের সঙ্গে এইসমস্ত ব্যবস্থা এবং আয়োজনের ভার ছিল যাদুগোপাল মুখার্জীর উপর।

ব্যবস্থা হয়েছিল যে, 'অ্যানি লার্সেন' নামে একখানা জাহাজ ত্রিশহাজার রাইফেল, সেই অনুপাতে গুলী এবং অর্থ নিয়ে আমেরিকা থেকে সকড়ো দ্বীপে যাবে। এবং সেখানে গিয়ে 'মাভেরিক' নামে এক জাহাজে ওগুলি তুলে দেবে। 'মাভেরিক' জাভা ঘুরে ব্যাটাভিয়াতে যাবে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষে আসবে।

বিপ্লবের আয়োজনে উত্তর ভারতবর্ষের সৈনিক-বিদ্রোহ ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার নেতৃত্ব ছিল রাসবিহারী বসুর উপর। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিরাট বিপ্লবের ও কলিকাতার ফোর্ট দখল করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর উপর। বাংলার কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবীরা নির্ভর করেছিলেন প্রধানতঃ জার্মানির অস্ত্রশস্ত্রের উপর।

বিদেশীদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'মাভেরিক' আর অস্ত্র নিয়ে পৌঁছাতে পারল না। ঘটনাটা পরিষ্কার ক'রে বলি। ভারতীয় বিপ্লবীরা যেমন জার্মানির সাহায্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তেমনি চেকোস্লোভাকরাও আমেরিকায় গিয়েছিলেন ইংরেজ এবং ফরাসীর সাহায্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে। এমনিভাবে পৃথিবীর বহু দেশের বহু বিপ্লবী তখন গেছেন আমেরিকাতে আপন আপন দেশ স্বাধীন করবার প্রচেষ্টায়। আমেরিকাতে ভারতীয় এবং চেকোস্লোভাকীয় বিপ্লবীদের আদর্শ এক ছিল ব'লে তাঁরা একে অন্যের কার্যাবলী জানতেন। চেকোস্লোভাকরা ইংরেজ এবং ফরাসীকে খুশী করতে গিয়ে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর ফরাসীদের জানিয়ে দেন। ফরাসীরা ইংরেজকে জানান। এইভাবে চেকোস্লোভাকদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সমস্ত খবর ইংরেজ জেনে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গেই 'অ্যানি লার্সেন'-এর সকল অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকাতেই ধরা প'ড়ে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে যায়। অন্যদিকে ভারতে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলির উপর ইংরেজ নির্মমভাবে আঘাত হানতে শুরু করে। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে নিহত হলেন ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। দেশময় ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অত্যাচার আরম্ভ হ'ল। ওই খণ্ডযুদ্ধের মামলার সময় বিহার-উড়িষ্যার পুলিসের ডি.আই.জি. রাইল্যাণ্ড যতীন মুখার্জীর লেখা একখানি খাতা দেখে বলেছিলেন—"এই মানুষটি বেঁচে থাকলে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় হ'তে পারতেন।"

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মৃত্যুর পরেও দেশে বিপ্লব আনবার একটা বিপুল চেষ্টা চলেছিল। তার নেতৃত্ব ছিল যাদুগোপাল মুখার্জীর উপর। সেই যুগের সেই ভয়ঙ্কর কঠিন প্রয়াস বাইরে থেকে দেখতে ব্যর্থ মনে হ'লেও, বারে বারে ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জাতি এগিয়ে চলেছিল। মহা গৌরবময় ছিল সে ব্যর্থতা। কত যে বীরের ফাঁসী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হাসিমুখে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া—তার অন্ত ছিল না। প্রভাব ছিল এর বহুদূরব্যাপী। যতীন

মুখার্জী বলতেন, "আমরা মরব, জাতি জাগবে।" দেশ অসীম শ্রদ্ধায় বিপ্লবীদের এই সাধনাকে নির্বাক সমর্থন জানিয়েছিল।

বাংলার মেয়েরা তখনো সামনে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদান করেননি। নেপথ্যে থেকে ভাইদের, স্বামী-পুত্রদের দুঃসাহসিক যাত্রার অনেকখানি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁদেরি মধ্যে দুই-একজন দুঃসাহসিক নারী বিদেশী শাসকদের রক্তচক্ষুকে নিঃশঙ্কচিত্তে উপেক্ষা ক'রে প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দিয়েছিলেন। হাসিমুখেই সকল দুঃখ নির্যাতন বরণ ক'রে নিয়ে তাঁরা ভবিষ্যতের মেয়েদের জন্য পথের নিশানা তৈরী ক'রে গেছেন। এমনি নারী ছিলেন ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবী। ননীবালা দেবী ছিলেন বাংলার একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ননীবালা দেবীর যুগ এবং মাতঙ্গিনী হাজরার যুগ এক নয়। ননীবালা দেবীর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই সময় যখন সমাজের লৌহশৃঙ্খল ছিল কঠিনভাবে বাঁধা নারীর হাতে ও পায়ে। তাকে নিজ শক্তিতে ভেঙে নিজে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন তিনি দুদম তেজে। এই যাত্রা উদ্‌যাপিত হয়েছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে গিয়ে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে মাতঙ্গিনী দেবীর চরম আত্মদানের মধ্য দিয়ে। ভারতের নরনারী উভয়েই তখন জাগ্রত, উদ্বেলিত। এঁদের একজন এই দীর্ঘ ও ভয়ংকর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রারম্ভের ও আরেকজন পরিণতির প্রতীক।

অগ্নিযুগের এই অধ্যায়ের পর ১৯২১ সালে দেখা দেয় অসহযোগ আন্দোলন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারীর যোগসূত্র ক্রমেই দৃঢ় হ'তে থাকে। ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৯ সালের বোম্বাই অধিবেশনে সর্বপ্রথম ভারতীয় নারী যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকে যান ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৯০ সালের কলিকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিকে একটি বক্তৃতা দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলাদের মধ্যে স্বদেশী প্রচার ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রচারের চেষ্টা করেন। বহুদিন তিনি 'ভারতী' এবং 'ভারতী ও বালক' কাগজের সম্পাদিকা ছিলেন। এই কাগজের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর 'সখি সমিতি'র সহায়তায় তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা দিতেন।

অনেক ভাঙাগড়ার পর মহাত্মা গান্ধী এসে কংগ্রেসে যোগদান করলেন

১৯১৯ সালে। তারপর ১৯২০ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হয়ে তাকে পুনর্গঠন করেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। তাঁর আন্দোলনে গোপনতার স্থান ছিল না; আবার চরম আত্মত্যাগেরও তেমন প্রয়োজন ছিল না প্রথম দিকে। এই সরল পথের সন্ধান পেয়ে দলে দলে বহু লোকই দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মূল কথা ছিল সরকারের সঙ্গে সবরকমে অসহযোগিতা করা, বিলিতী জিনিস বর্জন করা, এবং খদ্দর ও অন্যান্য স্বদেশী জিনিসের মধ্য দিয়ে নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। অন্যদিকে ছিল অহিংসনীতিকে আশ্রয় ক'রে ইংরেজের হৃদয়-পরিবর্তন দ্বারা স্বরাজ অর্জন করা। গান্ধীজীর নীতি ছিল অহিংসা ও প্রেম দিয়ে শত্রুর হৃদয় জয় করবেন। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের চরিত্রে আছে অন্তর্নিহিত সাধুতা ও সংবৃত্তি, তাকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই আন্দোলন আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সহজ। ধর্ম ও করুণা, প্রেম ও অহিংসা আমাদের দেশের লোককে সহজে নাড়া দেয়, সাড়া জাগায়। তাই গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনে ধাপে ধাপে ক্রমশঃই বেশী গণ-সংযোগ করতে পেরেছিলেন।

বিপ্লবীরা দেখলেন যে, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধ-শক্তি জাগবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য অধিকাংশ বিপ্লবী দলই ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন অপরপক্ষে ভারতীয় নারী-জাগৃতির ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর করেছিলেন নারীর শৃঙ্খলমোচনের সূচনা। গান্ধীজীর দীক্ষায় নারী এবার জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে একসাথে চলতে প্রেরণা লাভ করলেন।

১৯২১ সালের এই অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে যে-সমস্ত নারী প্রথম অগ্রণী হয়ে দেশসেবার কাজে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসে কারাবরণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী ঊর্মিলা দেবী প্রভৃতি। নারীদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। শুধু তাই

নয়, কাতারে কাতারে ছেলেরা অর্থাৎ তরুণ কর্মীর দল অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেলখানা ভরে ফেললেন।

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন। গান্ধীজী ও কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কট করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই কারণে যে, এর মধ্যে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন না। আরম্ভ হয় 'সাইমন ফিরে যাও' আন্দোলন। মেয়েদের মধ্যেও দারুণ বিক্ষোভ জেগে ওঠে।

১৯২৮ সালেই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেস অধিবেশন। অরবিন্দের দাদা—কবি মনোমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষ এবং অরু সেন প্রভৃতি এগিয়ে এসে মেয়েদেব মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার কাজ করতে থাকেন।

লতিকা ঘোষ যে কেবল সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজের হরতালে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, সংগঠনের একটা বিরাট দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে-বছরের কংগ্রেসে নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ভারপ্রাপ্তা। তাঁর অধীনে বহু ছাত্রী ও নারী এসে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগদান করেন। একটা অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয় মেয়েদের মধ্যে। সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর অধীনে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সমান পদক্ষেপে সেদিন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস মণ্ডপ পর্যন্ত মাচ ক'রে চলেছিল। প্রকাশ্য রাস্তায় এসে জনসাধারণের সামনে দিয়ে এমনিভাবে মার্চ করে চলে যাওয়া তখনকার দিনে ছিল নারীর পক্ষে একটা অসীম দুঃসাহসের কাজ। নারী-জাগরণের ফল্গুনদী এবার আত্মবিশ্বাস ও স্পর্ধা নিয়ে বাইরে এসে সর্বসমক্ষে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যদিও গতি তার তখনো ততো দ্রুত নয়। মেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসতে লাগলেন জনসেবার কাজে। তারা ঘরের কাজও করতেন, অনেকে লেখাপড়াও শিখতেন, আবার ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতেন। কংগ্রেসের ঐ স্বেচ্ছাসেবিকা দল নিজেদের পশ্চাতে দলে দলে কর্মী মেয়েদের তেমনি ক'রে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে এল, ঠিক যেমন ক'রে ভগীরথ একদিন আহ্বান ক'রে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন গঙ্গাকে সমগ্র দেশ প্লাবিত ক'রে দিয়ে।

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য) 'ছাত্রীসংঘ' প্রতিষ্ঠা ক'রে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলার প্রয়াস পান। ঢাকাতে লীলা নাগ তার আগে থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন-কাজের মধ্য দিয়ে মেয়েদের সচেতন ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যান্য জেলাতেও তখন এরূপ নারী-সংগঠনের কাজ কিছু কিছু শুরু হয়েছিল।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাতে বাংলার বিপ্লবীরা খুবই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হন। তারা প্রবল বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের তাঁরা প্রচুর সমর্থন লাভ করবেন এই সম্ভাবনা প্রকাশ্য অধিবেশনে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বলেন, আগামী একবছরে যদি আমরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পাই, তবে একবছর পরে পূর্ণ স্বাধীনতাই হবে কংগ্রেসের আদর্শ। এবং পূর্ণ স্বাধীনতা আনবার জন্য আরম্ভ করা হবে আইন অমান্য আন্দোলন।

সেই অনুসারে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবার উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করবার সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয় গান্ধীজীর উপর।

এখানে এসে আবার বিপ্লবীদের প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁরা মনে করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীদের একভাগ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। আরেক ভাগ সশস্ত্র বিপ্লবের সংগঠনে নিযুক্ত রইলেন।

১৯৩০ সালে আরম্ভ হয় লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। স্বয়ং গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান করেন। মেয়েদের মধ্যে কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি', ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' প্রভৃতি সংগঠিত হয়। মেয়েরা বাঁধ-ভাঙা স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং আইন অমান্য ক'রে দলে দলে কারারুদ্ধ হলেন।

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয় এবং গান্ধীজী লণ্ডনে রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্সে যোগদান করতে যান।

রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। তাঁকে ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয়। আবার আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে ১৯৩২ সালে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান বহু মহিলাকে দলে দলে আইন অমান্য করতে এগিয়ে দেয়। কাতারে কাতারে মহিলা-কর্মী মহা উৎসাহে কারাবরণ করেন। বন্যার বেগে গিয়ে তাঁরা জেলখানা ভর্তি ক'রে ফেললেন। দেশবাসী বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে এই দৃশ্য দেখলেন।

১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের অহিংস আন্দোলনে যেমন সত্যাগ্রহী নারীরা বহুসংখ্যায় যোগদান করেছিলেন, তেমনি অনেক বিপ্লবী মেয়েরাও ১৯৩০ সাল থেকে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালেব এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার পর বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘটিত হয় সম্মুখ-সংগ্রাম জালালাবাদ পাহাড়ে। সমস্ত চট্টগ্রাম তখন বিপ্লবীদের একটা বিরাট ঘাঁটি। ১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট কলিকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্ট-এর উপর বোমা পড়ে। বিপ্লবী মেয়েদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হয়। একে একে ঢাকা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মূল ঘাঁটির উপর বিপ্লবী আক্রমণ ও সংগ্রাম শুরু হয়। মেয়েরা অসীম সাহসে দুর্ধর্ষ স্পর্ধা নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। কুমিল্লায় কিশোরী দুটি মেয়ে—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'রে নিহত করেন। কলিকাতায় বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলী করেন। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইংরেজদের ক্লাব আক্রান্ত হয়। প্রীতিলতা আত্মবলিদান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

, অধিকাংশ মেয়েরাই নিজেদের প্রেরণায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা, মা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি অনেকেই পেতেন না; বিপ্লবী কাজে অনুমতি পাওয়া তো প্রায় অসম্ভবই ছিল। অভিভাবকদের অনেকেরই ভয় ছিল সমাজের নিন্দার, ভয় ছিল কন্যার বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরী যাবার, ভয় ছিল কন্যার উপর রাজরোষের। এই ভয়ের সীমা পরিসীমা ছিল না।

অসহযোগ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানকারী মহিলাগণ কিন্তু চতুর্দিকের ঐ আতঙ্ক ও শঙ্কা-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছিলেন। সাড়া না দিয়ে

তাঁরা থাকতেই পারলেন না।। সর্ববাধা ঠেলে তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন। এক অসাধারণ শক্তি ও সাহস যেন তাঁদের পেয়ে বসেছিল।

১৯৩৮ সালে সমস্ত বন্দী মুক্তি পাবার পর সহিংস বিপ্লবীরা অনেকেই মনে করলেন যে, তাঁদের আর তখন গুপ্ত আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। তাঁরা অনেকেই ১৯৩৮ সালে তাঁদেব গুপ্ত সমিতি ভেঙে দিযে কংগ্রেসে এসে যোগ দিলেন। তাঁরা মনে করলেন, এমন একটা আন্তর্জাতিক পবিস্থিতি আসছে যাতে কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতাব সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে। সেসময় কংগ্রেস ও বিপ্লবী এই দুটো কেন্দ্র থেকে দুই রকমের আদেশ আসা সমীচীন নয়। সেইজন্য যুগান্তর দল স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ বরণ করলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর নামে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিযে।

ওদিকে কৃষক ও শ্রমিকদের সচেতন ক'রে তোলাব প্রয়োজনীযতা প্রবলভাবে অনুভূত হয। মেযেদের দিক থেকে সন্তোষকুমাবী গুপ্তা সবপ্রথম শ্রমিক আন্দোলন পবিচালনা করেন ১৯২৩ সালে। তিনি তাদের কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তারপর শ্রমিক-আন্দোলনে নেতৃত্ব কবেন ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত মেথর-ধর্মঘট পবিচালনা ক'রে তাদের সজাগ করেছিলেন। আবো পরে বীণা দাস, সুধা রায়, মৈত্রেয়ী বসু প্রভৃতি এদিকে অগ্রসর হন।

১৯৪২ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে এসে সহিংস ও অহিংস বিপ্লবীরা মিলেছিলেন এক স্রোতোধারায। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে যোগ দিয়েছিলেন কৃষকশ্রেণী, নেমে এসেছিলেন ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ নরনারী। শ্রমিকদেরও একটা অংশ এসে যোগ দিয়েছিল। সকলেরই লক্ষ্য, বৃটিশ শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। সমগ্র দেশ সেদিন বিদ্রোহী।

১৯৪২ সালের ৮ই অগাস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড' প্রস্তাব ঘোষণা করে। গান্ধীজী বললেন—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। ৯ই অগাস্ট প্রত্যুষেই গভর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের। আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য নেতারা কেউ বাইরে রইলেন না। গণ-নেতৃত্ব দেখা দিল। গান্ধীজীও তাই চেয়েছিলেন। এই শেষ সংগ্রামে অতীতের সমস্ত আন্দোলনের ও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এটা ছিল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার শেষ সংগ্রাম। থানা থেকে

আরম্ভ ক'রে বৃটিশ শক্তির উচ্চতম ঘাঁটিগুলি পর্যন্ত দখল ক'রে নেবার চরম প্রচেষ্টা। জাতির চিত্তে ছিল সেদিন স্বাধীনতা-অর্জনের দুর্জয় সংকল্প এবং তা সফল করবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ক্ষেপে ওঠে। তারা কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও গলা টিপে ধরে। সভা-সমিতি হয় নিষিদ্ধ। জনতার উপর বর্ষিত হয় নির্মম লাঠির আঘাত। মিলিটারী করতে থাকে গুলী-বৃষ্টি। হাওয়াই-জাহাজ থেকে এবং মেশিনগান থেকে তারা গুলীর ঝড় বইয়ে দেয়। শক্তির দম্ভে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চরম নির্যাতনের অভিযান শুরু করে সমগ্র দেশব্যাপী।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সৈনিকেরা দলে দলে রেল্-লাইন নষ্ট ক'রে দিলেন, স্টেশন পোস্টাফিস জ্বালিয়ে দিলেন, সরকারী শস্যের ঘাঁটি লুঠ করলেন, টেলিগ্রাফ ও ট্রামের তার কেটে দিলেন, যুদ্ধের রসদবাহী বহু যানবাহন ধ্বংস করলেন। কৃষকেরা কত জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দিলেন। আমেদাবাদের মিল বন্ধ হয়ে গেল। টাটা ইস্পাতের কারখানায় কুড়িহাজার শ্রমিকসহ কর্মীরা ধর্মঘট করলেন। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বন্ধ করবার জন্য পিকেটিং করলেন। এবারে চলেছে ক্ষমতা দখল করবার শেষ সংগ্রাম।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বালিয়া, সাতারা ও মেদিনীপুর দেখিয়েছে ত্যাগ ও শক্তির পরাকাষ্ঠা। সেখানে চলেছিল পাশাপাশি স্বাধীন গভর্নমেণ্ট-প্রতিষ্ঠার লড়াই। মেদিনীপুর জাতীয় সরকার স্থাপন ক'রে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল দুই বছর অবধি। মেদিনীপুরের মেয়েদের আত্মত্যাগের কাহিনী লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে। তাঁরা সেদিন স্বামীপুত্রদের আঁচলে ঢেকে রাখতে চাননি। তাদের সঙ্গেই নেমে পড়েছেন মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। তারা অস্ত্র ধরেছেন পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। শত শত নারী অকম্পিত পদে এগিয়ে গিয়েছেন পুলিসের গুলীর সামনে। তাঁরা থানা দখল করতে গেছেন, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছেলেরা ঘরে না থাকলে গ্রাম পাহারা দিয়েছেন। ১৯৪২ সালের অগাস্ট থেকে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দুই বছর ধরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে যে অত্যাচার তাঁরা সহ্য করেছেন তার আদি অন্ত নেই, বুঝি সব কথা আজও প্রকাশ পায়নি।

ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীকে দিয়ে ১৯১৪ সালে প্রত্যক্ষভাবে

যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এদেশের নারী শুরু করেছিলেন তার প্রথম পর্যায় সাঙ্গ হ'ল বাহাত্তর-বর্ষীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর পূত দেহাস্থি দিয়ে ১৯৪২ সালে। থানা দখল করতে গিয়ে এই মহীয়সী শহীদের রক্তে ধন্য. হ'ল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

ওদিকে ১৯৪৭ সালে ভারতের পূর্বসীমান্তে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে এসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র উড়িয়েছিলেন বিজয়পতাকা কোহিমা-ডিমাপুরে। নেতাজী গড়ে তুলেছিলেন 'ঝাঁসীর রানী বাহিনী' নামে নারী-বাহিনী। লক্ষ্মী স্বামীনাথন তার নেত্রী। ১৯৪৫ সালে এই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর যে বিচার ইংরেজের আদালতে শুরু হয়েছিল, তাতে সমস্ত ভারতবর্ষে জেগেছিল অদ্ভুত উত্তেজনা ও বিক্ষোভ। ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বুক পেতে গুলী নিয়ে শহীদ হয়ে আছেন। বোম্বাই ও করাচীতে নৌবিদ্রোহ এবং এরোপ্লেন বাহিনীর ধর্মঘট দেখা দেয়।

ইংরেজ দেখতে পেল ভারতবর্ষের সাধারণ নরনারী, কিষাণ, মজুর, ছাত্র, সৈন্যবাহিনী এবং নৌ সেনা সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে, তাদের রক্তচক্ষু ও দৃঢ়মুষ্টি আজ অশক্ত, নিষ্ফল। ওদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ইংরেজের প্রতিকূল। সুতরাং ভারতবর্ষে তারা জয়ের আশা পরিত্যাগ করল।

উড়ল ভারতবর্ষে স্বাধীনতার বিজয়পতাকা ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট।

ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারী নিজেকে ক্রমে বিকশিত ক'রে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটে এসেছে তাঁদের পশ্চাতে। তার প্রবল চাপে আলোড়িত আন্দোলিত সমাজ সশ্রদ্ধ-ভাবে গ্রহণ করল নারীর প্রস্ফুটিত অন্তর্শক্তিকে। গৌরবে মহীয়ান হয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অবদান।



সরলা দেবী চৌধুরানী



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে। মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ও পিতা জানকীনাথ ঘোষালের কনিষ্ঠা কন্যা তিনি।

পিতা জানকীনাথ ছিলেন নদীয়ার জয়রামপুরের বিখ্যাত ঘোষাল-বংশের সন্তান। অসাধারণ বলবীর্যের জন্য এই ঘোষাল-বংশ বিখ্যাত ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জানকীনাথকে এক সুপুরুষ বীর্যবান সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে, তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ দেন ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে ১৮৬৭ সালে। কিন্তু বিবাহকালে জানকীনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের দুটি আচরিত রীতি গ্রহণ করেন নাই—প্রথমটি, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ; দ্বিতীয়টি, ঘরজামাই থাকা।

জানকীনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কার্যক্ষেত্র ছিল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। কংগ্রেসের জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে তার শৈশবের অনেকগুলি বৎসরই কেটে গেছে জানকীনাথের কর্মদক্ষ সেবাযত্নে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য যখন বিলাত যান তখন তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ঠাকুর-বাড়ীতে রেখে যাত্রা করেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী তখনকার যুগেও সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় বিদুষী ছিলেন। তিনি 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন ১২৯১—১৩০১ বঙ্গাব্দ এবং ১৩১৫—১৩২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। উপন্যাস, কবিতা, গল্প, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও একসময় থিয়সফিতে বিশ্বাসী হন। বাংলাদেশের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা-শাখার সভানেত্রী ছিলেন তিনি। এই সোসাইটির মহিলা-শাখা যখন উঠে যায় তখন ঐসব মহিলা-সভ্যদের নিয়ে তিনি 'সখি সমিতি' সংগঠন করেন ১৮৮৬ সালে। 'সখি সমিতি' মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে এবং স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দিত, বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ ক'রে মেলার অনুষ্ঠান করত।

জানকীনাথ ছিলেন কংগ্রেসসেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীও কংগ্রেসের রাজনৈতিক চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে প্রথম নারী প্রতিনিধিরূপে এবং ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যোগদান করেন।

এমন মনীষী ও দেশপ্রেমিক পিতামাতার সন্তান ছিলেন সরলা দেবী। শিশুবয়স থেকেই তাঁর অন্তরের মধ্যে সহজাত স্বাবলম্বনের একটা দৃঢ়তা ছিল। ছয়বছরের বালিকা সরলা দেবী যখন পিতার বিলাত-বাস-কালে মাতুলালয়ে ছিলেন তখন একদিন তাঁর এক সমবয়সী মেয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, পাপ করলে তাঁকে একেবারে একা বেঁচে থাকতে হবে—এই হবে শাস্তি। ছয়-বছরের সরলা দেবী সেদিন ছাতে উঠে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে লাগলেন যেন কোথাও কেউ নেই—আকাশে পাখী নেই, বাড়ীতে লোক নেই, মামা-মামী দাদা-দিদিরা নেই, দাস-দাসীরা নেই, অন্ধকার ঘরেও কেউ লুকিয়ে বেঁচে নেই, ইঁদুর-পিঁপড়েও নেই—ব্রহ্মাণ্ড একেবারে শূন্য, শুধু তিনি একা আছেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই শিশুমন সেদিন নিঃসঙ্গ বোধ করেনি। আকাশের আলো যেন তার সঙ্গী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও যেন কোথাও আছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগালেই তাঁকে পাওয়া যাবে। শুধু একটি বালিকার সত্তা এবং ঈশ্বরের সত্তা সেদিন ব্রহ্মাণ্ডে আছে, আর কিছুই নেই। স্রষ্টার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মবোধের অনুভূতি একমুহূর্তের জন্য তাঁর মনে উদয় হ'ল। নিঃসঙ্গতার ভয় তাঁর চেতনার দিগন্তরেখায় বিলীন হয়ে গেল—হাসিমুখখানি

নির্ভীক সতেজ হয়ে উঠল। তিনি নিজেই লিখেছেন—"সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধহয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।"

এই সহজাত স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতা সমস্ত জীবন তাকে পরিচালিত করেছে।

যেসময়ে আমাদের সমাজের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন না, বাড়ীতে পর্দার আড়ালে শুধু ঘরকন্না করেছেন—সমাজের সেই অন্ধকারের মধ্যে ১৮৮৬ সালে তেরো বছর বয়সে সরলা দেবী এনট্রান্স পাস ও ১৮৯০ সালে সতেরোবছর বয়সে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি এ পাস করেন।

এনট্রান্স পরীক্ষার সময় ইতিহাসের প্রশ্নের মধ্যে মেকলে লিখিত 'লর্ড ক্লাইভ' নামক পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি ক'রে ক্লাইভ এর বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল। সরলা দেবী মেকলের প্রতিপাদ্য বাঙালী চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ ক'রে নিজের বিপরীত মন্তব্যপূর্ণ উত্তর এমন যুক্তি, তেজ ও আন্তরিকতার সঙ্গে সামনে তুলে ধরেছিলেন যে, পরীক্ষক এন ঘোষ এই ছাত্রীকে সর্বাধিক নম্বর দিয়েছিলেন এবং খোঁজ করেছিলেন এই মেয়েটি কে? ইতিহাসের পরীক্ষায় সরলা দেবী ই সেবার প্রথম হয়েছিলেন। এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে 'জীবনের ঝরাপাতা' নামক আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—"বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল। এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে বছর দশ বারো পরে কিপলিং-এর একখানা ছোটগল্পের বইয়ের একটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে অবমানিত পেয়ে তার প্রতিবিধান-কল্পে আমি যে দেশ ও জাতি ব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করলুম তাতে।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তিনি বাঙালীজাতির মধ্যে শরীরচর্চার উৎসাহ দেবার জন্য, শৌর্যে বীর্যে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড় করাবার জন্য ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন কুস্তিগীর পালোয়ানদের কাছে।

দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্য মারাঠীদের 'শিবাজী উৎসব'-এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলিকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত করেন। তাঁর 'বীরাষ্টমী ব্রত'র (১৯০৪) উদ্দেশ্য ছিল বাংলার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে জাগ্রত করা।

'ভারতী'তে লিখলেন তিনি 'বিলিতী ঘুষি বনাম দেশী কিল'। তিনি লিখেছেন—"ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম, রেলে, স্টীমারে, পথে ঘাটে যেখানে

সেখানে গোরা সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হবে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাদের ইতিবৃত্ত 'ভারতী'তে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকানো আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে।" দলে দলে ছাত্র এবং বয়স্করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলেন। "আমি তাদের থেকে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা ব্যাজ। ··· সেটি ছিল মাতৃভূমির জন্য বিপদ বরণের স্বীকৃতি। ··· বছর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল।"

১৯০২ সালের শেষের দিকে বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী) এলেন সরলা দেবীর কাছে বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। "আমি তাকে (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে) সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলুম। সেও আমার খুব অনুগত হ'ল। বারীন ঘোষের নেতৃত্বে ··· ভারত উদ্ধার দল স্থাপিত হ'ল। যতীন বাঁড়ুয্যে তার একজন প্রধান কর্মকর্তা—সেখানেই খায় দায় থাকে আর যারা দলে আসে তাদের কসরৎ ও ড্রিল করায় এবং ঘোড়ায় চড়া শেখায়। ··· খালি আমার মতভেদ হ'ল যখন শুনলুম তাদের দল থেকে ডাকাতি চালানোর হুকুম বেরিয়েছে।"

মণিলাল গাঙ্গুলী একদিন তাঁর সাহিত্য-সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবে সরলা দেবীকে সভানেত্রী হ'তে আমন্ত্রণ জানালেন। সরলা দেবী একটি শর্ত দিলেন যে, সেই তারিখটি ১লা বৈশাখে ফেলতে হবে এবং সেখানে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত করতে হবে। সভায় থাকবেনা কোনো বক্তৃতা। কেবল একটিমাত্র প্রবন্ধপাঠ হবে—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। খুঁজে বার করতে হবে বাঙালী ছেলে—কে আছে কুস্তিগীর, তলোয়ারধারী, বক্সিং ও লাঠি-বীর। সেই উৎসবে হবে তাদেরি খেলার প্রদর্শনী।

এই 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' যখন অনুষ্ঠিত হয় সেদিন বাংলাদেশের মর্মদেশে গিয়ে তাকে তা প্রবলভাবে আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। বিপিন পাল তাঁর

Young India-তে লিখলেন—"As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal !"

সরলা দেবী প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন 'বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তক। তারপর আয়োজন করেন তিনি প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসব। স্টেজের উপরে একখানি তরবারি রেখে সভাসীনেরা বীর উদয়াদিত্যকে স্মরণ ক'রে তাতে দেবে পুষ্পাঞ্জলি। যুবমনে উৎসাহের একটা প্রবল জোয়ার এসে ধাক্কা দিল। কাগজে লিখল, "সরলা দেবীর সঙ্গে আমরা দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়— 'অতঃ কিম্' ?"

সেসময় যে-সমস্ত জাপানীরা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়ীতে এসে থাকতেন তাঁরা নিজেদের দেশ থেকে বয়ে সব-কিছু জিনিস নিয়ে এসেছিলেন, এমনকি চিঠি-লেখার কাগজ পর্যন্ত। সরলা দেবী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত কাগজ সঙ্গে এনেছেন কেন ? তাঁরা বললেন, তাঁরা জানেন যে, ভারতবর্ষে কিছুই পাওয়া যায় না, কাগজও নয়, তাই চিঠি-লেখা বন্ধ না হবার জন্য তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কাগজ ঠেসে দিয়ে দিয়েছেন। সরলা দেবী ভাবতে লাগলেন, জাপান জানে পরাধীন অসভ্য ভারতবর্ষ,—ভারতবর্ষের লোক কিছুই করতে জানে না, করতে পারে না। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান সরলা দেবীর মন তোলপাড় ক'রে তুলল—

"নিজবাসভূমে পরবাসী হলে
পরদাসখতে সমুদায় দিলে !
পরহাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে !
পর ভাষণ আসন আনন রে,
পরপণ্যে ভরা তনু আপন রে !
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস ব'লে !
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
অশনে-বসনে গমনের তরে !
পর দীপ-মালা নগরে নগরে—
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে !"

তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তারপর থেকে 'ভারতী'র মলাট

দিলেন দেশী হলদে-রঙের তুলট-কাগজে, ভিতরের কাগজ বদলানো গেল না, তাহলে 'ভারতী'ই বন্ধ করতে হ'ত।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুলেছিলেন তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার প্রচার করবার জন্য। এটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা, শুধু মেয়েদের জন্য, একটি স্বদেশী বস্ত্র ও জিনিসের দোকান। সরলা দেবী এবং যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি ক'রে বৌবাজারে 'স্বদেশী স্টোর্স' নামে আরেকটি স্বদেশী জিনিসের দোকান খোলেন যোগেশবাবুর পরিচালনায়। সরলা দেবী লিখেছেন—"আমার ও যোগেশবাবুর স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই।"

কোনো উৎসবে যেতে হ'লে সরলা দেবীর আপাদমস্তক স্বদেশী বেশভূষায় সজ্জিত থাকত। লাবণ্যময়ীর লাবণ্য শতধারায় ঝরে পড়ত,—সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হ'ত।

১৯০১ সালে দীনশা এতুলচী ওয়াচা সভাপতি ছিলেন কলিকাতা কংগ্রেস-অধিবেশনের। বিডন-উদ্যানের সেই অধিবেশনে রূপে লাবণ্যে অপরূপ সরলা দেবী সমস্ত সত্তা মন্থন ক'রে গাইলেন তাঁরই রচিত গান—

"অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী।
গাও আজি হিন্দুস্থান।"

সেই গান বুঝি সেদিন সভার প্রতিটি লোকের মনে দেশের জন্য মরণের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল। যুবশক্তি মরণমন্ত্রে দীক্ষা নিতে প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই যুগের অগ্নিবাহিকা।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বেনারস কংগ্রেসের অধিবেশন-মণ্ডপে হঠাৎ কংগ্রেস সভাপতি গোখলে সরলা দেবীকে 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। সরলা দেবী 'সপ্ত কোটি'-কে চট্ ক'রে 'ত্রিংশ কোটি' ক'রে দিয়ে তাঁর কণ্ঠের সকল মধু ঢেলে যে-গান গেয়েছিলেন তাতে ভারতের দেশ-দেশান্তর থেকে সমাগত স্বদেশভক্তগণ মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম সুর সরলা দেবীরই দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দু'লাইনের সুর নিজে বসিয়েছিলেন।

পাঞ্জাবের পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯০৫ সালে। স্বামী ছিলেন আর্যসমাজ নেতা। স্বামীর কাজের সঙ্গে তাঁর কর্মশক্তি এসে যুক্ত হ'ল। বোম্বাই ও উত্তর-ভারতে তাঁর কর্মপ্রবাহ বয়ে চলেছিল।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার প্রযাসে তিনি 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' স্থাপন করেন। তার শাখা লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, করাচী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলিকাতা এবং আরো কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হয়।

১৯২৩ সালের ৬ই অগাস্ট তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা তাতে ব্যাহত হয়নি। ১৯২৫ সালে 'নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতি'র সভানেত্রীরূপে দেশ তাকে পেয়েছে। বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ শহরে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি পৌরোহিত্য করতে।

'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন তিনি ১৩০২—১৩০৪, ১৩০৬—১৩১৪, ১৩৩১ থেকে আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। সম্পাদিকা না থেকেও, 'ভারতী'র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বহুদিন। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' 'ভারতী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া কয়েকজন মনীষীর ইংরাজি রচনা অনুবাদ করিয়ে তিনি 'ভারতী'র গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন—

(ক) ভগিনী নিবেদিতার—'প্রত্যেক মা ছেলের জন্য কি করতে পারে' —জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬, 'বঙ্গমাতার কর্তব্য'—শ্রাবণ ১৩০৬

(খ) মহাদেব গোবিন্দ রানাডের—
'পূর্বকালের সমাজ শাসন'—শ্রাবণ ১৩০৭

(গ) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর—
'দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতোপনিবেশ'—বৈশাখ ১৩০৯।

১৯৪৫ সালের ১৮ই অগাস্ট সরলা দেবীর দেহাবসান হয়। তাঁর মতো মনীষী ও প্রতিভাকে পেয়ে দেশ গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ।



ননীবালা দেবী



ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে। দেশও সেখানেই। পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জী, মা গিরিবালা দেবী।

এগারোবছর বয়সে বিবাহের পর ষোলোবছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছেই ফিরে আসেন।

১৯১৪ সালে বেধেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সেই সুযোগে ভারতে যুগান্তর-দলের বিপ্লবীরা জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, স্বাধীনতা আনবার রাস্তা পরিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইংরেজ সেই ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর জেনে যায়। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে আত্মদান ক'রে জাতিকে দেশের জন্য মরতে শিখিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। তবুও ইংরেজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য ক'রে পূর্ব-ভারতের পথ ধ'রে চীন, শ্যাম ও আসামের ভিতর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র আনিয়ে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য বিপ্লবীরা আবার চেষ্টা করেছিলেন যাদুগোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে।

চারদিকে চলছে তখন আহত বৃটিশ-সিংহের প্রচণ্ড আক্রমণ ও নির্মম অত্যাচার। সেই অত্যাচারের রূপ ছিল—ফাঁসী, দ্বীপান্তর, পুলিসের নির্যাতনে

পাগল-হয়ে-যাওয়া এবং দালান্দা-হাউসে নিয়ে গিয়ে চার্লস্ টেগার্টের তদারকে বীভৎস নিপীড়ন। মলদ্বারে রুল ঢোকানো, কমোড থেকে মলমূত্র এনে মাথায় ঢেলে দেওয়া, কয়েকদিন উপবাস করিয়ে পিছনে হাতকড়া-অবস্থায় বন্দীকে দাঁড় করিয়ে রেখে লাথি ও রুলের প্রহার—এই ছিল টেগার্টের অত্যাচারের রীতি।

এইরকম বিপদসংকুল দিনে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা পেলেন ননীবালা দেবী। সম্পর্কে তিনি ননীবালা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

পলাতক অমর চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দুই মাস আশ্রয় দিয়ে রাখলেন তিনি রিষড়াতে। পুলিসের দৃষ্টি পড়ল এখানেও।

ইতিপূর্বে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে, সেই সম্পর্কে পুলিস কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' নামক প্রতিষ্ঠানে তল্লাসী করতে যায় ১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে। তল্লাসীর সময় অমর চ্যাটার্জী পলাতক হন এবং রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হ'য়ে তিন-নম্বর রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার হন। গ্রেপ্তারের সময় রামবাবু একটা 'মসার' (Mauser) পিস্তল কোথায় রেখে গেছেন সে-কথা জানিয়ে যেতে পারেননি। তখন বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে, রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইন্টারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে যে-যুগ ছিল তখন বাঙালী বিধবার পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিয়ে পুলিসের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পুলিস তো নয়ই, কোনো সাধারণ মেয়েও নয়। আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ, আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট সাগরের ব্যবধান। সেদিনকার নারী তৈরী ক'রে দিয়ে গেছেন আমাদের যুগের বিপ্লবী নারীকে—তিনি পথ দেখিয়েছেন, ভিত্তি গেঁথে গেছেন আমাদের জন্য।

পুলিস ক্রমে জানতে পারল যে, ননীবালা দেবী রামবাবুর স্ত্রী নন। কিন্তু জানল না যে, ইনিই রিষড়াতে ছিলেন আশ্রয়দাত্রী।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগরে আবার বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। রিষড়ার মতো এখানেও মেয়েরা না থাকলে, বাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত না। আবার এলেন ননীবালা দেবী গৃহকর্ত্রীর বেশে। এখানে এইসময়ে আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে বড়পিসিকেও এনেছিলেন ভোলানাথ চ্যাটার্জী। এই বড়পিসি ও ননীবালা দেবী দুটো আলাদা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন পলাতক বিপ্লবীদের। পলাতক হয়ে আছেন এখানে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল

মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও বিজয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলেরই মাথায় অনেক হাজার টাকার হুলিয়া ছিল। এই নিশাচরেরা সারাদিন দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে কাটিয়ে দিতেন। শুধু রাতে সুবিধামতো বেরিয়ে পড়তেন। নিষ্ঠুর শিকারীর মতো পুলিস এসে পড়লেই এই পলাতকেরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, পুলিস হয়রান হয়ে ফিরতো।

এইভাবে চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসী ও বিপ্লবীদের নিমেষে পলায়নের পর ননীবালা দেবীকে আর চন্দননগরে রাখা নিরাপদ হ'ল না। পুলিস তৎপর হয়ে উঠল তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। তাঁর বাবা সূর্যকান্ত ব্যানার্জীকে পুলিস ইলিসিয়াম রো-তে নিয়ে গিয়ে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি বসিয়ে রেখে জেরা করত।

ননীবালা দেবী পলাতক হলেন। তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র কর্মোপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন পেশোয়াব। বাল্যবন্ধু তাঁর দাদাকে অনেক অনুনয় ক'রে রাজী করালেন ননীবালাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। ননীবালা দেবী পলাতক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার গেলেন। প্রায় ষোলো-সতেরো দিন পরে পুলিস সন্ধান পেয়ে যখন ননীবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পেশোয়ার গেছে— তখন ননীবালা দেবীর কলেরা চলছে তিনদিন যাবৎ। প্রথমদিন বাড়ী ঘিরে রেখে তার পরদিনই নিয়ে গেল তাঁকে পুলিস-হাজতে (লক্-আপ্-এ) স্ট্রেচারে ক'রে। কয়েকদিন সেখানে রেখে চালান দিল তাঁকে কাশীর জেলে। তখন তিনি প্রায় সেরে উঠেছেন।

কাশীতে আসার কয়েকদিন পরে, প্রতিদিন তাঁকে জেল-গেটের আফিসে এনে কাশীর ডেপুটি পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিতেন ব্যানার্জী জেরা করত। ননীবালা দেবী সবই অস্বীকার করতেন, বলতেন কাউকেই চেনেন না, কিছুই জানেন না। তারপর ছুটতো জিতেন ব্যানার্জীর তুমি-তুই-তুকারির অসভ্য ভাষা। ননীবালা দেবী নীরব।

একদিন দুইজন জমাদারনী (wardress) ননীবালা দেবীকে একটা আলাদা সেলে (cell) নিয়ে গেল। দুজনে মিলে তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর উলঙ্গ ক'রে খানিকটা লঙ্কাবাটা ওঁর শরীরের অভ্যন্তরে দিয়ে দিতে লাগল। ননীবালা দেবী চীৎকার ক'রে লাথি মারতে লাগলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। জমাদারনীরা বেশীক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে পারল না। থামিয়ে

দিয়ে নিয়ে এল আবার তাঁকে সেই জেল-গেটের আফিসে জিতেন ব্যানার্জীর কাছে।

আবার জেরা :

—কি জান বল।

—বলব না কিছু।

ননীবালা দেবীর চোখে আগুন ছুটছে তখন।

—আবো শাস্তি দেব।

—যত খুশী দিন, আমি বলব না।

—অমর চ্যাটার্জী কোথায় ?

—বলব না।

—শাস্তি পাবে কিন্তু, মনে আছে তো ?

—যা খুশী করতে পাবেন, আমি কিছু বলব না।

কাশীর জেল পুবানো, সেকেলে। সেখানে প্রাচীবেব বাইরে মাটির নীচে একটা 'পানিশমেণ্ট সেল' অর্থাৎ শাস্তি-কুঠুবী ছিল। তাতে দরজা ছিল একটাই, কিন্তু আলো বাতাস প্রবেশ করবাব জন্য অন্য কোনো জানালা বা ছিদ্র ছিল না। ব্যর্থকাম জিতেন ব্যানার্জী তিন দিন প্রায আধঘণ্টা সময় ধ'রে ননীবালা দেবীকে ঐ আলোবাতাসহীন অন্ধকার সেলে তালাবন্ধ ক'রে আটকে রাখত। কবরের মতো সেলে আধঘণ্টা পরে দেখা যেতো ননীবালা দেবীব অর্ধমৃত অবস্থা, তবু মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি বের করতে পারল না। তৃতীয় দিনে বন্ধ রাখল তাঁকে আধঘণ্টারও বেশী, প্রায ৪৫ মিনিট। স্নায়ুর শক্তিকে চূর্ণ ক'রে দেবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। সেদিন তালা খুলে দেখা গেল ননীবালা দেবী পড়ে আছেন মাটিতে, জ্ঞানশূন্য।

হাল ছেড়ে দিয়ে পুলিস ননীবালা দেবীকে কাশী থেকে নিয়ে এল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে গিয়ে তিনি খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ, এমনকি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁকে অনুরোধ ক'রে খাওয়াতে পারলেন না। বলেন, বাইরে গেলে খাবেন। প্রতিদিন সকাল ৯টায় নিয়ে যেত তাঁকে গোয়েন্দা-আফিস ইলিসিয়াম রো-তে। সেখানে আই.বি. পুলিসের স্পেশাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট গোল্ডি (Goldie) তাঁকে জেরা করতো।

—আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। কি করলে খাবেন ?

—যা চাইব তাই করবেন ?

—করব।

—আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রীর কাছে রেখে দিন, তাহ'লে খাব।

—আপনি দরখাস্ত লিখে দিন।

ননীবালা দেবী তখুনি দরখাস্ত লিখে দিলেন।

গোল্ডি সেটা নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে ফেলে দিল। অমনি যেন বারুদে আগুন পড়ল। আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিযে উঠে ননীবালা এক চড় বসিয়ে দিলেন গোল্ডির মুখে। দ্বিতীয় চড় মারবার আগেই অন্য সি.আই.ডি. কর্মচারীরা তাঁর উদ্যত হাতকে চেপে ধরে রাখল, পিসিমা, করেন কি? করেন কি? অসীম শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসছে তখন ননীবালা দেবীর ভিতর থেকে।

—ছিঁড়ে ফেলবে তো, আমায দরখাস্ত লিখতে বলেছিলে কেন? আমাদের দেশের মানুষের কোনো মান সম্মান থাকতে নেই?

রেখে দিল ননীবালা দেবীকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট-প্রিজনার ক'রে প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার।

জেলের মধ্যে একদিন সিউড়ির দুকড়িবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জানতে পেলেন, সিউড়িতে তাঁদের বাড়ীতে সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল পাবার অপরাধে দুকড়িবালা দেবীর হযেছে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। রেখেছে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ক'রে। ডাল ভাঙতে দিচ্ছে প্রতিদিন আধমণ।

মতলব স্থির ক'রে ফেললেন ননীবালা দেবী। উপবাসের ১৯।২০ দিন চলছে তখন। আবার এলেন ম্যাজিস্ট্রেট অনুরোধ করতে।

—আপনাকে তো এখানেই থাকতে হবে। কি করলে খাবেন বলুন?

—আমার ইচ্ছামতো হবে?

—হ্যাঁ, হবে।

—তাহলে আমার রান্না করবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা চাই, দুজন ঝি চাই।

—ব্রাহ্মণ-কন্যা কেউ আছেন এখানে?

—আছেন, দুকড়িবালা দেবী।

—আচ্ছা, তাই হবে।

এল সমস্ত নতুন বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি। ২১ দিনের দিন ভাত খেলেন সেই অসামান্য দৃঢ়চেতা বন্দিনী।

দুই বছর এইভাবে বন্দীজীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি। ১৯১৯ সালের এক প্রাতে এল ননীবালা দেবীর মুক্তির আদেশ।

বাইরে এসে তাঁর মাথা গুঁজবারও স্থান মিলল না। সকলেই পুলিসকে ভয় পায়। বহুদিন ধ'রে চলেছিল অনেক ওলোট-পালোট ও ভাঙাগড়া। তারপর একটা আলাদা আধাঘুপচি ঘর ভাড়া ক'রে নিজের জীবনের শূন্য সম্বল নিয়ে, আত্মীয়স্বজনের অনাদর ও লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিপূর্ণ গৌরবে স্থির হ'য়ে কাটিয়ে চলেছেন তিনি বছরের পর বছর।

মনে হয়, যে-মেঘের আত্মদানে পরবর্তী কালে শ্রাবণবর্ষণের মতো ঝ'রে পড়েছিল কত অসংখ্য কর্মী ও কর্মপ্রেরণা, এই মহীয়সী মহিলারা ছিলেন সেই পরিণতিসম্ভবা মেঘ।

দুকড়িবালা দেবী



১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৭, ৬ই শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম জেলায় নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতা নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মা কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী।

তাঁর বোনপোর নাম নিবারণ ঘটক। তিনি ছিলেন ম্যাইনিং ক্লাসের ছাত্র। মাসীমা দুকড়িবালা নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশী বই, বে আইনী বই লুকিয়ে পড়বার আড্ডা ছিল মাসীমার বাড়ী। দুকড়িবালা দেবীর কেমন সন্দেহ হ'ত। তিনি সকলের অলক্ষ্যে বইগুলি দেখে নিয়ে বোনপোকে ধমক দিলেন। বোনপো আমলেই আনেন না। ক্রমে তাঁর বাড়ীতে একদিন মাস্টারমশাই নাম নিয়ে এলেন অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। সিমারসোল রাজস্টেটে রণেনবাবু নাম নিয়ে এলেন ফেরারী বিপিন গাঙ্গুলী। রাজবাড়ীর কর্মচারীরূপে বিপিনবাবু লাঠি ছোরা খেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার শিক্ষক হয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন। এঁদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস দেখে দুকড়িবালা দেবী মুগ্ধ হয়ে যান, বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মনে এঁদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর মনে ।

বোনপো নিবারণের বিবাহ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধল মাসী-বোনপোর মধ্যে। শর্ত ছিল তর্কে যে হারবে সে বিজয়ীর পথ ও মত গ্রহণ করবে। তর্কে মাসীমা হেরে গেলেন। বললেন, "এবার আমায় দলে নিয়ে নাও।" বোনপো নিবারণ বলেন, "তুমি কি এপথে আসতে পারবে মাসিমা? এমন বিপদের মুখে পা বাড়াতে নাই বা এলে ?" সিংহী গর্জে উঠে বললেন, "তুমি যদি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পার, তোমার মাও পারে।"

একদিন বোনপো নিবারণ সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল এনে লুকিয়ে রাখতে দিলেন মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে। এগুলি ছিল রডা কোম্পানী থেকে চুরি ক'রে আনা মাল। এই চুরির কাহিনী অভিনব। ১৯১৪ সালের

২৬শে অগাস্ট রডা কোম্পানীর জেঠী-সরকার শ্রীশ মিত্র বড়সাহেবের হুকুমমতো মাল খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্রপূর্ণ বাক্স খালাস ক'রে সাতটি গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে নিয়ে আসতে থাকেন। ৬খানা গাড়ী তিনি রডা কোম্পানীর গুদামে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ীর গাড়োয়ান ছদ্মবেশী বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়ীটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়ীতে ৯টি বাক্সে ছিল কার্টিজ এবং একটিতে ৫০টি মসার পিস্তল। মালগুলি পরে বিপ্লবীদের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন পুলিস দুকড়িবালা দেবীর বাড়ী ঘিরে ফেলে। তল্লাসীতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসীমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাঁকে পিস্তলগুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়ীতে রেখে চলে গেলেন পুলিসের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটকও রেহাই পাননি। তাঁর জন্য কারাবাসের আদেশ হয় পাঁচ বছর।

দুকড়িবালা দেবীর কারাবাসের করুণ কাহিনী ননীবালা দেবীর জীবনীতে আগেই লেখা হয়েছে। বন্দীজীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও, প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।

এমনই ছিলেন তখনকার দিনের অগ্রগামী নারী-সৈনিকরা। মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে।

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী



১৮৮৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার সুন্দাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী। পৈতৃকভূমি তাঁর সেখানেই। পিতার নাম শিবসুন্দর রায়, মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী।

ময়মনসিংহের খারুয়া গ্রামের ব্রজকিশোর চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তাঁর যখন ৩২।৩৩ বছর বয়স তখন একটিমাত্র কন্যা নিয়ে তিনি বিধবা হন।

বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুরী ছিলেন তাঁর দেওরপুত্র। ক্ষিতীশ চৌধুরী এবং ময়মনসিংহের বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (পরে বি পি.সি.সি-র প্রেসিডেন্ট) ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরীকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর' দলভুক্ত ক'রে নেন।

১৯১৬ সালের ৩০শে জুন কলিকাতায় গোয়েন্দা-পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার পর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ক্ষিতীশ চৌধুরীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। তাঁরা ময়মনসিংহে পলাতক রইলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীকে নিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে। ক্ষীরোদাসুন্দরী হয়েছিলেন পলাতকদের গৃহকর্ত্রী এবং মা।

তার কিছুদিন পরে সেই আশ্রয়ে এসে রইলেন ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সর্বপ্রধান নেতা যাদুগোপাল মুখার্জী ও বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর। যাদুগোপাল মুখার্জীর নামে তখন দশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।

পলাতকদের এই বাড়ীটি ছিল পুলিস-ক্লাবের একেবারে কাছে। প্রদীপের তলায়ই হচ্ছে অন্ধকার। অত কাছে থেকেও পুলিশ অনেকদিন পর্যন্ত বৃথাই বাইরে বাইরে এঁদের খোঁজ ক'রে হয়রান হয়েছে। এই বিপ্লবীরা কিছুদিন পর্যন্ত মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে অবলম্বন ক'রে ময়মনসিংহে পলাতক রইলেন।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের পিতা কামিনীমোহন ঘোষ ছিলেন এই বিপ্লবী দলের একজন প্রধান ও অতিশয় শ্রদ্ধেয় কর্মী। পুত্রের নেতৃত্ব পিতা কামিনীমোহন ঘোষ অম্লানবদনে মেনে চলতেন। তিনি এঁদের সঙ্গে বাইরের কাজের ও কর্মীদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

একদিন বিপ্লবীরা পুলিসের অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর পেলেন। তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বাদে এই দল মা ক্ষীরোদাসুন্দরীকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের দেওভোগে চলে গেলেন। সেখানে মাস দুই তাঁরা অবস্থান করেন। পুলিস কমিশনার টেগার্ট তখন সারা বাংলায় বেড়াজাল ফেলে রেখেছে বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জী ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের জন্য। এই বেড়াজাল ভেদ ক'রে ছিটকে সরে গেলেন তাঁরা মা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীকে নিয়ে সরিষাবাড়ী।

কিছুদিন বাদে এখানেও পুলিসের ভিতরে চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে তাঁরা বিদ্যুৎ-বেগে অন্তর্হিত হলেন জামালপুরে। জামালপুরে যে বাসা ভাড়া করা হ'ল সেখানেও মা হ'য়ে আশ্রয় দিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরীই। জামালপুরের এই আশ্রয়ে রইলেন যাদুগোপাল মুখার্জী, নলিনীকান্ত কর, সতীশ ঠাকুর, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, কুশা রায়, ক্ষিতীশ বসু ও পৃথ্বীশ বসু।

জামালপুরে প্রায় দেড়মাস থাকার পর সেখানকার আশ্রয়ও পুলিসের নজরে পড়ে গেছে সন্দেহে, তড়িৎগতিতে এই দল পলাতক হলেন সিরাজগঞ্জে। ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক অন্তরে এবং বাইরে হয়েছিল মাতা-পুত্রের। অসুস্থ মায়ের কবিরাজী চিকিৎসার জন্য যেন তাঁরা সিরাজগঞ্জে গেছেন এই কথা ছিল বাইরে প্রকাশ।

প্রায় তিনমাস এখানে পলাতক থাকার পর পুনরায় তাঁরা সন্দেহ করলেন যে, পুলিস খবর পেয়ে গেছে এই আস্তানার। চক্ষের নিমেষে তাঁরা পালিয়ে গেলেন ধুবড়ীতে। পলাতক নলিনীকান্ত কর ও সতীশ ঠাকুরকে আগে থেকেই ধুবড়ীতে পাঠানো হয়েছিল সেখানে একটা ভাতের হোটেল খুলতে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলেন যাদুগোপাল মুখার্জী, কামিনীমোহন ঘোষ, ক্ষিতীশ বসু, পৃথ্বীশ বসু, কুশা রায়, ক্ষিতীশ চৌধুরী, নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রনাথ রায় এবং মা ক্ষীরোদাসুন্দরী।

ঐ দুই পলাতক বিপ্লবী হোটেল-মালিকের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন এতগুলি বিপ্লবী মানুষ। দুইদিন পরে তাঁরা একটা আলাদা বাসা ভাড়া ক'রে হোটেল থেকে পৃথক রইলেন। সকলেই মা ক্ষীরোদাসুন্দরীর দায়িত্বে ও কর্ত্রীত্বে পলাতক রইলেন সেই ভাড়াবাড়ীতে প্রায় দেড়মাস। তারপর তাঁরা এখান থেকে উধাও হয়ে আসামের বিন্নাখাতা গ্রামের ছনখেতের মধ্যে তৈরী একটি বাড়ীতে চলে গেলেন। সাপটগ্রাম স্টেশন থেকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে ছিল এই বিন্নাখাতা গ্রাম।

প্রায় দুইমাস এখানে গৃহকর্ত্রী হয়ে ছিলেন মা ক্ষীরোদাসুন্দরী। এই সময়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য সকলেই এতদিন পর্যন্ত তাঁর খবর না পেয়ে আশঙ্কিত হয়ে খোঁজ করতে আরম্ভ করেন। নানা কথা উঠতে থাকে। তখন মা ক্ষীরোদাসুন্দীকে আর আশ্রয়দাত্রীরূপে রাখা বিপ্লবীরা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁরা তাঁকে প্রথমে কাশী পাঠিয়ে দিলেন, পরে তাঁর শ্বশুরবাড়ী থাকুয়াতে। কাশীতে যে বাড়ীতে তিনি কয়েকদিন ছিলেন সে-বাড়ীর একটা খাতায় তিনি নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে রাখলেন দলের নেতাদের নির্দেশে।

ময়মনসিংহে থাকুয়ার বাড়ীতে পৌঁছবার পর পুলিশ যখন তাঁর বাড়ী ঘেরাও ক'রে তল্লাসী এবং জেরা করল তার এতদিনের অবস্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে, তখন মা ক্ষীরোদাসুন্দরী অতি ভালোমানুষের মতো জবাব দিলেন যে তিনি কাশীতে ছিলেন। পুলিস কাশীর সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে দেখল সত্যি সে-বাড়ীতে তাঁর নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে। পুলিশ শত জেরা করেও সন্দেহ করবার মতো কিছু তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে না পেরে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

আজ ৭৬ বছর বয়সেও তাঁর অতীত স্মৃতি মন্থন ক'রে তিনি সেই ১৯১৬, ১৯১৭ সালের কাহিনী দাজনন্দ্রকণ্ঠে ব'লে যেতে পারেন। সেই দিনে সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীর এই দুঃসাহসিক যাত্রা ও তাঁর কীর্তি পদচিহ্ন রেখে গেছে পরবর্তীকালের কর্মীদের জন্য।

বাসন্তী দেবী



১৮৮০ সালে বাসন্তী দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়। পৈতৃক দেশ তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে নওগাঁও গ্রামে। পিতা বরদানাথ হালদার ও মাতা হরিসুন্দরী দেবীর সঙ্গে ছোটবেলায় তিনি আসামেই থাকতেন। বরদানাথ হালদার আসামের বিজনী স্টেটের দেওয়ান ছিলেন।

১৮৯৭ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বাসন্তী দেবীর বিবাহ হয়েছিল বাইশ-বছরের যুবক চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামে। সেটা ছিল এক বিরাট পরিবার। তিনি দেখেন এ বাড়ীর সকলেই উচ্চশিক্ষিত। সেই উচ্চশিক্ষার পরিবেশের মধ্যে থেকে চিত্তরঞ্জনের কাছেই তিনি শিক্ষা পেতে লাগলেন। শুধু লেখাপড়া নয়, রাজনৈতিক শিক্ষাও। পরবর্তীকালে স্বামীর কর্মজীবনের প্রত্যেকটি দুর্বহ দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে তিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৯২০ সালে যখন দেশবন্ধু নাগপুর কংগ্রেসে ঘোষণা ক'রে এলেন যে, তিনি তাঁর বিরাট ব্যারিস্টারী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবেন তখন সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাঁকে এই ব'লে বাধা দিতে লাগলেন যে, মাসিক অন্ততঃ পঞ্চাশহাজার টাকার এই আয় ছেড়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া তাঁর উচিত নয়। এই বিরাট সংসার কি ক'রে চলবে? তা ছাড়া কত দুঃখী দরিদ্র, অনাথ-আতুরের সেবা ও উপকার করছেন তিনি, সেটাও যে বন্ধ হয়ে যাবে, তাদেরই বা কী গতি হবে?

যখন সকলে মিলে দেশবন্ধুকে এইভাবে বাধা দিতে লাগলেন তখন তিনি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এক এক বার ভাবলেন, সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে তিনি বেরিয়ে যাবেন। তাঁর এই প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বের সময় বাসন্তী দেবী সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। বাসন্তী দেবী তাঁকে বললেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ ব'লে আমি মনে করি না। তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি।" ভোগ-ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার একদিনের একটি সংকল্পেই যেন ফকিরের সংসারে পরিণত হ'ল।

সেদিন যদি বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুর পশ্চাতে না থাকতেন এবং সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজে একা স্বামীকে এভাবে প্রেরণা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ না দিতেন তবে তিনি আজ 'দেশবন্ধু' হতে পারতেন কিনা কে জানে!

অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশবন্ধু। ১৯২১ সালে বাংলার মেয়েরা তখনো অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই। চরকার প্রচলনও খুব কম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্ত্রীকে বললেন, তাঁদের চরকা প্রচলনেব কাজ করতে হবে এবং মেয়েদের সাহস দিয়ে কাজে নামাতে হবে। তখনকার দিনে মেয়েরা বড একটা বাডীর বাইরে যেতেন না —রাজনৈতিক কাজ কবা তো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্বেব ভার পড়ল বাসন্তী দেবীব উপর।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স বোম্বাই আসেন। সেদিন কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। ১৮ই নভেম্বব গভর্নমেণ্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী এবং সভাসমিতিকে রাজদ্রোহমূলক ব'লে ঘোষণা করে।

দেশবন্ধু তাব পবদিনই ১৯শে নভেম্বর বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর কাছে গিযে ওযার্কিং কমিটি থেকে অনুমতি আনলেন গভর্নমেণ্টের এই অন্যায় আইন ভাঙবার।

নিজের পুত্র চিররঞ্জনকে দেশবন্ধু বললেন, "নিজের ছেলেকে আগে জেলে পাঠিয়ে তবেই তো আমি অন্য ছেলেদের ডাকতে পারব।" ৬ই ডিসেম্বর চিররঞ্জন একদল স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে হরতাল ঘোষণা করতে বৌবাজারে এবং কলেজ স্কোয়ারে গেলেন। কলেজ স্কোয়ারে তাঁকে এবং আরো ২১ জনকে সেদিন পুলিস গ্রেপ্তার করে। সার্জেণ্টরা চিররঞ্জনকে প্রহারে জর্জরিত করে ফেলেছিল। বাসন্তী দেবী যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি পুত্রের পিঠে অত্যাচারের চিহ্ন, সার্জেণ্টেব বুটের দাগ দেখে বিচলিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। চিররঞ্জনের প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তার পরদিনই ৭ই ডিসেম্বর বাসন্তী দেবী বেরিয়ে পড়লেন আইন অমান্য ও হরতাল ঘোষণা করতে। চললেন খাদি ঘাড়ে নিয়ে বড়বাজার। তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর ননদ, দেশবন্ধুর সহোদরা উর্মিলা দেবী এবং নারী-কর্মমন্দিরের একজন কর্মী সুনীতি দেবী। তাঁরা হরতাল ঘোষণা করবার পরই তাঁদের তিনজনকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বাসন্তী দেবীরা গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার সামনে জনতা ছেয়ে ফেলল। থানা থেকে তাঁদের বাইরে নিয়ে আসাই তখন অসম্ভব। গান্ধীজীর ছেলে হীরালাল ছিলেন কাছাকাছি একটা দোকানে। হীরালালকে ডাকিয়ে, তাকে দিয়ে বাসন্তী দেবী জনতাকে স'রে যেতে অনুরোধ করলেন। জনতা সত্যই বাসন্তী দেবীর আবেদন মেনে নিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল।

পুলিস তখন তাদের লালবাজারে নিয়ে গেল। চাইল মুচলেকা। তাঁরা মুচলেকা দিতে অস্বীকার করলেন। তারপর রাত প্রায় ৭টায় নিয়ে গেল তাদের প্রেসিডেন্সি জেলে। তাঁরা জামীনে মুক্ত হ'তেও অস্বীকার করলেন।

ওদিকে বড়বাজারের বিরাট জনতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। সকলেই বলে, "আমরাও জেলে যাব।" দলে দলে যুবকেরা গ্রেপ্তার হ'তে লাগলেন।

গভর্নমেণ্ট রাত প্রায ১১টায় বাসন্তী দেবীদের মুক্তি দিলেন। মুক্তি পেয়ে রাত্রি ১২টা নাগাদ যখন বাড়ী ফিরলেন—তিনি দেখলেন দেশবন্ধু তখনো কাজ করছেন। স্ত্রীকে হঠাৎ সামনে দেখে ব'লে উঠলেন, "তুমি ফিরে এলে কেন?"

—"ফিরে আসব না তো এত রাতে কোথায যাব? তারা তো রাখবে না। জেলের গেট বন্ধ ক'রে দিয়েছে।"

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের পরই আগুন জ্বলে ওঠে সারা বাংলাদেশে। তরুণরা উত্তেজিত হ'য়ে দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মেয়েরাও সাড়া দিলেন। সেদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের যে প্রভাব বাংলাদেশ দেখেছিল তার বর্ণনা হয় না। জাতির সে এক বিরাট জাগরণ।

বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের তিনদিন পরেই ১০ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় দেশবন্ধুকে। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর 'বাঙলার কথা' পত্রিকা বাসন্তী দেবীকেই সম্পাদনা করতে হয়। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন এবং দেশবন্ধুর নতুন কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেন। দেশবন্ধু তখনো জেলে।

দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক কাজে বাসন্তী দেবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত রইলেন।

১৯২৫ সালে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু হয়। তারই একবছর পরে ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের মৃত্যু হয়। এই বিপর্যয়ের পর বাসন্তী দেবী নিজেকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছেদ প'ড়ে গেল।



নেলী সেনগুপ্তা



১৮৮৬ সালের ১২ই জানুযারি নেলী গ্রে জন্মগ্রহণ করেন ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ শহরে। তাঁর পিতার নাম ফ্রেডারিক উইলিযাম গ্রে এবং মাতা এডিথ হেনরিযেটা গ্রে।

নেলী গ্রে বিলাতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করেন।

পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক নেতা—চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়তে যান তখন কেম্ব্রিজে নেলী গ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ১৯০৯ সালের ১লা অগাস্ট তাঁদের বিবাহ হয়। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে তাঁরা চট্টগ্রামে চলে আসেন। স্বামীর দেশকেই নেলী সেনগুপ্তা নিজের দেশের মতো ভালবেসেছিলেন। এবং আজও তার সেবা ক'রে চলেছেন।

১৯১০ সালে তিনি প্রথম কলিকাতা আসেন। তাঁর স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে আজীবন দেশের সেবা ক'রে গেছেন। তাঁর স্ত্রী হ'য়ে নেলী সেনগুপ্তাও স্বামীর পাশে থেকে স্বামীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন,—শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার মূলে

তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন শুধু তাঁর স্বামী নন, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিও।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি চট্টগ্রামে খদ্দর বিক্রয় ক'রে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

বার বার গ্রেপ্তার ও কারাভোগ এবং রাজনৈতিক কঠিন কর্মভারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য যখন ভেঙে পড়ে তখন নেলী সেনগুপ্তা তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক কর্মের অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে নেলী সেনগুপ্তাও দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ঐ দুই স্থানেই দেশপ্রিয় বক্তৃতাদান করেন এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁর গ্রেপ্তারের পর দিল্লীতে একটি নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতাকালে নেলী সেনগুপ্তা গ্রেপ্তার হন এবং তার ৪ মাসের কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে নির্বাচিত সভানেত্রী নেলী সেনগুপ্তা বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের সেই অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্তও তিনি অল্ডারম্যান ছিলেন। ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হন।

দেশ-বিভাগের পর তিনি স্বামীর পৈতৃকভূমি চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস করছেন এবং জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

১৯৫৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইংলণ্ডের নারী হয়েও তিনি স্বামীর দেশের পরাধীনতার গ্লানি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন এবং সেই গ্লানি ঘোচাবার কঠোর সংগ্রামে তিনি অকুণ্ঠভাবে যোগদান করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্ভোগ তিনি আজও অম্লানবদনে বহন ক'রে চলেছেন এবং বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা নিয়েও পাকিস্তানের সাধারণ লোকের সামান্য সুবিধা ও অধিকারের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন।



ঊর্মিলা দেবী



ঊর্মিলা দেবীর দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ, মাতা নিস্তারিণী দেবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ছোট ভগ্নী তিনি।

১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর বড়বাজারে খদ্দর বিক্রি করতে এবং ২৪শে ডিসেম্বর যখন প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স কলিকাতা আসবেন সেদিনটা হরতাল ঘোষণা করতে ঊর্মিলা দেবী বেরিয়ে পড়েন বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। তাদের গ্রেপ্তার ও তার পরিণতি বাসন্তী দেবীর জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।

দেশবন্ধুর প্রেরণায় ঊর্মিলা দেবী মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯২১ সালে তিনি 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল চরকা ও খদ্দর জনপ্রিয় করা এবং দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচার করা। সুনীতি দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি এই কর্মমন্দিরের উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু নেতা ও পুরুষ কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যান। সেই সময় সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করা বে-আইনী ছিল। এই 'নারী কর্মমন্দির' তখন বে-আইনী সভা এবং আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ

করে। নেতৃত্ব ছিল ঊর্মিলা দেবীর উপর। অত্যধিক পরিশ্রমে ঊর্মিলা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার এসে পড়ল হেমপ্রভা মজুমদারের উপর। পরে ঊর্মিলা দেবী নারী-কর্মমন্দিরের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন অসুস্থতার কারণে। কিন্তু রাজনীতি ছেড়ে দেন নাই। ১৯২৬ সালে সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী তখন ঊর্মিলা দেবী তাঁর সঙ্গে বহুস্থানে রাজনৈতিক পর্যটন করেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। ঊর্মিলা দেবী এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তিনি সেই সময় আইন অমান্য ক'রে কারাবরণ করেন।

১৯৩১ সালের শেষদিকে হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালানো হয়। এর ফলে দুজন রাজবন্দী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত ও অনেকে আহত হন। ঊর্মিলা দেবী এই সময় জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন ও জেলখানার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১৯৫৬ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।



হেমপ্রভা মজুমদার



১৮৮৮ সালে নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন হেমপ্রভা মজুমদার। পিতা গগনচন্দ্র চৌধুরী, মাতা দিগম্বরী দেবী।

ত্রিপুরা জেলার কাশীনগর গ্রামের বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বসন্তবাবু ১৮৯৩ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী। স্বামীর নিকট থেকেই হেমপ্রভা মজুমদার দেশসেবার প্রেরণা পান।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জনকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এমন প্রহার করে যে, গুজব রটে যায় চিররঞ্জন প্রহারের ফলে মারা গেছেন। হেমপ্রভা দেবী সেই রাত্রেই চলে গেলেন আলিপুর জেল গেটে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রাহ্যই করল না। হেমপ্রভা মজুমদার গর্জন ক'রে উঠে বলতে লাগলেন, চিররঞ্জনের খবর জানবার জন্য জনতা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। যদি তিনি কোনো খবর না নিয়ে ফিরে যান তবে তারা মনে করবে যে চিররঞ্জনের মৃত্যুর খবরই সত্য। তখন তারা দেশে যে আগুন জ্বালাবে তাকে নিভিয়ে দেবার শক্তি জেল-কর্তৃপক্ষের নেই। এই হুঙ্কারে জেল-কর্তৃপক্ষ নরম

হয়ে গেল এবং দেশবন্ধুর ছেলের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিল। পুলিসের সঙ্গে, জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাল্লা লড়বার মতোই তেজস্বিনী নারী হেমপ্রভা মজুমদার।

১৯২১ সালে উর্মিলা দেবী 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ সময়কার আন্দোলনে নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর বে-আইনী সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনা করবার ভার এসে পড়ল 'নারী কর্মমন্দির' ও তার নেত্রী উর্মিলা দেবীর উপর। কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করার পর উর্মিলা দেবী অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। তখন পুলিসের অত্যাচার অগ্রাহ্য ক'রে সভা-সমিতি ও আন্দোলন পরিচালনার ভার এসে পড়ে হেমপ্রভা দেবীর উপর। সেই সময় কলেজ স্কোয়ারে একটি বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত করবার সময় পুলিস একটি ছেলেকে বেটন দিয়ে প্রহার করছে দেখে যখন তিনি তাকে রক্ষা করতে যান তখন সার্জেন্টের বেটনের প্রহারে তিনি আহত হন ও তাঁর একটি আঙুল ভেঙে যায়।

১৯২১ সালে চাঁদপুরে ও গোয়ালন্দে স্টীমার-ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের কালে হেমপ্রভা দেবী তাঁর স্বামী বসন্ত মজুমদারের সঙ্গে ধর্মঘটকারীদের এবং আসাম-প্রত্যাগত চা বাগানের কুলীদের অকৃত্রিম সেবা করেন। এই সেবা-কাজের জন্যই ছয়মাস পর্যন্ত তিনি গোয়ালন্দে এসে অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। ধর্মঘট সফল হয়।

সেখান থেকে তিনি নারায়ণগঞ্জ গিয়েও স্টীমার-ধর্মঘট করান এবং মেয়েদের সংগঠন করেন।

'নারী কর্মমন্দির' উঠে যাবার পর ১৯২২ সালে হেমপ্রভা দেবী কলকাতায় 'মহিলা কর্মী সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি একবছরের জন্য কারারুদ্ধ হন; সঙ্গে তাঁর দুটি মেয়ে শান্তিপ্রভা ধর এবং অরুণা কর-ও কারাবরণ করেন।

১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন-আইনে নারী ভোটাধিকার পায়। মহিলাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত মহিলাগণ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হবার অধিকার পেলেন। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান-সভাতে সদস্যা নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়। সুভাষচন্দ্র

বসু মূল কংগ্রেস থেকে আলাদাভাবে যে কংগ্রেস পরিচালিত করেন, হেমপ্রভা দেবী তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। তখন হেমপ্রভা দেবী তাতে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্তর্ধানের পর হেমপ্রভা দেবীর উপর ফরওয়ার্ড-ব্লকের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত হয়।

১৯৪৪ সালে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন।

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করছেন।



মোহিনী দেবী

★

মোহিনী দেবী ১৮৬৩ সালের (বাংলা ১২৭০ সাল) ২০শে ফাল্গুন ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বেউথা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামশঙ্কর সেন এবং মাতা উমাসুন্দরী দেবী। সেই যুগে বাংলাদেশের প্রগতিমূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবার বিশেষ জড়িত ছিল।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রথম হিন্দু ছাত্রী ছিলেন মোহিনী দেবী। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নিকট তার শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরে ইউনাইটেড মিশনের শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁকে ইংরাজি শিক্ষা দেন।

বারোবৎসর বয়সে মোহিনী দেবীর বিবাহ হয় তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে। তারকচন্দ্র দাশগুপ্ত দর্শন বিষয়ে বই লিখে বিদ্বৎসমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

মোহিনী দেবীর কন্যা ডাক্তার প্রভাবতী দাশগুপ্তা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম আমলের মহিলা গ্রাজুয়েটদের অন্যতম। তিনি কলিকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী পান। বাংলার শ্রমিক-আন্দোলনের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাত্রী। মোহিনী দেবীর অন্যান্য সন্তানগণও কৃতী।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বাল্যবিবাহে বাধাদান প্রভৃতি ব্যাপারে মোহিনী দেবী সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি একদিকে সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি নিজে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে কখনো দ্বিধা বোধ করতেন না।

১৯২১-২২ সালে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে বিরাট এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পান। সেসময়ে ঐ আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি গ্রেপ্তার হন।

১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি কলিকাতার রাজপথে পিকেটিং, খদ্দর ফেরী প্রভৃতি সরকার-বিরোধী কাজে নেতৃত্ব করেন এবং তাঁর ছয়মাস কারাদণ্ড হয়। পরে আরো ছয়মাস তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন।

'নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনী'র সভানেত্রী হিসাবে অগ্নিগর্ভ ভাষায় তিনি যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন সে যুগে সকলেই তার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

গান্ধীজীর আদর্শে তার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। কলিকাতায় ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেও, দাঙ্গা-অধ্যুষিত মুসলমান প্রধান অঞ্চল এন্টালিবাগানে তার নিজের বাড়ীতে অবস্থান ক'রে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের বাণী প্রচার করতেন। সেই সময় তাঁর বন্ধুবান্ধব সকলেই তাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকেন।

তার মধ্যে কোনো দলীয় সংকীর্ণতা ছিল না। সেজন্য দলমত নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। তার ছিল অসাধারণ মানসিক শক্তি ও গভীর আত্মবিশ্বাস। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ এই বরেণ্য নেত্রীর দেহাবসান হয়।



জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী



১৮৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রসিদ্ধ সমাজসেবক, দেশকর্মী ও নারী-কল্যাণব্রতী। মাতা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট (১৮৮৩)। তিনি শুধু ডাক্তারই ছিলেন না, ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কর্মী এবং সমাজ-সেবিকাও।

পিতামাতার নিকট থেকেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী পেয়েছিলেন জীবনের সকল শিক্ষা ও প্রেরণা। তাঁদের মতোই সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্মী। যেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ।

তিনি এম.এ. পাস করার পর বেথুন স্কুল, কটক র‍্যাভেনশ' গার্লস কলেজ, কলম্বো বুদ্ধিস্ট গার্লস্ কলেজ, জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল প্রভৃতি নারী-শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষারূপে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' সংগঠনেও তাঁর দান অনেকখানি।

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী গঠন করলেন নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী। এদেশের নারী

এইবার প্রথম প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন সংঘবদ্ধভাবে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর অধিনায়কত্বে মেয়েরা সাহসের সঙ্গে প্রকাশ্য অধিবেশনে কাজ ক'রে সকলকে বিস্মিত করলেন। তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দলবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে আসা এবং কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কম দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল না। সেই সময় তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করাও কম দক্ষতার কথা নয়। দেশবন্ধু তাঁর পারদর্শিতা দেখে তাঁকে কর্পোরেশন প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির সহায়ক সদস্যা রূপে গ্রহণ করেন। তারপর জ্যোতির্ময়ী দেবী জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার জন্য, কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করবার জন্য বহু সভা সমিতি, যুব সম্মেলন ও জেলা সম্মেলন প্রভৃতির সভানেত্রী রূপে দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

১৯৩০ সালে তিনি চাকরীর মায়া ত্যাগ ক'রে মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যে শুধু নিজে যোগদান করেছিলেন তা নয়, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা সমিতিতে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সর্বসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রেরণা দিয়েছেন। ঐ দুইবারের আন্দোলনেই তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম দুইজন মহিলা কাউন্সিলারের মধ্যে তিনি অন্যতম কাউন্সিলার রূপে নির্বাচিত হন।

তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু। তাঁর হৃদয় ছিল দরদী। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' এর মোকদ্দমার সময় কলিকাতার ছাত্ররা দলবদ্ধ ভাবে ঐসব বন্দীদের মুক্তির জন্য শোভাযাত্রা করেছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন ডালহাউসি স্কোয়ারে। তখন সেটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। পুলিস আটকে রাখল তাঁদের ধর্মতলায়। ছাত্ররা এগিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। পুলিস গুলী ছুঁড়তে লাগল। ছাত্ররা পুলিসের গুলীর সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন। আহতের সংখ্যা অনেক। নিয়ে গেছে তাঁদের হাসপাতালে। নিহত হয়েছেন কিশোর ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত প্রায় বারোটার সময় ঐ ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সশস্ত্র পুলিসের ব্যূহ ভেদ ক'রে ছাত্রদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন ধর্মতলায়। তিনি কম্পিতকণ্ঠে ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে বললেন—"তোমাদের মৃত এবং আহত বন্ধুদের দেখে আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। বাংলার ছাত্র, তোমরা

অসীম বীরত্ব দেখিয়েছ। পুলিসের গুলী তোমাদের ভয় দেখাতে পারেনি, ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি, তোমরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছ, দিয়েছ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের চ্যালেঞ্জের উত্তর। সমস্ত দেশের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তোমাদের মাথায়।" সারা রাত্রি রইলেন তিনি ছাত্রদের পাশে ধর্মতলার রাস্তায়।

দ্বিতীয় দিনে দ্বিগুণ ছাত্র এসে যোগ দিলেন ধর্মতলার ছাত্রদের সঙ্গে। তাঁদের সংকল্প দেখে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আরো শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। আরো গুলী বর্ষিত হ'ল, আরো রক্ত ছাত্রদের বুক থেকে বয়ে গেল। অনেক রক্তের বিনিময়ে বিজয়ী বীর ছাত্ররা সেদিন ডালহাউসি স্কোয়ারে যাবার দাবী আদায় করেছিলেন। ছাত্রদের বিদ্রোহের কাছে বৃটিশ সিংহের মাথা নত করতে হয়েছিল।

এই দ্বিতীয় দিনেই ২২শে নভেম্বর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছাত্রদের শোভা-যাত্রার নেতৃত্ব ক'রে চলেছিলেন শ্মশানে। শহীদ রামেশ্বরের শবদেহ বহন ক'রে শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল। পথে মিলিটারী ট্রাক পশ্চাৎ থেকে এসে তাঁর মোটরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়। এই দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু ছাত্র-আন্দোলনে তার ভূমিকার গৌরবময় পরিণতি।



লাবণ্যপ্রভা দত্ত

★

১৮৮৮ সালে পিতার মামাবাড়ীতে বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লাবণ্যপ্রভা দত্ত। মানুষও হন সেখানেই। সেটা ছিল গোঁড়া পর্দানশীন এক বৈষ্ণব জমিদার পরিবার। পিতা হেমচন্দ্র রায় এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবী।

ঐ জমিদার-বাড়ীর নিয়ম ছিল—গ্রহণ লাগলেই বাড়ীর বৌ ও মেয়েদের সবাইকে পাল্‌কি ক'রে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে পাল্‌কিসুদ্ধ ঠিক বেড়াল-চুবানির মতো চুবিয়ে আনা হবে। বাড়ী এসে তারা কাপড় বদলাবে। সাতবছরের বালিকা লাবণ্যপ্রভা এক শীতের গ্রহণের রাতে পাল্‌কি-বন্দী হয়ে গঙ্গায় না গিয়ে বাড়ীতে লুকিয়ে রয়ে গেলেন। তিনি সেদিন মনে মনে সংকল্প করলেন যে, বড় হয়ে এই নিষ্ঠুর প্রথা দূর করবেন। সত্যই যখন ১৯৩০ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন বহরমপুরে গিয়ে ঐ গোঁড়া জমিদার-বাড়ীর বৌদের বাইরে নিয়ে এসে তিনি সভা অনুষ্ঠিত করেন এবং সেখানে চার জায়গায় চারটি মহিলা-সমিতি গঠন করেন। গোঁড়া পরিবারের মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসা তখন বড় সহজ কথা ছিল না।

ন'বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামের যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। তাঁর স্বামী প্রথমে কলিকাতায় উকিল ছিলেন। পরে বৈষয়িক কাজে সাতক্ষীরাতে ওকালতি করতে যান।

লাবণ্যপ্রভা দত্তের বড় ভাই সুরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বিপ্লবী বারীন ঘোষের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে জড়িত। বড় ভাইয়ের কাছ থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মের প্রথম প্রেরণা পান। তিনি দাদার দেওয়া রিভলভার ও নিষিদ্ধ পুস্তক লুকিয়ে রাখতেন।

তাঁর দাদা যখন মারা যা'ন তখন লাবণ্যপ্রভা দত্তের বয়স আঠারো। মৃত্যুর পূর্বে ছোট বোন লাবণ্যপ্রভা দত্তের মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ ক'রে যান যে, তিনি যেন দেশসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। সেই কথা লাবণ্যপ্রভা দত্ত ভোলেননি সারা জীবন।

১৯০৬ সালের স্বদেশী যুগে তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতেন, স্বদেশী ছেলেদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। এমনকি তার প্রভাবে তাঁর স্বামীও মত বদলে স্বদেশীভাবাপন্ন হন।

লাবণ্যপ্রভা দত্তের তেইশবছর বয়সের সময় অকস্মাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। অসীম দুঃখসাগর তাকে ঘিরে ফেলে। তিনি পুরী চলে গেলেন। রামদাস-বাবাজীর নিকট থেকে সেখানে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বহুদিন তিনি পুরীতে রইলেন। তারপর তাঁর ছোট মেয়ে ও পিতার মৃত্যুর পর পুরী ছেড়ে তিনি প্রথম নবদ্বীপ ও পরে কলিকাতায় আসেন।

সেই বছরেই ১৯২৯ সালে লাহোর জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। যতীন দাসের শ্মশানে দাঁড়িয়ে তিনি ও তাঁর কন্যা শোভারাণী প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁরা দেশসেবায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন।

১৯৩০ সালে লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং কন্যা শোভারাণী দত্ত 'আনন্দমঠ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শ নিয়ে। এখান থেকে অনেক কর্মীকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে পাঠানো হ'ত।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। তার যুগ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন শান্তি দাস (কবীর) ও বিমলপ্রতিভা দেবী। 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'-র আহ্বানে লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও শোভারাণী দত্ত কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে

আন্দোলন পরিচালনা করেন। দুজনেই বড়বাজারে গিয়ে নিজেরা পিকেটিং করতেন এবং পিকেটিং করবার জন্য মহিলা কর্মী সংগ্রহ করতেন। এই সময় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে লাবণ্যপ্রভা দত্ত মহিষবাথান চলে যান।

ফিরে আসার পর তিনি 'যতীন্দ্র স্মৃতিমন্দির'-এর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। স্মৃতিমন্দির থেকে বহু কর্মীকে পিকেটিং ও আন্দোলনে যোগদান করতে পাঠানো হ'ত।

একদিন বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী এসে তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগ দিয়ে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের কাজ করতে আহ্বান করেন। সেই সময় ১৯৩০ সালে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী এবং প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসু। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস থেকে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল তার পরিচালনা করতে করতে লাবণ্যপ্রভা দত্ত গ্রেপ্তার হন। তাঁর প্রতি তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তাঁর জেল থেকে ফিরে আসার পর সেক্রেটারি চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী আন্দোলন পরিচালনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাঁর কারাদণ্ডের পর লাবণ্যপ্রভা দত্ত দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এইসময় দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে সঙ্গে শোভারাণী দত্তের দানও অনস্বীকার্য।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত শুধু যে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন, তাই নয়, তিনি চব্বিশ-পরগনা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্টও নির্বাচিত হন।

চব্বিশ-পরগনার নীলা গ্রামে একদিন তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে যান। নীলা গ্রামের হাটের মধ্যে সেদিন আইন-অমান্যকারীরা জমায়েত হচ্ছিলেন। মায়ের একমাত্র সন্তান আশু দলুই দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তিনি হাটের মধ্যে পুলিসের সঙ্গে আইন-অমান্যকারীদের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে জেগে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান আইন-অমান্যকারীদের মধ্যে। সেই সময় পুলিস জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়বার পূর্বে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছিল। পুলিসের সেই চ্যালেঞ্জ শুনে আশু দলুই সামনে এগিয়ে গিয়ে

বললেন, "আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, গুলী কর।" পুলিশের গুলীতে আশু দলুইর রক্তাক্ত দেহ মুহূর্তে ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। তাঁর মৃত্যু সেদিন আইন-অমান্যকারীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে শিখিয়ে গেল। কিন্তু আজ সেই অনাথিনী মায়ের একমাত্র সন্তান আশু দলুইকে কেই বা মনে রেখেছে? ক'জনই বা তাঁর নাম শুনেছে?

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবসে দক্ষিণ কলিকাতায় লাবণ্যপ্রভা দত্ত এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। শোভাযাত্রায় পুলিসের লাঠির আঘাতে তাঁর ডান হাতখানা ভেঙে যায়। তার পরদিনই ভোরে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা অনেকে ডায়মণ্ডহারবারের 'বাণীমন্দির'-এ গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানকার কর্মী প্রেমলতা বসু (বিপ্লবী দুর্গাচরণ বসুর স্ত্রী) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা গেলেন কোর্টে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে। প্রেমলতা বসু যখন লাবণ্যপ্রভা দত্তের উপর পুলিসের লাঠিচার্জের ফলে ভেঙে-যাওয়া হাতখানা জনতাকে দেখালেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগলেন তখন জনতা ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারাও দলে দলে এগিয়ে গেল আইন অমান্য করতে। এবারে রাজদ্রোহের অভিযোগে লাবণ্যপ্রভা দত্তকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালে পুনরায় তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। হরিশ পার্কে হিজলীর রাজবন্দীদের উপর গুলী চালনার প্রতিবাদে বক্তৃতা দেবার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর পুনরায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতরে ফিমেল-ইয়ার্ডে বিধবাদের নিজেদের রান্না ক'রে খাবার অধিকার পাবার জন্য তিনি ঐ জেলে ১৪ দিন অনশন ক'রে সফল হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে তিনি বি.পি.সি.সি.-র মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ যখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান ক'রে জেলে চলে যান তখন তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্তকে বি.পি.সি.সি.-র সভানেত্রী মনোনীত করেন। ১৯৪১ সালে তিনি বি.পি.সি.সি. থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি বি.পি.সি.সি.-র সভানেত্রী ছিলেন। ঐ শেষ সংগ্রামের সময় অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তিনি কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা

করেছিলেন। তারপর পূর্বতন সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ জেল থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে সভাপতির পদ ছেড়ে দেবার জন্য তিনি নিজে পদত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত ও আদর্শনিষ্ঠ সৈনিক লাবণ্যপ্রভা দত্ত বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য ক'রে হাসিমুখে অগ্রসর হ'যে চলেছিলেন। এই মাতৃসমা স্নেহময়ী নেত্রীর প্রেরণায় কত সৈনিক যে সেদিন কারাগৃহে প্রবেশ করেছিলেন তার সংখ্যা কেউ রাখেনি।



চারুশীলা দেবী

★

১৮৮৩ সালে মেদিনীপুবে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন চারুশীলা দেবী। দেশ তাঁদের মেদিনীপুবেই। পিতা বাখালচন্দ অধিকাবী, মা কুমুদিনী দেবী।

চারুশীলা দেবী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব প্রথম ছাত্রী। শিশুবয়স থেকেই তিনি ছিলেন পাঠপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। বাবোবছর বয়সে তাঁব বিবাহ হয়েছিল মেদিনীপুরেব বীবেন্দ্রকুমাব গোস্বামীব সঙ্গে।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অগ্নিশিশু ক্ষুদিবাম থাকতেন মেদিনীপুর শহবের উপকণ্ঠে হবিবপুরে তাঁব দিদিব কাছে। তিনি প্রাযই চারুশীলা দেবীব বাড়িতে আসতেন। তাঁকে ক্ষুদিবাম এত ভালবাসতেন যে, মাঝে মাঝে দিদিব বাড়ী থেকে চলে এসে তাঁব কাছে থাকতেন। ক্ষুদিরাম ছিলেন চারুশীলা দেবী অপেক্ষা কযেক বছবের ছোট। ক্ষুদিবাম জন্মগ্রহণ কবেছিলেন ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯০৫ সালে ক্ষুদিরাম বিপ্লবীদলে যোগদান কবেন। চারুশীলা দেবীকেও একদিন ক্ষুদিরাম বক্ততিলক পরিয়ে স্বদেশীর প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নেন।

এই প্রতিজ্ঞাব পব ১৯০৬ সালের ফেব্রুযারি মাসে একদিন মেদিনীপুরের পুরানো-কেল্লার এক প্রদর্শনীব দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি পুস্তিকা বিলি করছিলেন। পুলিস ক্ষুদিরামেব হাতে পুস্তিকা দেখে

সেগুলি কেড়ে নিতেই ক্ষুদিরাম পুলিসকে মেরে বসলেন। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন।

মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের প্রধান সমর্থক ও সাহায্যদানকারী রাজা নরেন্দ্রলাল খান অকাতরে টাকা দিয়ে এই মামলা পরিচালনা করান। অবশেষে ক্ষুদিরাম মুক্তি পেলেন। তারপর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়ার আগে ক্ষুদিরাম চারুশীলা দেবীর বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। ক্ষুদিরামের মামলার সময় পুলিস চারুশীলা দেবীর খোঁজ করতে থাকে। তিনি তখন আত্মগোপন ক'রে রইলেন। এরই কয়েকবছর পর তিনি বিধবা হন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি মেদিনীপুরে যান। ঐ সময় তাঁদের প্রেরণায় মেদিনীপুরে নারীজাগরণ দেখা দেয়। চারুশীলা দেবীও একটি মহিলা-সমিতি গঠন করেন।

১৯২২ সালে তিনি কলিকাতায় ট্রেনিং পড়তে আসেন। তারপর মেদিনীপুরে ফিরে গিয়ে পুনরায় মহিলাদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্যের সময় তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নরঘাটে একটা জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল, বক্তা চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এই মিটিং ভেঙে দেবার জন্য মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। পেডি আদেশ দিলেন, "১৪৪ ধারা জারী আছে, মিটিং ক'রো না।" জ্যোতির্ময়ী দেবী পুলিসের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে জনতাকে আহ্বান ক'রে বললেন, "যাঁরা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা এই সভায় এগিয়ে আসুন, যাঁরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন তাঁরা ফিরে যান।" এই আহ্বান শুনে সাবিত্রী নামে তমলুকের এক সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী ষোড়শী পতিতা নারী এসে বললেন, "আমরা বুকের রক্ত দেব কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না।" তাঁর পশ্চাতে প্রায় আটশত গ্রাম্য মেয়ে ও বৌ কোলে-পিঠে সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, তাঁরাও এই সভা রক্ষা করবার জন্য জীবন বিসর্জন করবেন। তাঁরা পুরুষদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভা সাঙ্গ ক'রে তাঁরা সকলে মিলে লবণ-তৈরীর ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী এই সময় জনতার উপর লাঠিচার্জ করে।

একটি দশবছরের বালকের চোখে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিজেই আঘাত হেনে রক্তাক্ত করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ পতিতা নারী সাবিত্রী ছুটে এসে

নিজেব পরনের খদ্দরের শাড়ী ছিঁড়ে তার চোখ বেঁধে কোলে নিয়ে বসলেন। এ দৃশ্য সেদিন মেদিনীপুরেব জনসাধারণকে বিস্মিত ও বিচলিত ক'রে তুলেছিল। পেডি সেদিন সেখানে প্রায় একঘণ্টা লাঠিচার্জেব হুকুম-জাবী রেখেছিলেন।

পরের দিন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও চারুশীলা দেবীরা কাঁথি, কালীনগর ইত্যাদি স্থানে গিয়ে পুনরায় সভার আয়োজন করেন এবং জনসাধারণকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান কবতে আহ্বান কবেন।

বে আইনী লবণ তৈবী করাব অপবাধে কর্মী ঝাড়েশ্বব মাঝিব কাবাদণ্ড হয়। তাঁব মায়েব সঙ্গে দেখা কবতে গিযে চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী জানতে পাবলেন যে, তাদেব প্রায় আটশত মণ ধান পুলিস মাঠেব মধ্যে ঢেলে ফেলে পড়িযে দিয়েছে। কিছু ধান পুকুবে ফেলেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ এই আদর্শ কৃষক-পবিবাবেব সমস্ত কৃষিজাত সম্পদ ও কৃষিব বাগান পুলিস নষ্ট কবে দিয়েছে। চবকা, তৈজসপত্র, গৃহদেবতা সবই তাবা ধ্বংস কবে গেছে।

তাবা আবো দেখলেন যে, ঝাড়েশ্বব মাঝিব মা দুই টুকবো বস্ত্রখণ্ডে কোনোবকমে লজ্জা নিবাবণ ক'বে আছেন। ছেলে দুটি কৌপীন পবেছেন। চারুশীলা দেবী ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীকে বৃদ্ধা বীব নাবী বললেন—"আমার আটশত মণ ধান নষ্ট কবেছে, আবাব ষোলোশত মণ ধান হবে। আমার কিছু ক্ষতি হয়নি। আবাব আমি সভা কবব। একটা ছেলেকে গ্রেপ্তাব করেছে, এখনো দুটো ছেলে মা ব'লে ডাকে। লবণ আইন অমান্য আমি তো কববই।"

এই অনমনীয় নারীব উক্তিতে সেদিন মেদিনীপুবের পল্লীগ্রামের নাবীদের সাহসেব ছবি ফুটে ওঠে চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবীব চোখে। তাঁবা বে-আইনী সভা আহ্বান কবতে করতে অগ্রসব হন।

চন্দ্রাকরে গিযে চারুশীলা দেবী এরূপ একটি সভায় বক্তৃতা কববাব সময় লাঠিচার্জ হয। নবঘাটেব মতোই এবাবেও মেদিনীপুবেব দুঃসাহসী নাবীরা নেত্রীদের আহ্বানে লাঠিচার্জকে অগ্রাহ্য ক'রে সভা অনুষ্ঠিত করেন। চারুশীলা দেবীব নামে গ্রেপ্তারী পরোযানা বের হয়। তিনি পলাতক অবস্থায় খড়গপুরে এসে শ্রমিক ইউনিযনের এক সভা আহ্বান করেন, সত্যাগ্রহীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। সেখানে হাজাব হাজার লোকেব জনতাকে উত্তেজিত দেখে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার কবতে সাহস পায়নি।

ঐ সংগৃহীত টাকা নিয়ে তিনি কাঁথি রওনা হন। যে বাসে তিনি ওঠেন সেই বাসে এবং সঙ্গেব আরো কয়েকটা বাসে ছিল শুধু পুলিস। চারুশীলা দেবী

সংগৃহীত পাঁচশত টাকা ও গহনা নিয়ে ড্রাইভারের পাশে ব'সে রইলেন অসীম দুঃসাহসে। রাত প্রায় দুইটায় কাঁথি পৌঁছে তিনি সেই অর্থ ও গহনা নেতা অন্নদা চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

৭ই অগাস্ট একটা বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করাব সময় মেদিনীপুর শহরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মেদিনীপুর জেলের ভিতরে গিয়ে বিধবাদের নিজ হাতে রান্নার অধিকারের জন্য তিনি অনশন করেন। কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাঁর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৩০ সালে মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ফলে চারুশীলা দেবীর বাড়ী তিনমাসের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত থাকাকালে তাঁর বাড়ীর জিনিসপত্র, গহনা ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি প্রায় সত্তরহাজার টাকা মূল্যের জিনিস চুরি যায়।

১৯৩১ সালের শেষে তাঁকে একমাসের জন্য জেলে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখা হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দেড়বছরের কারাদণ্ড লাভ করেন। এবারে বাইরে আসার পর তিনি পাবনা যান। সেখানে এক সভায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়াতে ১৯৩৩ সালে তাঁর পুনবায় একমাসের কারাদণ্ড হয়। কারাভোগের পর ফিরে এলেন তিনি মেদিনীপুরে।

১৯৩৩ সালেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বাজকে বিপ্লবীরা হত্যা করেন। তখন চারুশীলা দেবীকে মেদিনীপুর জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয় আটবছরের জন্য। তিনি পুরী চলে যান। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক পিউনিটিভ পুলিসের ট্যাক্স আদায় করবার জন্য তাঁর বাড়ী ও জমি নিলাম হয়ে যায়।

পরে গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ওই আটবছরের বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং তিনি ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় চলে আসেন।

গৃহহারা, বাস্তহারা ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি কলিকাতার রাস্তায় সাতদিন ঘুরে বেড়ান। তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার শৈলেন ঘোষ তাঁকে কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা কোথাও তাঁকে মাথা নত করতে শেখায়নি।



শান্তি দাস (কবীর)



শান্তি দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালে দেবাদুনে। পৈতৃক ভূমি তার শ্রীহট্ট। পিতা হৃদয়চন্দ্র দাস, মাতা অশোকলতা দাস। মা সন্তানদের শিশুকাল থেকেই সেবা ও ত্যাগের উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে লালনপালন করেছিলেন।

শান্তি দাস ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম এ পাস করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ও তাঁর ভগ্নী প্রীতি দাস (চ্যাটার্জী) কলিকাতায় নিজেদের বাসভবনে 'দীপালী শিক্ষামন্দির' নামে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থের কোনো সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অনেক পরিশ্রম ক'রে মা, দুই ভগ্নী এবং কয়েকটি বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠানটিকে বিদেশী সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পরিচালিত করেন। মেয়েদের স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাবলম্বী ক'রে গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সেখানে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রয়াস করা হয়েছিল।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য গান্ধীজীর আহ্বান শান্তি দাস এবং তাঁর মাতা ও ভগ্নীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিদেশীর কবল থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেছিল।

১৯৩০ সালে শান্তি দাস এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেস-নেত্রী ও কর্মী কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সংগঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু কর্মিগণ কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন ঊর্মিলা দেবী। যুগ্ম-সম্পাদিকা ছিলেন শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী।

বাংলার নারী এবার প্রত্যক্ষভাবে দলে দলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করলেন। সত্যাগ্রহীরা জেলখানা ভ'রে ফেললেন। শুধু বাঙালী নন, বহু অবাঙালী নারীও এই সমিতিতে যোগ দিয়ে সত্যাগ্রহ ক'রে কারারুদ্ধ হন।

সমিতির সত্যাগ্রহী নারীরা বিদেশী বস্ত্রের বিক্রী বন্ধ করবার জন্য বড়বাজার গিয়ে পিকেটিং করতেন, বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত করতেন। পুলিসের লাঠিচার্জ, বেটনের প্রহার, ঘোড়ার পদতলে নিষ্পিষ্ট হওয়া প্রভৃতি সমস্ত নির্যাতন বরণ ক'রে নারীরা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। পুলিস এইসকল মহিলাদের অনেকসময় বন্ধ ভ্যানে তুলে নিয়ে বহু দূরে নির্জন গ্রামে ছেড়ে দিয়ে চলে আসত। নবজাগ্রত নারী অকুতোভয়ে সেই ভয়সংকুল অবস্থা পার হয়ে চলে আসতেন—তখন বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ শক্তি তাঁদের হৃদয়ে। এ তরঙ্গ রোধ করবার সাধ্য কারো ছিল না।

সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে করতে শান্তি দাস গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর মাতা অশোকলতা দাস এবং ভগ্নী প্রীতিলতা দাসও আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে কারাবরণ করেন।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে শান্তি দাসকে বিভিন্ন স্থানে চারবার বন্দীজীবনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তিনি হাসিমুখে সকল নির্যাতন বরণ ক'রে অন্যান্য কর্মীদের মনে প্রেরণা জাগিয়ে চলেছিলেন। বর্তমানে তিনি নানা সমাজ-সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১৯৩২ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী।



বিমলপ্রতিভা দেবী



১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে কটকে বিমলপ্রতিভা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক দেশ তাঁদের নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মাতা ইন্দুমতী দেবী।

বিমলপ্রতিভা দেবী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ও বধূ। পিতা প্রবর্তক-সংঘের কর্মী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তিনি শৈশবেই স্বদেশী কাজে অনুপ্রাণিত হন।

তাঁর বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত ধনী পরিবার জে. সি. ব্যানার্জীদের বাড়ীর ডাক্তার চারুচন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে। এই গোঁড়া পরিবারকে চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছিল সংস্কারের কঠিন শৃঙ্খল।

পিতার স্নেহভাজন একজন বিপ্লবী কর্মীর প্রভাবে ১৯১৮ সাল থেকে বিমলপ্রতিভা দেবী ক্রমেই বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা লাভ করেন।

১৯২১ সালে উর্মিলা দেবীর 'নারী কর্মমন্দির'-এ যোগদান ক'রে তিনি বাড়ীর অজ্ঞাতসারে অসহযোগ আন্দোলনের কাজ করতে থাকেন। বাড়ীর প্রচণ্ড বাধা তাঁকে রুদ্ধ ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে পারেনি।

১৯২৭ সালে তিনি 'ভারত নওজোয়ান সভা'-র বাংলা শাখার প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হন। 'নওজোয়ান সভা'-র নিখিল ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভগৎ সিং। এই সূত্রে বাংলার বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিমলপ্রতিভা দেবীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

১৯২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যা কিছু কাজ করেছেন সবই গোপনে। কিন্তু ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় তিনি খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করতে থাকেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি, শান্তি দাস (কবীর) প্রভৃতি কংগ্রেস নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সংগঠন করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিমলপ্রতিভা দেবী 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন।

১৯৩০ সালের ২২শে জুন দেশবন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি দিবস পালন উপলক্ষ্যে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত। বিমলপ্রতিভা দেবী এই বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় অংশগ্রহণ করাতে তাঁর ছয়মাস কারাদণ্ড হয় ২৬শে জুন।

এই সময় তিনি বিপ্লবী দলেও কাজ করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের মামলা পরিচালনার জন্য তিনি জালালাবাদ খণ্ডযুদ্ধে নিহত বিপ্লবীদের ছবি বিক্রীর ব্যবস্থা ক'রে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই অর্থ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ব্যয়নির্বাহের জন্য দিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর তিনি মাণিকতলার ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। এ সম্পর্কে আরো গ্রেপ্তার হন ধীরেন চৌধুরী, কালিপদ রায়, নরহরি সেন প্রভৃতি। বিমলপ্রতিভা দেবী পরে মামলা থেকে মুক্তি পান এবং সেদিনই তাঁকে ডেটিনিউ অর্থাৎ বিনাবিচারে বন্দী ক'রে আটক রাখে। সিউড়ি, হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তিনি প্রায় ছয়বছর। ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের 'নিখিল ভারত বন্দীমুক্তি আন্দোলন কমিটি'-র সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেস ছাড়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সালের এ আই সি.সি মিটিং-এর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

বিমলপ্রতিভা দেবী

১৯৪১ সালের ২৭শে জানুয়ারি রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার রাখার অভিযোগে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং দুইবছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাদণ্ড ভোগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক রাখা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৯৪৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি পান। বর্তমানে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।



ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা



ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা ১৯১৪ সালে কলিকাতায জন্মগ্রহণ কবেন। দেশ তাঁব বাজস্থান। পিতা বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও সমাজসেবী পদ্মবাজ জৈন, মাতা চন্দা দেবী।

দুইপুরুষ যাবৎ তাবা ব্যবসা উপলক্ষ্যে কলিকাতায বসবাস কবছেন। পদ্মবাজ জৈন কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনবার কাবাববণ কবেন। এবং তাঁর পৈতৃক ব্যবসা এই আন্দোলনেব ফলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষতিকে তিনি জাতীয় সংগ্রামেব অংশরূপে গৌববেব সঙ্গে গ্রহণ করেন। সমাজসংস্কাবক রূপে তিনি নিজেব পবিবারেব পর্দাপ্রথা ভেঙে ফেলে দিয়ে নিজেদেব মারোয়াড়ী সমাজকে অগ্রগতিব পথে এগিয়ে নিযে চলেন। তিনি বিধবা-বিবাহেব সমর্থক ছিলেন। নাবীব শিক্ষা ও নারীব অগ্রগতিব দিকে সেসময় যে কয়জন বাজস্থানী মনীষী অগ্রসর হন, তাঁদেব মধ্যে পদ্মবাজ জৈন অন্যতম।

বিখ্যাত কংগ্রেসসেবী কেদাবনাথ গোয়েঙ্কার পুত্র কেশবদেব গোয়েঙ্কার সঙ্গে ইন্দুমতী গোযেঙ্কাব বিবাহ হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বব মাসে। ইন্দুমতী গোযেঙ্কা পিতা এবং স্বামীব নিকট থেকেই দেশসেবার প্রেরণা লাভ করেন।

১৯৩০ সালে কলিকাতায যখন 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন পবিচালনা করেন তখন কলিকাতার বাঙালী ও অবাঙালী বহু

নারী দলে দলে এসে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইন্দুমতীও তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। সত্যাগ্রহীদলের সঙ্গে তিনি বড়বাজারে গিয়ে বিলিতী বস্ত্রের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন, বিলিতী কাপড় যোগাড় ক'রে পোড়াতেন, দলে দলে মেয়েদের সঙ্গে সভা ও শোভাযাত্রা করতেন। একদিন তিনি যখন জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একজন সার্জেণ্ট দ্রুতবেগে এসে তার হাতে অত্যন্ত কঠিন চাপ দিয়ে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। নিরুপায় ইন্দুমতী সার্জেণ্টের হাতের প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যর্থ করবার অন্য উপায় না পেয়ে, তার হাতে কামড় বসিয়ে দেন। তৎক্ষণাৎ সার্জেণ্টের হাতের মুঠি শিথিল হয়। ইন্দুমতী দেবী জাতীয় পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চললেন।

ইন্দুমতী দেখতেন পুলিস এবং সার্জেণ্টগণ সত্যাগ্রহীদের উপর নিষ্ঠুরভাবে লাঠিচার্জ করে, তাঁদের আহত ও লাঞ্ছিত করে এবং নানা ভাবে অত্যাচার করে। এইসমস্ত ঘটনা ইন্দুমতীর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি দুঃখের সঙ্গে ভাবতেন, নিজের দেশের লোক হ'য়ে পুলিস এত অত্যাচার করে? পুলিসের মনে কি কোনো পরিবর্তন আনা যায় না?

ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা নিজের নামে বে-আইনী ইস্তাহার ছাপিয়ে পুলিস-কর্মচারীদের এই মর্মে আবেদন জানালেন:

"আমরা সব একই ভারতমাতার সন্তান। ভীত ইংরেজ সরকার যেমন ক'রে হোক আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পিষে মেরে ফেলতে চাইছে। নির্দোষ জনতার উপর তারা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। নারীর গায়ে হাত উঠাতেও তারা দ্বিধা করছে না। কাঁথিতে আমাদের মা ও ভগ্নীদের উলঙ্গ ক'রে মারপিট চালিয়েছে, তাঁদের স্তন ধ'রে ওঠ্-বোস করাচ্ছে। রাবণও এমন অমানুষিক অত্যাচার করেনি। ভাইসব, এসব দেখেও কি আপনারা এই সরকারের অঙ্গ হয়ে থাকবেন? আমরা কি আপনাদের মা বোন নই? একথা নিশ্চিত যে, বিদেশী সরকারের অন্তিম দিন ঘনিয়ে এসেছে, রাবণের মতো অত্যাচারীর শক্তিও চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। এখন শুধু আপনাদের পদত্যাগের অপেক্ষা। বিদেশী শাসকের বল ও শক্তি তো আপনারাই। আজই আপনারা চাকরী ছেড়ে দিন, ওরা বিদায় হোক্।

"আপনারা ওদের সহায়তা না করলে ওদের হাজার হাওয়াই জাহাজ, হাজার বোমা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনারা যখন নিজের ভাইয়ের গায়ে লাঠিবর্ষণ করেন

তখন আমার গভীর দুঃখ হয়, আমার চোখে জল আসে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কি এত নীচ কাজ করতে হবে, যার জন্য আপন ভাই, মা, বোনের উপর এমনি ক'রে হাত উঠাতে হবে?

"আপনাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। খাদ্যসমস্যা যত কঠিনই হোক, আপনারা এই ভারতবর্ষেরই সন্তান। আমরা আপনাদেরই ভগ্নী—আমরা ও আপনারা একই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি—সেই দাবি নিয়ে আমি আপনাদের নিকট জোড়হাতে প্রার্থনা করছি যে, আপনারা এই রাক্ষসী সরকারের চাকরী ছেড়ে দিন, অন্ততঃ ভগবানকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করুন যে, নিজের দেশের ভাইয়ের উপর, বোনের উপর হাত উঠাবেন না।"

ইন্দুমতী দেবীর এই ইস্তাহার কলিকাতা, আগ্রা, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি নানা জায়গায় বিতরণ করা হয়।

এই আবেদনের ফলে ইন্দুমতী গোয়েঙ্কাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ন'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ১৯৩০ সালের ২৪শে জুন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। কোর্ট হাজার হাজার লোকের জনতায় পূর্ণ ছিল। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে কারাবরণ করেন।

তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড সমস্ত ভারতবর্ষে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সমগ্র কলিকাতা শহরে বড়বাজার প্রভৃতি বহু স্থানে হরতাল পালন করা হয়। তিনি তখন বেথুন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। সেজন্য বেথুন স্কুল ও কলেজে হরতাল পালন করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৫শে জুনের বৈঠক স্থগিত রাখা হয় এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুক্তির পরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন।

১৯৩১ সালে কানপুরে হিন্দু-মুস্লিম দাঙ্গা হয়। ইন্দুমতী দেবী সেসময়ে কানপুরে ছিলেন। তিনি কানপুরের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীকে জানান যে, তিনি শান্তির জন্য দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানে কাজ করতে চান। তখনকার দাঙ্গার অবস্থা দেখে গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ইন্দুমতীকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী নিজে শান্তি স্থাপন করবার চেষ্টা করতে যান এবং সেখানে নিহত হয়ে শহীদ হন। তখন ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা এবং তাঁর স্বামী ও অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু-মুস্লিম মিলনের জন্য সেখানে কাজ করতে থাকেন।

তদবধি ইন্দুমতী দেবী সমাজসেবার কাজে জড়িত আছেন।

কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি



ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথমদিকে খুব সীমাবদ্ধ হ'লেও, সংগ্রাম যতই জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করে ততই অধিক সংখ্যায় তাঁরা সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময়ে প্রথম অগ্নিযুগের এবং ১৯১৪ সালের দ্বিতীয় অগ্নিযুগের কৃচ্ছ্রসাধনায় অতি অল্পসংখ্যক নারী সহায়তা করলেও তার প্রভাব কম ছিল না। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যখন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী প্রভৃতির প্রেরণায় নারী বাইরে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন তখন দেখা গেল এই অপেক্ষাকৃত সরল পথে দেশসেবা করতে অনেক নারী সহজেই প্রস্তুত। ধীরে ধীরে নারীজাগরণ বেগবান হ'তে থাকে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে এই জাগরণের বন্যা কূল ছাপিয়ে ক্রমশঃই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর আহ্বানে সাধারণ নারী কাতারে কাতারে বেরিয়ে এসে আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী নারীকে অহিংস আন্দোলনে পুরুষের অপেক্ষা অধিক যোগ্য ব'লে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের তিনি বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করতে এবং আইন অমান্য করতে আহ্বান করেছিলেন। ভারতের নারী শত শত বছরের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠলেন। যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন সেখানেই তাঁরা সত্যাগ্রহ ক'বে কারাবরণ করেছেন।

১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেস-নেত্রী কলিকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি কংগ্রেসের বাইরে ছিল।

সমিতির সভানেত্রী ছিলেন উর্মিলা দেবী ; সহকারী সভানেত্রী—মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা দাস এবং হেমপ্রভা দাশগুপ্ত ; যুগ্ম-সম্পাদিকা—শান্তি দাস (কবীর) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ; সমিতির সদস্যা—ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, সরলাবালা সরকার, অম্বালিকা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, সজ্জন দেবী, মানসনলিনী দেবী, প্রীতি দাস, সুষমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

সমিতিতে যোগদান ক'রে বহু বাঙালী, গুজরাটী, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশী, বিহারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশীয় মহিলাগণ সত্যাগ্রহ ক'রে বন্দীজীবন যাপন করেন। অবাঙালী মহিলাগণ প্রধানত ছিলেন কলিকাতা-নিবাসী।

সমিতির কার্যধারা ছিল সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালিত করা, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করা। বড়বাজারের সদাসুখ কাট্‌রা, মনোহরদাস কাট্‌রা, পচাগলি, সুতাপটি, গ্রাণ্ট স্ট্রীট, চাঁদনী, ক্রস স্ট্রীট, বৌবাজার ও নিউমার্কেট প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দোকানের সামনে তাঁরা পিকেটিং করতেন।

পিকেটিং-এব প্রভাব এত গভীর হযেছিল যে, বহু দোকানের বিলাতী মাল বিক্রী তখন একেবারে বন্ধ হযে গিযেছিল। পুঁজিপতিদের বিদেশী মালগুলি গুদাম, কুঠী ও গদীতেই বস্তাবন্দী হয়ে রইল। বড়বাজারের বিলাতী বাজার পুলিস এবং মিলিটারীর ছাউনীতে পরিণত হ'ল। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পুলিসের কড়া দৃষ্টির সামনে মহিলাগণ পিকেটিং করতেন। পুলিস তাঁদের দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে ভ্যানে তুলে নিযে চলে যেতো। পুলিসের ভ্যান সব-সময় বড়বাজারে মজুত থাকত গ্রেপ্তাব করবার জন্য। কিন্তু পুলিস ও মিলিটারী ভয় দেখিয়ে নাবীদেব নিবস্ত করতে পারেনি! পুলিস যতই কঠিন শাস্তি দিতে গেছে, নারী তততই মরিয়া হয়ে আরো দলে দলে এগিয়ে এসেছেন।

. শোভাযাত্রার একদিনের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালেব ২২শে জুন দেশবন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি দিবসে সমস্ত কলিকাতা শহরে ১৪৪ ধারা জারী ছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' সেদিন শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে। শোভাযাত্রা চলেছিল কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশবন্ধু পার্ক পযন্ত। অসংখ্য পুলিস, সার্জেণ্ট ও ঘোড়সওয়ার বেষ্টিত বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছিল। কলিকাতা শহরের বুকের উপর নারী তখন রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ ক'রে সত্যাগ্রহীদের পদদলিত-করতে-উদ্যত ঘোড়াকে রুখেছেন তার লাগাম ধ'রে ঝুলে প'ড়ে; আলুথালু কেশ তাঁদের খুলে পড়েছে, দেহমনের অসীম শক্তি যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। পুলিসের নির্মম অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সবিক্রমে আটকাচ্ছেন তাঁরা পুলিসের লাঠিকে, ঘোড়াকে ও বেটনকে। ঘোড়সওয়ার পুলিস ও সার্জেণ্ট তখন অত্যাচারের নির্মমতা সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেদিনের দৃশ্য বর্ণনার বাইরে—শুধু যে দেখেছে সেই জানে।

ক্রমে শোভাযাত্রা এসে পৌছাল দেশবন্ধু পার্কে। সেখানেও পার্ক ঘেরাও ক'বে দাঁড়িয়ে আছে বৃটিশ শক্তি। জীবন তুচ্ছ ক'রে অগণিত নরনারী ১৪৪ ধারা ভেঙে পার্কেব ভিতরে প্রবেশ করলেন জলস্রোতের মতো। সার্জেণ্ট, ঘোড়সওয়াব ও পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের উপব। নারী সেদিন অকুতোভয়ে কখনো ঘোড়াব পদতলে পিষ্ট হচ্ছেন, কখনো শুয়ে পড়ে ঘোড়ার অগ্রগতি ব্যর্থ করছেন, কখনো পুলিসেব বেটনে আহত হচ্ছেন।

এইভাবে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সামনে বক্তাগণ বক্তৃতা দিতে থাকেন। সভানেত্রী উর্মিলা দেবী তাঁব ভাষণে দেশবন্ধুর জীবনের আদর্শ ব্যক্ত কবেন। অবশেষে যুগ্ম-সম্পাদিকা শান্তি দাস (কবীর) ও বিমলপ্রতিভা দেবীর সঙ্গে বিশাল জনতা বন্দেমাতবম্ ধ্বনি দিয়ে গগন বিদীর্ণ করেন ও সভা ভঙ্গ হয়।

আবাব ১৯৩১ সালেব ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালন উপলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তাও অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা-দিবসের দু'তিনদিন আগেই বহু নেতাকে ইংরেজ সরকাব গ্রেপ্তার কবে। ২৬শে জানুয়ারি প্রাতে কলিকাতার সমস্ত বড বড পার্ক এবং অক্টারলোনী মনুমেণ্ট অজস্র পুলিস এবং ঘোড়সওয়ার ঘিরে বাখে যাতে সেখানে গিয়ে কেউ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে না পাবে। কিন্তু পুলিস ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী অগ্রাহ্য ক'রে, তাদের বূহ ভেদ ক'রে শত শত মেয়েবা মনুমেণ্টের তলায় পৌছবার জন্য অগ্রসর হন। পুলিসের লাঠিচার্জেব আঘাতে, ঘোড়ার পদতলে বহু নারী আহত ও পিষ্ট হয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ওরই ভিতর থেকে দু'চারজন নারী মাটিতে পড়ে আহত হ'য়েও আবার উঠে দৌড়ে গিয়ে মনুমেণ্টের তলায় পৌছেই উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতেব জাতীয় পতাকা, ঘোষণা করেছেন স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি।

তাবপর শুরু হয় দলে দলে নারী-পুরুষের গ্রেপ্তার। পতাকা উত্তোলন করতে চলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে পথে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড পার হতেই গ্রেপ্তার করে সর্বাগ্রে। সেদিন যদি মহিলাগণ পুলিসের নির্মম নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারি ভিতর থেকে ছুটে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করতেন তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের পরাজয়েরই সূচনা করত। কিন্তু ভারতের নারী অপরাজেয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের আপন শক্তি স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তি জাগরিত হয়েছে। ঘটনাটি যখন কংগ্রেসের ডিক্টেটার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে জানানো হ'ল, তিনি বলে উঠলেন, "সাবাস! তোমাদের কাছে এই আশাই তো করেছিলাম।"



লীলা নাগ (রায়)



১৯০০ সালে লীলা নাগ জন্মগ্রহণ করেন আসামের গোয়ালপাড়ায়। পিতৃভূমি তাঁর সিলেটে। তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ ও মাতা কুঞ্জলতা নাগ।

পিতা বাংলা ও আসামের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সেবাব্রতী, তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ। পরবর্তী জীবনে তিনি ভারতীয় আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে লবণ-করের প্রতিবাদে একবছর পরেই পদত্যাগ করেন। মাতামহ প্রকাশচন্দ্র দেব ছিলেন আসাম সেক্রেটারিয়েটের প্রথম ভারতীয় রেজিস্ট্রার। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী।

লীলা নাগের বিদুষী মা শৈশব থেকেই কন্যাকে শিখিয়েছিলেন যে, ত্যাগের মধ্য দিয়েই সেবা করতে হয়। মায়ের শিক্ষায় মহৎ জীবনের আদর্শ কন্যাকে সকল কর্মে প্রবুদ্ধ করত।

পিতা ও মাতামহ সরকারী চাকুরিয়া হওয়া সত্ত্বেও লীলা নাগ শৈশবাবধি ১৯০৫ সাল থেকেই দেখতেন বাড়ীতে বিলিতী কাপড় বর্জন এবং 'বঙ্গলক্ষ্মী'র মোটা কাপড় বরাদ্দ হয়েছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে অশ্রু ও অরন্ধনের মধ্য দিয়ে এই পরিবার বাংলার সেই প্রথম শহীদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কিশোরী লীলা নাগকে তাঁর বাবা, মা ও মাতামহ শোনাতেন দেশবিদেশের কাহিনী এবং নানা দেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি ও নেপোলিয়ানের জীবনের ঘটনাবলী তাঁর কিশোর মনে গভীর ছাপ ফেলে যেতো। এই আদর্শনিষ্ঠ পরিবারের শিক্ষা লীলা নাগকে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তোলে।

তিনি ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে কলিকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বি.এ. পাস করেন এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তাঁর পিতা ঢাকাতে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়তে চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না ব'লে তাঁকে প্রথমে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু লীলা নাগেব দৃঢ়তা ও শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে সহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন ১৯২৩ সালে।

ছাত্রীজীবনেই তিনি নানাপ্রকার সংগঠনমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। বেথুন কলেজের ছাত্রী রি-ইউনিয়ন গড়ে ওঠে যাঁদের প্রচেষ্টায়, লীলা নাগ তাঁদের অন্যতম।

১৯২১ সালে 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'-র সহ-সম্পাদিকারূপে তিনি নারীর সামাজিক ও আর্থিক অধিকার সম্বন্ধে জনমত গঠনের জন্য নানা সভাসমিতির আয়োজন করেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন লীলা নাগের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকাতে বারোজন সহকর্মীর সঙ্গে 'দীপালী সংঘ' নামে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন তার সম্পাদিকা। 'দীপালী স্কুল' নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'দীপালী সংঘ'-র উদ্যোগে বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল এবং পবে 'নারী শিক্ষামন্দির' ও 'শিক্ষাভবন' নামে আরো দুটি ইংরাজি উচ্চবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। ঢাকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও ব্যবস্থার ব্যাপারে লীলা নাগের অবদান অতুলনীয়।

শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৯২৪ সালে 'দীপালী শিল্প প্রদর্শনী' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনী 'দীপালী সংঘ'-র একটি

বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেয়েদের হাতের কাজ, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ত। তখনকার দিনে এরূপ প্রদর্শনী অভিনব ছিল।

১৯২৫ সালে তিনি 'শ্রীসংঘ' নামে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং এই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

১৯২৬ সালে তিনি ঢাকায় 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে একটি ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে এর শাখা বাংলা ও আসামের নানা স্থানে বিস্তৃত হয়।

১৯৩০ সালে মেয়েদেব সহজভাবে চলাফেরা এবং মেলামেশা খুব অসুবিধা-জনক ছিল। মহিলা-কলেজের আবাসিকাগুলির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর ছিল। রাজনৈতিক ভাবাপন্ন ছাত্রীরা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতেন। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এবং বিশেষভাবে 'দীপালী সংঘ'-ব সহিত যুক্ত কর্মীদের ও ছাত্রীদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ছাত্রীভবন' নামে একটি ছাত্রী-আবাসিকা কলিকাতায় খোলা হয়। এই 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনায় লীলা নাগের সহকর্মী রেণু সেন অসাধারণ কর্মকুশলতা ও সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন।

১৯২৭-২৮ সালে যখন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক নারীনিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় তখন সে-সম্পর্কে নিগৃহীত নারীদের আশ্রয়দান, তাদের মামলা পরিচালনায় সাহায্য এবং সাধারণভাবে নারীদের মধ্যে সাহস ও আত্মরক্ষার ভাব উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য লীলা নাগ 'নারী আত্মরক্ষা ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড খোলেন। মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য এবং মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে মেয়েদের মধ্যে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, জুজুৎসু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেন। ঢাকায় এসব শিক্ষা দিতেন আশুতোষ দাশগুপ্ত, কলিকাতায় পুলিন দাস।

'দীপালী সংঘ'-র মাধ্যমে নারী-শিক্ষার ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করার জন্য তিনি 'গণশিক্ষা পরিষদ' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

১৯৩০ সালে লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামে মহিলাদের একটি মুখপত্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়। এটি মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত ছিল এবং এর লেখকগোষ্ঠীও গঠিত ছিল প্রধানতঃ মহিলাদের দ্বারাই।

বিভিন্ন সময়ে 'জয়শ্রী'র সম্পাদিকা ছিলেন :

লীলাবতী নাগ (রায়)— বৈশাখ ১৩৩৮—চৈত্র ১৩৩৮, আষাঢ় ১৩৪৫—চৈত্র ১৩৪৮, ফাল্গুন ১৩৫৩—মাঘ ১৩৫৬, বৈশাখ ১৩৫৭—অদ্যাবধি (১৩৬৯ পর্যন্ত)।

শকুন্তলা দেবী (রায়)— বৈশাখ ১৩৩৯—আশ্বিন ১৩৯০ পর্যন্ত।

বীণাপাণি রায়- কার্তিক ১৩৪০—চৈত্র ১৩৪০ পর্যন্ত।

ঊষাবাণী রায়— বৈশাখ ১৩৪১—চৈত্র ১৩৪২ পর্যন্ত।

(লীলা নাগ যখন জেলে ছিলেন সেসময়ে এঁরা তিনজন সম্পাদিকা ছিলেন।)

[বৈশাখ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ পর্যন্ত এবং বৈশাখ ১৩৪৯—মাঘ ১৩৫৩ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক 'জয়শ্রী' প্রচার বন্ধ ছিল।]

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় লীলা নাগ ঢাকার মহিলাদের নিয়ে 'ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করেন। তাঁরা ঢাকা শহর ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতিতে প্রকাশ্যে লবণ তৈরী ক'রে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। এই সময় গান্ধিজীর ডাণ্ডি অভিযান ও তার পটভূমি-সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিয়ে ৮০টি বিভিন্ন ছবি ও মহাত্মাজীর বাণী এবং চিঠির অনুলিপির স্লাইড তৈরী করিয়ে ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন মারফত মহিলাগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহে যোগদান করবার উৎসাহ সৃষ্টি করেন। রেণু সেন, বীণা রায়, শকুন্তলা চৌধুরী প্রভৃতি কর্মিগণ এই ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন পরিচালনায় অগ্রণী ছিলেন।

১৯৩০ সালে 'শ্রীসংঘ'র দলনেতা অনিল রায়ের গ্রেপ্তারের পর সমগ্র দলের পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে লীলা নাগের উপর।

১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর লীলা নাগ ও রেণু সেনকে ডেটিনিউ ক'রে জেলে আটক রাখা হয়। এই সময় লীলা নাগের আরো যেসমস্ত মহিলা সহকর্মী ডেটিনিউ অর্থাৎ রাজবন্দীরূপে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সুশীলা দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত ও হেলেনা দত্ত। লীলা নাগ রাজবন্দী হবার পর শকুন্তলা রায়, সুরমা দাস প্রভৃতির উপর বাংলাদেশ হ'তে বহিষ্কারের আদেশ হয়। এঁরা ছাড়া তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঊষা রায়, বীণা রায়, সীতা সেন, অনুপমা বসু, লতিকা দাস (সেন), রেণুকণা দত্ত প্রভৃতি। রেণু সেনের ছিল সংগঠনী শক্তি এবং শকুন্তলা দেবীর ছিল তীক্ষ্ণধী ও যুক্তিবাদী মন।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লীলা নাগ মুক্তি পান। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ ও অনিল রায় পরস্পরকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন।

এই সময় গুপ্ত বিপ্লববাদের যুগ শেষ হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়। লীলা রায় ও অনিল রায় তখন জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গ'ড়ে তোলার কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দিগণ ব্যাপকভাবে মুক্ত হন তখন কংগ্রেস ও তার কাযাবলীকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার প্রশ্ন এল। সেসময় রাজনৈতিক মহিলাগণ একটি সম্মিলিত সংস্থাতে মিলিত হবার কথা চিন্তা কবেন। প্রদেশের বিভিন্ন কংগ্রেস-মহিলা-কর্মীদেব আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাক্ষাৎ সংযোগ রক্ষা করা হবে, 'কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটি'র মারফত। 'কংগ্রেস মহিলা সাব কমিটি' পূর্বেই গঠিত হয ১৯৩৭ সালে। লাবণ্যলতা চন্দ ছিলেন তাব সেক্রেটারি।

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি লীলা নাগ উত্থাপন করেন এবং কংগ্রেস কর্মিগণ সাগ্রহে সমর্থন করেন। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এই পরিকল্পনাকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত মহিলাদের নিয়ে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তার সভানেত্রী নির্বাচিত হন মোহিনী দেবী এবং সেক্রেটারি লাবণ্যলতা চন্দ।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে বাংলা কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। তার ফল-স্বরূপ 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ'-র কাজ একবছরের বেশী অগ্রসর হ'তে পারে নাই।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক যে 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠিত হয়, সেই কমিটিতে লীলা রায় বাংলাদেশ থেকে মহিলা-সাব-কমিটির সভ্য মনোনীত হন এবং পরিকল্পনা-কমিশনের কাছে বাংলার তরফ থেকে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হয়। লীলা রায় ও অনিল রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

অন্যতম সহযোগীরূপে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের সহকর্মীরাও সকলেই 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যোগদান করেন।

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে লীলা রায় ও অনিল রায় কারাবরণ করেন। সকলেই মুক্তি পান, কিন্তু সুভাষচন্দ্র কারান্তরালে রয়ে গেলেন। তাঁরই নির্দেশে লীলা রায় মুক্তিলাভের পর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। নেতাজীর ভারত-ত্যাগের পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি এই কাগজের সম্পাদনা করেন।

অন্তর্ধানের পূর্বে নেতাজী যে নির্দেশ দেন, সে অনুযায়ী লীলা রায় ও অনিল রায় ১৯৪০-৪১ সালে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের জন্য ব্যাপকভাবে সফর করেন। ১৯৪১ সালে লীলা রায়ের উপর সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা ও বাংলার বাইরে যাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে অনিল রায়কে কারারুদ্ধ করা হয়।

ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ হবার পর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সারা ভারতের ফরওয়ার্ড-ব্লকের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হ'তে থাকে। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে লীলা রায়কে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক রাখা হয়। 'জয়শ্রী' আফিস পুলিস তালা লাগিয়ে বন্ধ ক'রে দেয় এবং সমস্ত জিনিসপত্র ক্রোক করে। এবারে লীলা রায়ের সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা জেলে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন লাবণ্য দাশগুপ্ত, হেলেনা দত্ত, শৈল সেন, গৌরী সেন, প্রভা মজুমদার, উমা গুহ, ছায়া গুহ ও আশা রায়। লীলা রায়কে প্রথমে দিনাজপুর জেলে ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান।

আবার তিনি 'জয়শ্রী' ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার সাধারণ আসন থেকে তিনি ভারতীয় কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে কলিকাতা ও নোয়াখালিতে দাঙ্গার পর লীলা রায় চলে যান নোয়াখলিতে—দুর্গতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে। তিনি 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইন্‌স্টিটিউট' নামে একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন এবং তারই সম্পাদিকা রূপে সেখানে শান্তি ও সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন।

এর পরেই আসে ভারত-বিভাগের দুর্যোগ। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। লীলা রাযেব সারাজীবনের প্রিয় কর্মভূমি ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ ছেড়ে তাঁকে চিরকালের জন্য চলে আসতে হ'ল।

তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি এবং আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে তিনি অদ্যাবধি জনসেবার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে চলেছেন। বর্তমানে তিনি 'প্রজা সোশ্যালিস্ট' দলের সভানেত্রী।

হৃদয় ও মনের বহু উচ্চগুণে বিভূষিতা লীলা রায়কে রাজনৈতিক বাংলার, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার নারীপ্রগতির ইতিহাসে অনেক বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়।

কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)





১৯০৭ সালের ২৮শে মে তারিখে কল্যাণী দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন কটকে। তার পিতা বেণীমাধব দাস, মাতা সরলা দাস, ছোট ভগ্নী বীণা দাস। পিতৃভুমি তাঁদের চট্টগ্রাম।

দুই ভগ্নী কল্যাণী ও বীণার জীবনে গভীর প্রভাব ছিল তাঁদের পিতামাতার এবং বড়মামা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের। পিতামাতার নিকট থেকেই শুনতেন তাঁরা বড়মামার মহৎ চরিত্রকথা। পিতার কাছ থেকে কল্যাণী ও বীণা ছোটবেলায় বসে বসে শুনতেন সমাজ বিপ্লবীদের জীবনী। একটা আদর্শের জন্য মানুষ যে কত বড় ত্যাগ স্বীকার নিজের জীবনে করতে পারে সে-শিক্ষা তাঁরা পিতার নিকটেই লাভ করেন।

পিতার ছিল অজস্র নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবাহ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে তিনি জানতেন না। কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা-কালে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল যে, তিনি স্কুলে রাজদ্রোহ প্রচার করেন। ফলে বদলি হন তিনি কৃষ্ণনগরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের ভিত্তি গ'ড়ে ওঠে ঐ আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ছাত্ররূপে কটকের স্কুলেই।

মায়ের ছিল সংগঠনী শক্তি। দুস্থ নারীদের জন্য 'পুণ্যাশ্রম' তাঁর একার

চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। ভাই বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের প্রতিষ্ঠিত নীতি-বিদ্যালয় তিনি বহুদিন পরিচালনা করেন। জাতির চরিত্রগঠনের কাজে সে-যুগের নীতি-বিদ্যালয়-এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

এমন পিতামাতার সন্তান কল্যাণী দাস ও বীণা দাস যতই বড় হ'তে লাগলেন ততই পরাধীনতার গ্লানি তাঁদের গভীর পীড়া দিতে থাকে। তাঁরা গতানুগতিক জীবনে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি।

কল্যাণী দাসের ছিল মায়ের মতোই সংগঠনী ক্ষমতা। ১৯২৮ সালে বি.এ. পাস করবার পর তিনি ইউনিভার্সিটিতে এম.এ. পড়তে যান। ঐ ১৯২৮ সালেই কল্যাণী দাস তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু সুরমা মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতির সহযোগিতায় 'ছাত্রীসংঘ' সংগঠন করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র, সম্পাদিকা কল্যাণী দাস। কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে এই 'ছাত্রীসংঘ' গঠিত হয়। তখনকার দিনে ছাত্রীদের মধ্যে অতবড় সংঘ বোধহয় আর ছিল না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্তী দিনের রাজনৈতিক কর্মিগণ এই 'ছাত্রীসংঘ'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। যুগান্তর-দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী দীনেশ মজুমদার এই 'ছাত্রীসংঘ'র মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন। পরে দীনেশ মজুমদারের বিপ্লবী কাজের জন্য ফাঁসী হ'য়ে যায়। 'ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে পাঠচক্র, সাঁতার-শিক্ষা, সাইকেল চড়া শিক্ষা, ফার্স্ট-এইড শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রাজনীতির দিক থেকে এই সংঘের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান করবার আহ্বান জানালেন কল্যাণী দাস ও তাঁর সহকর্মিগণ। তাঁরা যখন বেথুন কলেজ বন্ধ করবার জন্য কলেজ-গেটে পিকেটিং আরম্ভ করেন তখন দলে দলে ছাত্রীরা এসে পিকেটিং-এ যোগ দেন। এখানে পিকেটিং করবার সময় একদিন পুলিস তাঁদের একদলকে গ্রেপ্তার ক'রে একটা ভ্যানে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে একটা ভাঙা বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসে। সেই নির্জন স্থান থেকে হেঁটে ফিরে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা আবার সেই বেথুন কলেজ গেটের সামনে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের সামনে পেয়ে অন্যান্য ছাত্রীরা মহা উল্লাসে সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক'রে উঠলেন।

একদিন তাঁরা বেথুন কলেজে পিকেটিং করছিলেন এমন সময় ইলা সেন

নামে বেথুন কলেজের একটি ছাত্রী পিকেটার এসে খবর দিলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে ছাত্র-পিকেটারদের উপর নাকি গুলীচালনা করা হবে। তৎক্ষণাৎ কল্যাণী দাস ও তাঁর একদল সাথী বেথুন কলেজ গেট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে চলে গেলেন। ছাত্র-পিকেটারদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা পিকেটিং করতে লাগলেন। পুলিস লাঠিচার্জ ক'রে ভেঙে দিতে গেল ব্যূহ, কিন্তু ছাত্রদের উপর গুলী করা আর সম্ভব হ'ল না।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে কল্যাণী দাস ও অন্যান্য কর্মিগণ শোভাত্রায় যোগ দিয়ে বড়বাজারে বিলিতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি হাজরা পার্কে একটি বে-আইনী সভা অনুষ্ঠিত কবতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং আটমাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালের শেষে তিনি মুক্তি পান।

ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার মেদিনীপুব সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে আসেন ১৯৩২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। কল্যাণী দাস জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে এবার বিপ্লবী কাজে যুক্ত হলেন। এই সময় বহু পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবী কর্মী কারার অন্তরালে বন্দী ছিলেন। পরিচালকহীন ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের অনেককে একত্রিত ক'রে পুনর্গঠন ও কর্মপরিচালনার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হন দীনেশ মজুমদার। কল্যাণী দাস পুনর্গঠন করতে থাকেন মেয়েদের।

দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি পলাতকদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা, পুলিসের দৃষ্টি থেকে বে-আইনী জিনিস গোপন রাখা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে কল্যাণী দাসের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী মেয়েরাও এগিয়ে এলেন। এই মহিলা-কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সুলতা কর, আভা দে, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, লীলা কাম্‌লে, সুতপা দেবী, অমিয়া দেবী প্রভৃতি।

দীনেশ মজুমদার তখন কলিকাতায় অথবা পুরুলিয়ার দিকে নানা স্থানে অথবা চন্দননগরে পলাতক হয়ে ফিরছিলেন। একবার তিনি ঝরিয়ার কয়লার খনির মজুর সেজেও কাজ করেছিলেন। চন্দননগরে থাকাকালে ১৯৩৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চাতে ধাবমান ফরাসী পুলিস-কমিশনার কুইন্‌স্‌কে গুলীতে নিহত ক'রে ছুটে পালিয়েছিলেন তিনি গঙ্গার দিকে। সেখানে কৌপীন প'রে গাঁজাখোর সাধুদের সঙ্গে জুটে এপারে পৌছে আশ্রয় নিয়েছেন গিয়ে

একটা ঘোড়ার আস্তাবলে। ঘোড়ার দানা খেয়েই ৩।৪ দিন কাটিয়ে অবশেষে কলিকাতার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। তখন বিপ্লবী বন্ধু নারায়ণ ব্যানার্জী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে সেখানে আশ্রয় দিলেন দীনেশ মজুমদারকে।

অর্থাভাব নগ্নমূর্তিতে দেখা দিল। মহিলা কর্মিগণ নিজেদের কর্মের অবসরে গৃহশিক্ষকতার কাজ ক'রে অর্থের অনটন ঘোচাতে চেষ্টা করতেন। ওদিকে পুলিস জানতে পারলেই গৃহকর্তাকে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসত। ফলে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজও বন্ধ হয়ে যেতো।

বিপ্লবী কাজের জন্য বহু অর্থের তখন প্রয়োজন ছিল। দীনেশ মজুমদারের বন্ধু কানাই ব্যানার্জী ছিলেন গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী। '১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে জাল সই দ্বারা উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে সাতাশ হাজার টাকা তুলে আনা হয়। একমাত্র কানাই ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে তাঁকেও মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে রাজবন্দী ক'রে জেলে আটক রাখা হয়।

পুলিস এই সময় সন্দেহবশে বহু পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। এই ব্যাপারে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হবার পর শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী ও সুলতা কর অন্তরীণ রইলেন। লীলা কাম্‌লে ছিলেন মারাঠী মেয়ে। তাঁকে বাংলাদেশের বাইরে বহিষ্কার (externed) করা হয়।

দীনেশ মজুমদারের ছিল প্রগাঢ় আদর্শনিষ্ঠা ও দরদী প্রাণ। গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনে ওই টাকা খরচ করতে তিনি রাজী ছিলেন না—অসুস্থ হয়েও নয়। তিনি জানতেন এবারে গ্রেপ্তার হ'লে ফাঁসী তাঁর অনিবার্য। তিনি ডালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টের উপর বোমা ফেলার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বন্দী ছিলেন এবং সেই বন্দী অবস্থায় তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন কুইন্‌স্‌-হত্যা এবং গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের মামলার আসামী। তিনি জানতেন পলাতক জীবনে গ্রেপ্তার করতে এলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে হয় সেখানেই মৃত্যুকে বরণ করবেন, না-হয় পরাজিত হ'লে ফাঁসীর দড়িটি হাসিমুখে গলায় তুলে নেবেন। বাঁচিয়ে রাখা তাঁকে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ নিজেকে কেবল নীরবে নিশ্চিহ্ন ক'রে বিলিয়ে

দিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে সত্যই একদিন পুলিস তাঁদের অবস্থান জানতে পাবল। ১৯৩৩ সালের ২২ মে তারিখে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটেব বাড়ীতে পুলিসের সঙ্গে বেধেছিল তাঁদের খণ্ডযুদ্ধ। যুদ্ধ করতে কবতে হাতের সমস্ত গুলী যখন ফুবিয়ে গেল তখন দীনেশ ও তাঁর সহকর্মিগণ আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে যান।

অতগুলি গুরুতব মামলার অপরাধেব জন্য বৃটিশের আইনে লেখা ছিল ফাঁসীই একমাত্র শাস্তি। দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম আদর্শের জন্য নতমস্তকে চবম শাস্তি গ্রহণ কবে—মানবজাতি সজল নয়নে স্মরণ করে সেই অমর মৃত্যুকে। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী হযেছিল ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন গভীর রাত্রে। দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পবে কল্যাণী দাস গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালেব শেষে তাঁকে হিজলী ও মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দী ক'রে রাখা হয। অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৯৩৮ সালেব প্রথমে মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে নির্মলেন্দু ভট্টাচাযেব সঙ্গে কল্যাণী দাসের বিবাহ হয়।

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩৪৫ সালেব ১লা বৈশাখ) তিনি মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদেব মুখপত্র 'মন্দিরা' প্রকাশ কবেন। এই পত্রিকাতে তিনি নিজে সম্পাদিকাব পদ গ্রহণ না করলেও, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সমস্ত সংগঠনই তিনি কবেন।

শুধু 'মন্দিরা' পত্রিকা নয়, ১৯৩৮ সালে তিনি 'ছাত্রীসংঘ'কেও পুনরুজ্জীবিত কবেন।

এই সময ছাত্রীসংঘ ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সুহাসিনী চ্যাটার্জী। প্রায ৪০ বছর বয়সের কাছাকাছি এই মহিলার অদম্য সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয। গৃহের শত অসুবিধাও তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা ঘরের বৌকে বাইরে নিয়ে এল। তিনি নিজে সাইকেল চডতে শিখে ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। পাডার লোকে 'ছিঃ ছিঃ' ক'রে তাঁকে ঢিল ছুঁডতে লাগল। নিন্দা তাঁর তেজকে স্পর্শ করতেও পারেনি। তাঁরই জয হ'ল।

১৯৪০ সালে কল্যাণী ভট্টাচার্য বম্বে চলে যান স্বামীর কর্মস্থলে। সেখানকার সিভিল লিবার্টি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। সেই সময় বম্বের আশিটি মহিলা-প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে যে যুক্ত সমিতি গঠিত হয় তার মধ্যে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি বম্বেতে তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন।

মুক্তির পরে চলে আসেন তিনি কলিকাতায়। বাংলায় এসে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে শোচনীয় দৃশ্য তিনি দেখলেন তারপর আর স্থির থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরদুঃখকাতর হৃদয় তাঁর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রায় এক-বছর তিনি বাংলাদেশের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টি-ডিজিজ বিভাগ খুলে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামগুলিতে বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। সেখানে ওষুধ, বস্ত্র ও চাউল বিতরণ করা হ'ত।

'জীবন অধ্যয়ন' নামক আত্মচরিতে তিনি তার দরদী হৃদয়ের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছেন। আজও সেবা, শিক্ষাপ্রচার ও নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রেখেছেন।

আশালতা সেন



১৮৯৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি নোয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আশালতা সেন। তাঁর পিতা বগলামোহন দাশগুপ্ত নোয়াখালি জজকোর্টের উকিল ছিলেন; মাতা মনোদা দাশগুপ্ত। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে বিদগাঁও গ্রামে।

ছোটবেলা থেকেই আশালতা সেনের কবিতা রচনা করার অভ্যাস ছিল। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৭ সালে। সেই বছরেই 'অন্তঃপুর' নামক এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর একটি জাতীয়ভাবমূলক কবিতা তখনই লোকেব দৃষ্টি আকষণ করে। বয়স তখন তাঁর মাত্র দশ বৎসর। এই সাহিত্যানুরাগ তার জীবনে ক্রমে বিকশিত হয়। পরিণত বয়সে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণ থেকে 'যুদ্ধকাণ্ড'টি সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা কবিতায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ কাজে পরিণত হয় তখন আশালতা সেনের মাতামহী নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলে-কামিনী গুপ্তা প্রভৃতি মহিলাগণ 'মহিলা সমিতি', 'স্বদেশী ভাণ্ডার' ইত্যাদি স্থাপন ক'রে বিক্রমপুর অঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে উদ্যোগী হন। এই সময় নবশশী দেবী বিলাতী-বর্জনের সংকল্প-পত্র দৌহিত্রী আশালতাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে স্বদেশীব্রতে দীক্ষিত করেন এবং গ্রামের মেয়ে ও বৌদের স্বাক্ষর করার ভার নাতনী আশালতাকেই দেন। ১১ বছর বয়সের মেয়েটি গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বাক্ষর করাতে থাকে। এই তাঁর প্রথম দেশের কাজ।

ক্রমে দিদিমা নবশশী দেবীর প্রেরণায় আশালতা সেন টডের রাজস্থান, শিখযুদ্ধের ইতিহাস, মণিপুরের টিকেন্দ্রজিতের কাহিনী, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী ইত্যাদি নানা পুস্তক পাঠ করতে থাকেন; ওরি মধ্যে কখন্ তাঁর মানস-লোকে নিজের দেশের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়ে যায়।

অল্পবয়সেই তাঁকে সংসারজীবনে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। সংসারজীবন যাপনের কয়েক বছর পরে ১৯১৬ সালে তাঁর স্বামী সত্যরঞ্জন সেনের

অকালমৃত্যুর পর তিনি একটি শিশুপুত্র নিয়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় পতিত হন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি তখন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় তাঁর শ্বশুরমহাশয়ের সহায়তায় নিজেদের বাড়ীতে মহিলাদের জন্য 'শিল্পাশ্রম' নামে একটি বয়নাগার তিনি স্থাপন করেন।

তিনখানা ফ্লাই-শাট্‌ল্ তাঁত যখন মহিলাদের হাতে সশব্দে চলতে থাকত তখন সেই তাঁত-বোনার সঙ্গে সারা পাড়াময় যেন গান্ধীজীর বাণী ও খদ্দরের কথাই প্রচারিত হ'ত। মহিলাদের নিজেদের হাতে তাঁত বোনার কাজ দেখতে পাওয়া তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল। পাড়ার মহিলাগণ এই খদ্দর বোনার কাজ দেখতে ভীড় করে এসে দাঁড়াতেন।

১৯২২ সালে ঢাকা জেলার মহিলা প্রতিনিধিরূপে তিনি ডেলিগেট হয়ে যোগদান করেন গয়া কংগ্রেসে। সেই অবধি কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং গান্ধীজীর বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে তিনি সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তার সহযোগিতায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' সংগঠন করেন। সমিতির মহিলাগণ নিজেরাই খদ্দরের বোঝা কাঁধে নিয়ে অনেক দূরে দূরে চলে যেতেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে খদ্দর বিক্রি ও প্রচারকার্য করতেন। সমিতির বার্ষিক শিল্পমেলাতে একটি 'গান্ধীমণ্ডপ' তৈরী করা হ'ত। তাতে বুদ্ধদেব থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত মূর্তি ও ছবি রাখা হ'ত। কিভাবে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের প্রচারিত অহিংসার বাণী গান্ধীজীর ভিতর দিয়ে বর্ত্তমান যুগে নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে-সম্বন্ধে মেলায় সমবেত লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। এই 'গান্ধীমণ্ডপ'টি সকলের নিকট একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।

১৯২৫ সালে আশালতা সেন নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের (A.I.S.A.) সদস্য হন এবং ব্যাপকভাবে খদ্দর-প্রচারে ব্রতী হন।

১৯২৭ সালে ঢাকায় মহিলা কর্মী তৈরী করার জন্য তিনি 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করেন। আশ্রম-গঠনে তাঁর শ্বশুর এবং 'বিদ্যাশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই উভয়ের নিকট থেকে তিনি সহায়তা পান।

১৯২৯ সালে গেণ্ডারিয়ার নিকটবর্তী জুড়ান নামক একটি নমঃশূদ্রপ্রধান গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় তিনি 'জুড়ান শিক্ষা-মন্দির' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলে তাঁরা ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের চিত্ত আকৃষ্ট করতেন এবং গ্রামবাসীদের নিজেদের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়াস পেতেন। তাদেরও যে শিক্ষা পাবার, উন্মেষিত হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার অধিকার আছে এইসব ছবি যখন তারা চোখের সামনে দেখত তখন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হ'ত। তারা এক অনাগত সুখের স্বপ্ন দেখত যেদিন তাদের মতো দুঃস্থ এবং অবহেলিত সম্প্রদায়ের লোকেরাও শিক্ষিতের সম্মানে সম্মানিত হবে, সকল মানুষের ভালবাসা পাবে। এর মধ্য দিয়ে তারা চিনে নিত গান্ধীজীকে, ভালবাসত তাঁর আদর্শকে এবং কংগ্রেসকে। 'জুড়ান শিক্ষা-মন্দির'-এর ক্রমবিকাশের কাহিনী সরমা গুপ্তার জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তা তাঁদের সহ-কর্মীদের নিয়ে ঢাকায় 'সত্যাগ্রহী সেবিকাদল' সংগঠন করেন। তাঁরা এইসব কর্মীর দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ১৩ই এপ্রিল নোয়াখালি গিয়ে আশালতা সেন, সরমা গুপ্তা, ঊষাবালা গুহ প্রভৃতি লবণ আইন অমান্য করেন। নোয়াখালি থেকে বে-আইনী লবণজল তাঁরা ঢাকায় নিয়ে এলেন। ঢাকায় বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কের বেদীর উপর উনুন জ্বালিয়ে তাঁরা যখন একটি মৃৎপাত্রে লবণ জ্বাল দিতে থাকেন তখন হাজার হাজার লোকের সমুদ্র যেন প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। লবণ তৈরীর পর কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কত তাড়াতাড়ি বে-আইনী লবণ কিনে আগেভাগে গ্রেপ্তার হ'তে পারবেন। এইভাবে তাঁরা লবণ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডিত হন সত্যাগ্রহী সরযূবালা গুপ্তা, সুনীতি বসু, কামিনী বসু ও প্রতিভা সেন।

১৯৩০ সালের বিভিন্ন সময়ে আশালতা সেন ঢাকার বাইরে গিয়েও কংগ্রেস আন্দোলনের প্রচারকার্য পরিচালিত করেন। শ্রীহট্টের সরলাবালা দেবের আহ্বানে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীহট্টের বহু জায়গায় সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রচারকার্য করতে থাকেন। ঐ উদ্দেশ্যেই সুধাময়ী দাশগুপ্তের আহ্বানে তিনি ময়মনসিংহ ও জামালপুরে যান এবং পঙ্কজিনী দেবীর আহ্বানে

চাঁদপুরে যান। তাঁর আহ্বানে জনসাধারণ গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রতি একটা চুম্বকের আকর্ষণ বোধ করত, তারা আন্দোলনে ঝাঁপ দিত দলে দলে।

১৯৩১ সালে আশালতা সেন 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' সংগঠন করেন। এই সংঘের বহু শাখা তিনি বিক্রমপুরের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ক'রে স্থাপন করেন। ফলে ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিক্রমপুরের মহিলাগণ বহু সংখ্যায় যোগদান করবার প্রেরণা লাভ করেন ও কারাবরণ করেন। এই সময় গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ ক'রে যেতে যেতে আশালতা সেন ও তাঁর সহকর্মিগণ দুপুরে ও সন্ধ্যায় যেমন হিন্দুবাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করতেন তেমনি কখনো কখনো মুসলমান বাড়ীতেও আশ্রয়-গ্রহণ করতেন। হিন্দু মুসলমান নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই কংগ্রেসের প্রতি এত সহানুভূতি ছিল যে, সর্বত্রই তারা সমাদর ও সহযোগিতা পেয়েছেন।

এইসময়কার একটি করুণ কাহিনী আছে। একদিন দুপুরে তাঁরা একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি মুসলমান তাঁতী-বাড়ীতে তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করেন। আশালতা সেন দেখলেন একটি সদ্যবিধবা মুসলমান বধূ তাঁতের কাপড় বুনবার জন্য 'তানা হাটছেন'। তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী বাড়ীর এককোণে বসে ১০।১২ দিন পূর্বে মৃত যুবকপুত্রের জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছেন। বিধবা বধূটি আশালতা সেনকে দেখে তাঁর 'তানা হাঁটা' কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে কাছে এসে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়ে তাঁর সদ্যবৈধব্যের কাহিনী বললেন। কিন্তু দরিদ্রের শোক করবার জন্যও সময় নাই। তিনি তখনি আবার 'তানা হাটতে' উঠে গেলেন। কারণ ঐ 'তানা হেঁটে' তিনি যা উপার্জন করবেন তাই দিয়ে তাঁর ২।৩টি শিশু-সন্তানসহ নিজের অন্নসংস্থান হবে। কাজেই সদ্যমৃত স্বামীর জন্য বুক ভেঙে গেলেও কিছুক্ষণ বসে বুক হালকা করবার অবসর তাঁর নাই। তাঁর দেহে একটি অনাগত শিশুর শীঘ্র আবির্ভাবের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। এই করুণ দৃশ্যটি আশালতা সেনের মনে চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে যায়।

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকাতে আশালতা সেন 'নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করেন। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদাতার আসন গ্রহণ করেন মানভূমের কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সম্বন্ধে তিনি কর্মীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং এমন প্রেরণা

দিতেন যে, কর্মিগণ আন্দোলনের সময় প্রচারকার্যের সঙ্গে কর্মপ্রেরণা বিস্তার করতে করতে দলে দলে নতুন কর্মীসহ গ্রেপ্তার হতেন। এই শিক্ষা-শিবিরে এসে ঢাকা শহর ও বিক্রমপুরের প্রায় ৫০ জন কর্মী শিক্ষা-গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীহট্টেরও চারজন মহিলা ছিলেন।

প্রথমে মেদিনীপুরে কাঁথির একটি গ্রামে এরূপ নারীকর্মী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। তা শুনে ঢাকার এবং পরে শ্রীহট্টের কর্মিগণও ঐরূপ শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। তিন জায়গারই শিক্ষাগুরু ছিলেন নিবারণ দাশগুপ্ত। পিতাকে ঘিরে বসে যেমন ক'রে মেয়েরা তন্ময় হয়ে গল্প শুনে শিক্ষাগ্রহণ করে ঠিক তেমনি ক'রে এই পিতাসম গুরু তাঁদের শিক্ষা দিতেন। মেদিনীপুরের শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি একবার ঐরূপ শিক্ষাদান-কালে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঋষিকল্প নিবারণ দাশগুপ্তের কথা শুনছেন,—কারো মাথার কাপড় সরে গেছে, কারো বেশবাস অসম্বৃত, কেউ সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছেন কিন্তু সেদিকে তাঁদের ভ্রূক্ষেপও নেই—কেবল একাগ্রমনে গুরুর কথা শুনেই যাচ্ছেন। হঠাৎ সেসময়ে বাইরের লোক উপস্থিত হওয়ামাত্র কর্মীরা লজ্জা ও সঙ্কোচে বিব্রত ও সজাগ হয়ে উঠলেন। ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত ও সংসারী আগন্তুকের মধ্যে এই ছিল পার্থক্য। যে কয়েকটি কারণে মেদিনীপুর, ঢাকা ও শ্রীহট্টের মহিলা-কর্মিগণ এত অধিক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগদান করার ও কারাবরণ করার প্রেরণা লাভ করেন তার মধ্যে গুরু নিবারণ দাশগুপ্তের শিক্ষা ও প্রেরণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরে ঢাকাতে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ব্যাপকভাবে সভা-সমিতি দ্বারা প্রচারকার্য চলতে থাকে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসেই 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি'কে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং 'কল্যাণ কুটির'-এর কর্মীদের আবাসগৃহও পুলিস তালাবন্ধ ক'রে রাখে। সেই সময় আশালতা সেন শুধু ঢাকা শহরের নয়, বিক্রমপুরের অনেক মহিলাদেরও ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে এনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করাতে থাকেন। তিনি বিক্রমপুরের নশঙ্কর গ্রামে গিয়ে স্থানীয় কর্মী কিরণবালা কুশারী ও প্রভাসলক্ষ্মী দেবীর সহায়তায় 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' স্থাপন করেন, এবং তিনি বিক্রমপুরের মহিলাদের নিকট থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পান। গ্রেপ্তারের কিছু পূর্বে সরযূবালা

সেনের উপর তিনি 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' পরিচালনার ভার অর্পণ করেন।

এই গ্রাম পরিভ্রমণ-কালে তাঁরা গ্রাম্য দফাদারদের যথেষ্ট সহানুভূতি পেতেন। আশালতা সেন তখন বিক্রমপুরে দৈনিক ৪।৫টি গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরতেন। গ্রামের সরকারী দফাদারেরা মিটিং-এ ব'সে খুব আগ্রহের সঙ্গে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনত। তারপর ধীরে সুস্থে উঠে থানায় গিয়ে এমন সময় সংবাদ দিত যে, থানার লোক আসবার আগেই সভার কাজ শেষ হয়ে যেত। কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি দফাদারদের এরূপ সহানুভূতি না পেলে তাঁদের পক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিনের পর দিন অজস্র মিটিং করা অনেকসময়ই দুঃসাধ্য হ'ত। দফাদারদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন।

তারা যখন গ্রামের পর গ্রাম এইভাবে শত শত লোকের ভিতর বক্তৃতা দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকতেন তখন আশালতা সেন ও তাঁর সহকর্মিগণ শেষরাত্রে এক গ্রাম ছেড়ে রওনা হতেন এবং সন্ধ্যার পর যে গ্রামে পৌঁছাতেন সেখানে সারাদিনের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। মাঝখানে কেবল দুপুরে কোনো গ্রামে খেয়ে নিতেন। রাতের বিশ্রামের পর পুনরায় পরদিন প্রত্যুষের যাত্রা। দুপুরের খাওয়া এবং রাতের বিশ্রাম ছাড়া তাদের ছিল প্রায় অবিরাম যাত্রা। ১৯৩২ সালের ৬ই জানুয়ারি থেকে আরম্ভ ক'রে ৭ই মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পূর পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬১টি গ্রামে ও শহরে ঝড়ের বেগে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা ক'রে গেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর কখনো ক্লান্তি বা অবসাদ আসে নাই অথবা অসুখও করে নাই। তাঁর ছিল অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা।

ঢাকা জেলার যেসব সত্যাগ্রহী ১৯৩২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কারাবরণ করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আশালতা সেনের প্রচেষ্টায় আন্দোলনে যোগদান করেন।

'সত্যাগ্রহী সেবিকাদল'-এর কর্মিগণ ঢাকা জেলার ১৩৫টি গ্রামে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। কারারুদ্ধ মহিলা ছাড়াও বহুসংখ্যক মহিলা আন্দোলনে যোগদান করার ফলে পুলিসের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেন। পুলিস অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার ক'রে বহুদূরের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। অনেককে গ্রেপ্তার না ক'রে তাঁদের পশ্চাতে এমনভাবে ধাওয়া করত যেন তাঁরা কোথাও আশ্রয় না পান। সুরবালা

সেনের পরিচালনায় শোভাযাত্রাকারী এমনি একদল মহিলাকে পুলিস দুইদিন দুইরাত্রি ধরে সঙ্গে সঙ্গে থেকে অবিরাম মাঠঘাটের ভিতর দিয়ে ঘোরাতে থাকে। অবশেষে তাঁদের একটা নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে মাঘ মাসের শীতের মধ্যে রাত্রির গভীর অন্ধকারে এক নির্জন নদীর ধারে নামিয়ে রেখে পুলিস নৌকা নিয়ে চলে যায়। বিপন্ন মহিলাগণ তখন মাইলের পর মাইল দুর্গম মাঠের পথ পায়ে হেঁটে পার হয়ে, অনাহারে অনিদ্রায় প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় একটা গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সাহায্য পান। সুরবালা সেন ও তাঁর সহকর্মিগণ এর পরেও আন্দোলনে পুনরায় অংশগ্রহণ ক'রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এমনই গভীর ছিল তখন গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের প্রভাব এবং স্বদেশসেবার প্রেরণা।

আন্দোলনের সময় এই সত্যাগ্রহী সেবিকাদলের মহিলাদের উপর প্রায়ই লাঠিচাজ করা হ'ত। ফলে সতেরোজন মহিলা আহত হন। তার মধ্যে কমলা দেবী, হেমনলিনী গাঙ্গুলী ও সুনীতি বসুর আঘাত গুরুতর ছিল। লাঠিচার্জ এবং পুলিসের জুলুম তাঁদের যতই নির্যাতন করেছে, বাঙালের জেদ ততই বেড়ে চলেছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে তাঁরা সভাসমিতি করতেন ও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন করতেন, ফলে গ্রামবাসীদের মালপত্র ক্রোক করা হ'ত। মালপত্র ক্রোকের দ্বারা সাধারণ গৃহস্থদের বহু ক্ষতি হ'লেও তাঁরা তাতে বিচলিত হ'তেন না। তা ছাড়া তাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করতেন, মদ গাঁজা ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং করতেন এবং সাইক্লোস্টাইল ক'রে বে-আইনী প্রচারপত্র বিলি করতেন।

আশালতা সেন ১৯৩২ সালের ৭ই মার্চ গ্রেপ্তার হন এবং দুটি মামলায় শাস্তিভোগের পর ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-লাভের পর তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হন। এই সময় থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী ছিলেন।

১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসকর্মী শশীবালা দেবীর অনুরোধে আশালতা সেন তাঁর সহকর্মী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং বরিশালের ইন্দুমতী গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি যেমন কংগ্রেসের প্রচারকার্য করেন তেমনি 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠনে স্থানীয় মহিলা-কর্মীদের সহায়তা

করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, হাওড়া, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, নদীয়া, খুলনা ইত্যাদি জেলাতেও তিনি কংগ্রেসের কার্যের জন্য পরিভ্রমণ করেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। ঢাকার তালতলা অঞ্চলে পুলিসের গুলীতে নিহত তরুণ যুবকদের জন্য আহূত এক শোকসভায় সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীসহ গ্রেপ্তার হন এবং ৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকা জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্তির পরেই এসে পড়লেন তিনি দুর্ভিক্ষ-কবলিত দেশের মধ্যে। তিনি তখন ঢাকা শহর ও তার পাশের গ্রামগুলির মধ্যে তাদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকেন।

১৯৭৬ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সালের নভেম্বর মাসে তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সেখানে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি ঢাকা জেলার অবস্থা জ্ঞাপন করেন। ঢাকার অবস্থাও তখন শোচনীয় ছিল। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বিক্রমপুর অঞ্চলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন।

১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পর থেকে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানেই অবস্থান করছেন এবং আজও সেখানে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। এই কাজে তিনি তাঁর দীর্ঘকালের সহকর্মী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহায়তা পাচ্ছেন।

নেত্রীস্থানীয়া নিরলস কর্মী আশালতা সেন আপন অন্তরে দেশসেবার অনির্বাণ প্রেরণা জ্বালিয়ে নিয়ে বাংলার, বিশেষ ক'রে পূর্ববাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে দেশপ্রেমের একটা প্রবল উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন, ঘরের মায়েদের কন্যাদের সেদিন তিনি নিজের সঙ্গে কর্মস্রোতে প্রবাহিত ক'রে নিয়ে চলেছিলেন বিপুল আকর্ষণে। যে স্বল্পসংখ্যক কর্মী ও নেত্রী প্রাণপণ প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আশালতা সেন তাদের অন্যতম।



শশীবালা দেবী



১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শশীবালা দেবী। পিতা চন্দ্রনাথ বাগচী। তিনি সমাজসেবী ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। শশীবালা দেবী পিতার নিকট থেকেই স্বদেশসেবায় উদ্‌বুদ্ধ হন।

তার বারো বছর বয়সের সময় বগুড়ার লোকনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং চার বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। সাংসারিক অবলম্বন তাঁর এইভাবে ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৩০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত উত্তরবঙ্গে তিনি প্রবলভাবে প্রচারকার্য ক'রে যান। ফলে সেখানে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করবার জন্য নারীসমাজে বিপুল আলোড়ন ও উৎসাহ জাগে।

তাঁর প্রচারকার্যের ধারা ছিল অভিনব। সফরকালে ট্রেনে যেতে যেতে যখন কোনো স্টেশনে একটু বেশীক্ষণ ট্রেন থামত, তিনি সেখানেই নেমে প'ড়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুলতেন। আবার ট্রেন ছাড়বার সময় হ'লেই ট্রেনে উঠে বসতেন। এইভাবে পথে যেতে যেতে অবিরাম চলত তাঁর আন্দোলনের প্রচারকার্য।

তিনি জনসভায় দাঁড়িয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে আকৃষ্ট ও চঞ্চল ক'রে তুলতেন। সত্যাগ্রহীরূপে এক জনসভায় এরূপ বক্তৃতাদান-কালে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তিনি কারাদণ্ডের সময় উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই মুক্তিলাভ করেন এবং কবাচী কংগ্রেসে যোগদান কবেন। পুনবায তিনি ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট চারবাব কারারুদ্ধ হন।

তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসেব সদস্য নির্বাচিত হন। নেলী সেনগুপ্তাব নেতৃত্বে কলিকাতায যখন বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয সেসময় নেলী সেনগুপ্তাব গ্রেপ্তারেব পরে শশীবালা দেবীব সভানেতৃত্বে কংগ্রেসেব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয। এই স্মৃতিই সম্ভবতঃ তাব রাজনৈতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

তাঁব কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র রাজসাহী বিভাগেব আটটি জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না; ফবিদপুব, কুচবিহাব, মেদিনীপুব, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও তিনি সফর কবেছেন এবং ওজস্বিনী ভাষায বক্তৃতা দিযে জনসাধাবণেব মধ্যে রাজনৈতিক জাগবণ এনেছেন।

উত্তববঙ্গে তাঁব বক্তৃতায উদ্দীপিত হ'যে অনেক মহিলা কংগ্রেস আন্দোলনে ঝাঁপিযে পডেন এবং কাবাবরণ কবেন। পুলিস সেখানকার অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তাব ক'বে ট্রেনে তুলে নিযে দূরবর্তী সান্তাহাব স্টেশনে ছেডে দিত। এত উৎপীডনেব পবেও মহিলাগণ ভীত বা নিরুৎসাহ হ'তেন না।

দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয যতীন্দ্রমোহন, খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদাব প্রভৃতি বড থেকে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সকলেই তাঁকে 'বডমা' ব'লে ডাকতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র উত্তববঙ্গেব নারী-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ।

আজ এই ৭৪ বছব বয়সেও তিনি অক্ষুণ্ণ মনোবল নিযে কংগ্রেসের ও সমাজ-সেবামূলক কাজ ক'রে চলেছেন। সকলের কাছেই তিনি আজ 'কংগ্রেসী বুড়ামা' নামে পরিচিত।



লাবণ্যলতা চন্দ

★

লাবণ্যলতা চন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ শহরে। পিতৃভূমিও সেখানেই। তাঁর পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীনাথ চন্দ, মাতা বামাসুন্দরী চন্দ।

পিতা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দেশাত্মবোধ ছিল গভীর এবং ছাত্রদের উপর প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। কোথাও মহামারী বা ভূমিকম্প হ'লে ছাত্রদের নিয়ে তিনি চলে যেতেন সেবা করতে। তাঁর নীরব সেবাভাব কন্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। মা সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করবার দিকে, ধর্মপরায়ণ করবার দিকে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

লাবণ্যলতা চন্দ লেখাপড়া শিখতে লাগলেন উৎসাহের সঙ্গে। বি.এ. পাস করেন তিনি কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলে কাজ করতে করতে। তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লা 'অভয় আশ্রম'-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মনে একটা বিপুল পরিবর্তন আসে। তিনি ১৯৩১ সালে ঐ গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং অভয়-আশ্রমের তত্ত্বাবধানে কন্যা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্ষণপ্রভা সিংহ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে গিরিডি হাইস্কুলের পদ ছেড়ে কুমিল্লায় চলে এসেছিলেন। তিনি লাবণ্যলতা চন্দের সঙ্গে কন্যা-শিক্ষালয়ে যোগদান করলেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাবণ্যলতা চন্দ। রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কনফারেন্স ব্যর্থ হবার পর মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। ১৯৩২ সালেব ৪ঠা জানুযাবি গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পরই ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বোম্বাই থেকে কুমিল্লায ফিবে আসেন এবং অভয-আশ্রমেব বিভিন্ন কেন্দ্রেব ও নানা কংগ্রেস-কেন্দ্রেব কর্মীদেব সঙ্গে আন্দোলনে কি ক'বে কাজ কবা যায সে-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কন্যা-শিক্ষালয়েব সকল কর্মীই আন্দোলনে যোগদান কবেন। আন্দোলনের ফলে কন্যা-শিক্ষালয ভেঙে যায। সরকাব শিক্ষালযটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'বে লাবণ্যলতা চন্দ ও তাঁর সঙ্গে শান্তশীলা পালিত, সবযূ বসু, নবনীতকোমলা সিংহ, গিরিবালা ঘোষ, বিভা গুপ্ত, প্রিয়দা দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তাব হন। তাঁদেব অধিকাংশেরই ৬ মাস থেকে একবছর পযন্ত সশ্রম কারাদণ্ডেব আদেশ হয। মুক্তিব পব পুনরায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবাব ফলে লাবণ্যলতা চন্দের আবো ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। তাঁর সাথীরা অনেকেই আবাব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পযন্ত তিনি কলিকাতায থেকে গঠনমূলক কাজ করেন। এখানে তিনি একটি বযস্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। এই বয়স্কা মেযেরা বিভিন্ন জেলায আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'বে কারাবরণ করেছিলেন। লাবণ্যলতা চন্দ নানা স্থান থেকে এঁদেব সংগ্রহ ক'রে একত্র করেন। নানা বস্তীতে নিয়ে গিযে তাঁদের তিনি গঠনমূলক কাজেরও শিক্ষা দেন। তারপর এই মেযেদের দিয়ে তিনি বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র খোলেন।

এঁদের মধ্যে ননীবালা মাইতি মেদিনীপুরের 'আলোককেন্দ্রে' কাজ করেন। যশোহবের মনোরমা বসু আউটসাহীতে গঠনমূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিছু ডাক্তারী ও মিডওয়াইফারীর কাজও করতেন এবং এইসব কাজের জন্য তিনি সেখানে সুনাম অর্জন করেন। প্রমোদা দাস ও নন্দরাণী দেবী নদীয়া

জেলায় চাঁদের ঘাট গ্রামে ঐরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। নির্মলা সরকার ও মণি দেব কুমিল্লা শহরে অনুরূপ কেন্দ্র খোলেন। সাবিত্রী সিংহ বেথুয়া-ডহরীতে গিযে একটি কেন্দ্র স্থাপন কবেন।

এঁদেব গঠনমূলক কাজেব মধ্যে প্রধান কাজ ছিল হবিজন-পল্লীতে অথবা দবিদ্র পল্লীতে গিযে শিশুদেব লেখাপড়া শিক্ষা ও পবিষ্কার পবিচ্ছন্ন থাকতে শিক্ষা দেওযা। তাঁবা বযস্কা মহিলাদেব লেখাপড়া অথবা শিল্প ও চবকা-কাটা শিক্ষা দিতেন।

১৯৪০ সালে জুন-জুলাই মাসে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লায ফিবে আসেন। তখন কলিকাতাব বযস্ক-শিক্ষাকেন্দ্র কুমিল্লায স্থানান্তবিত কবা হয। ১৯৪১ সালে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান কবেন।

১৯৪২ সালেব 'ভাবত ছাড' আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ কবেন। ১৯৪২ সালেব ৮ই আগস্ট গান্ধীজীব বিখ্যাত 'ভাবত ছাড' প্রস্তাব গ্রহণ কবাব পব লাবণ্যলতা চন্দ বম্বে থেকে কুমিল্লায ফিবে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাবের সাবমর্ম প্রচাব কবতে থাকেন। পনেবো দিনেব মধ্যেই তাঁব বযস্কশিক্ষা কেন্দ্রটিকে বে-আইনী ঘোষণা কবা হয এবং তিনি গ্রেপ্তাব হন। বযস্কা মেযেবাও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'বে কাবারুদ্ধ হন। এঁদেব মধ্যে প্রধান ছিলেন উষা গুহ বায, তরুলতা পাল, সুষমা পাল, সবমা ভট্টাচার্য, মণি দেব, শৈলবালা ধব, চিনু দেব প্রভৃতি।

লাবণ্যলতা চন্দ একবছব নিবপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক থাকেন। ১৯৪৩ সালের শেষে মুক্তি পাবাব পর ফিবে এসে দুর্ভিক্ষেব একটা ভীষণ চেহারা তিনি দেখতে পেলেন। প্রথমে তিনি সঙ্গীদেব সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলার বাজনৈতিক বন্দীদেব পবিবারেব সাহায্যেব জন্য চেষ্টা কবেন। তাঁদের পবিবাবেব অবস্থা দেখে তাঁদেব দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদেব প্রতিপালন করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগে ওঠে। ফলে তিনি মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, ঢাকাব তাজপুরে এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে তিনটি শিশুসদন খোলেন।

পরে তিনি আশা আর্যনায়কম্‌কে প্রশ্ন কবেন—এই শিশুদের নিযে কি করা যায? আশা দেবী তাঁকে শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন। আশা দেবী নিজে ঝাড়গ্রামে শিশুসদন কেন্দ্রে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করার ব্যবস্থা ক'রে দেন। সেই সময়ে গান্ধীজী অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে অভয়-আশ্রমের কর্মীদের ডেকে পাঠান। লাবণ্যলতা চন্দ এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত অভয়

আশ্রমের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। অন্যান্য কথাবার্তার পর লাবণ্যলতা চন্দ শিশুসদনের শিশুদের নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাই দিতে বলেন।

এই সঙ্গে তখন এখানে একটি টিচার্স ট্রেনিং ক্লাসও খোলা হয়। তিন মাসের একটা পাঠ্যক্রম ছিল। অবশ্য একবারই মাত্র এখানে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালে তাজপুর ও ঝাড়গামের শিশুসদনের শিশুদের ঝাড়গ্রামে একত্রিত ক'রে একটি কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার শিশুসদন তাঁরা 'সেভ দি চিলড্রেন কমিটি'র হাতে দিয়ে দেন।

১৯৪৫ সালে ব্রাহ্মসমাজের নিকট থেকে বলরামপুরের একটি সুবিস্তীর্ণ জমি বে-আইনী অভয়-আশ্রমের পক্ষ থেকে লাবণ্যলতা চন্দ্র ও শিশির সেনের নামে লীজ নেওয়া হয়। বলরামপুরে তাঁরা ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির আরম্ভ করেন। জেল-ফেরত তরুণ সম্প্রদায়ের একদল এবং বাইরেরও কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিবিরে শিক্ষাগ্রহণ করবার জন্য যোগদান করেন। প্রথমবার শিবিরে ৬ মাসের পাঠ্যক্রম ছিল। শিবিরের প্রথম-শিক্ষিত দলকে 'সেভ দি চিলড্রেন কমিটি' এবং 'হরিজন বোর্ড' কাজে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় শিবির খোলা হয় একবছরের পাঠ্যক্রমে। অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে দাঙ্গা ঘটে। লাবণ্যলতা চন্দ প্রভৃতি প্রধান কর্মীরা নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রিলিফের কাজ করতে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ছাত্রী ও ছাত্র শিক্ষার্থীরাও ঐ কাজে যোগদান করতে চলে যান। ফলে শিবির ভেঙে যায়। কিন্তু পরে তাঁদের এই অপূর্ণ শিক্ষা পূর্ণ ক'রে দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালে 'ঝাড়গ্রাম শিশুসদন' বলরামপুরে চলে আসে।

নোয়াখালি দাঙ্গার পর ঐ অঞ্চলের ১৬।১৭ বছর বয়সের একশতটি মেয়ে নিয়ে লাবণ্যলতা চন্দ কুমিল্লায় একটি শিবির স্থাপন করেন একবৎসরের জন্য। একবছর পরে এদের মধ্যে অনেক মেয়ের অভিভাবক নিরাপত্তার অভাব হেতু তাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভরসা পান নাই। তাদের জন্য স্বাধীনতা-লাভের পর বাঁকুড়াতে বাড়ী ভাড়া ক'রে আবার কন্যা-শিক্ষালয় নাম দিয়ে লাবণ্যলতা চন্দ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ক্রমে বাঁকুড়ার কন্যা-শিক্ষালয়কে বলরামপুরের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

১৯৪৫ সালে কস্তুরবা-ট্রাস্টের কাজ নদীয়া জেলার সাহেবনগর গ্রামে আরম্ভ হয়। নিরুপমা দেবী ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন; পবে ১৯৪৩ সালেব দুর্ভিক্ষেব সময় তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে রিলিফের কাজ করেন। সেই সময় তিনি লাবণ্যলতা চন্দের সঙ্গে রিলিফের কাজে যুক্ত হন। বাংলাদেশেব কস্তুরবা-ট্রাস্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন লাবণ্যলতা চন্দ। তিনিই নিরুপমা দেবীকে সাহেবনগব গ্রামসেবিকা-শিক্ষণ-শিবিবেব সঞ্চালিকা নিযুক্ত কবেন। ১৯৪৮ সালে ঐ গ্রামসেবিকা-শিক্ষণ-শিবির বলরামপুরে নিয়ে আসা হয়। নিরুপমা দেবী সাহেবনগবে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন এবং বর্তমানে তিনি 'ভূদান যজ্ঞ'ব কাজে আত্মনিযোগ করেছেন।

ক্ষমতালোভহীন নেত্রী লাবণ্যলতা চন্দ অদ্যাবধি গঠনমূলক কাজের মধ্য দিযে নীববে জাতিগঠনেব বুনিযাদ গেঁথে চলেছেন অক্লান্তভাবে। এই বযসেও তাঁর বুনিযাদী শিক্ষাদানের কাজেব পরিধি দেখলে শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা নত হযে আসে।



সরলাবালা দেব



সরলাবালা দেব ১৮৯২ সালে শিলচরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃভূমি তাঁর সিলেট। তাঁর পিতা জগৎ চৌধুরী, মাতা মনোমোহিনী দেবী।

সতেরো বছর বয়সের সময় তিনি বিধবা হন। কিছু একটা কাজে নিজেকে সার্থক করবার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। পিতামাতাও অসময়ে পরলোকগমন করেন।

সুযোগ এসে গেল। ১৯২১ সালে গান্ধীজী সিলেট যান। তাঁর কাছেই তিনি স্বদেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রথম প্রেরণা পান। নিজেকে সার্থক ক'রে তুলবার একটা আলোর রেখা তিনি দেখতে পেলেন। মহা উৎসাহে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের কাজে তিনি গ্রাম ও শহরের লোকদের নিয়ে নেমে পড়লেন।

কিছুদিন পরে সিলেটে 'বিদ্যাশ্রম' নামে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সরলাবালা দেবের খদ্দর-প্রচারের কাজের সঙ্গে 'বিদ্যাশ্রম'-এর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯২৬ সালে সরলাবালা দেবের মামা যতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও মামীমা সুসঙ্গিনী

দত্ত সিলেটে একটি নারী-শিল্পভবন গঠন করেন। সরলাবালা দেব এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এখানে সূতাকাটা ও খদ্দরের যাবতীয় জামা তৈবীব কাজ করা হ'ত। খদ্দবেব জামা 'বিদ্যাশ্রম-'এর সহায়তায় বিক্রি হ'ত। তাঁবা এঁদেব তৈবী সূতাব কাপডও বুনে দিতেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেব সময সিলেটের মহিলাগণ দেশেব কাজে যোগ দেবাব জন্য চঞ্চল হ্যে ওঠেন। 'বিদ্যাশ্রম' তখন সবলাবালা দেবকে সিলেট শহবে এসে ঐ আন্দোলন পবিচালনা কবতে এবং মহিলাদেব সংগঠিত করতে আহ্বান কবেন। সে আহ্বানে সবলাবালা দেব গ্রাম থেকে সিলেট শহবে চলে আসেন এবং সেখানে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ' নামে একটি বাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি ছিলেন তাব সম্পাদিকা, সভানেত্রী ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুবী। মহিলা সংঘেব ছাত্রীসংঘ, স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ছিল।

১৯৩০ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যখন দলে দলে ছেলেবা কাবারুদ্ধ হন তখন 'বিদ্যাশ্রম' এব সহাযতায মহিলা সংঘ বাজনৈতিক আন্দোলন পবিচালনা কবেন। গ্রামেব শত শত মেযেবা ঘব থেকে বেবিযে এসে সভা ও শোভাযাত্রা কবতে লাগলেন এবং আইন অমান্য কবতে নেমে পডলেন।

১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে সবলাবালা দেবেব আহ্বানে ঢাকাব আশালতা সেন শ্রীহট্টে যান এবং তাঁব আন্দোলনমূলক ও গঠনমূলক কাজে সহায়তা কবেন।

১৯৩১ সালে সবলাবালা দেবেব উদ্যোগে শ্রীহট্টে একটি 'নারীকর্মী শিক্ষাযতন' প্রতিষ্ঠিত হয। এখানে পুরুলিযাব কংগ্রেস-নেতা নিবারণ দাশগুপ্ত প্রায ৫০টি নারীকর্মীকে কংগ্রেস ও গান্ধীজীব আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা মহিলাদের মধ্যে যে প্রেবণাব সৃষ্টি কবেছিল তাতে ১৯৩২ সালের আন্দোলনে শ্রীহট্টেব মহিলাগণ দলে দলে ঝাঁপিযে পডেছিলেন। ১৯৩২ সালেব আন্দোলনে তাঁবা বিলাতী কাপড ও বিলাতী দ্রব্যের দোকানের সামনে দাঁডিয়ে পিকেটিং কবতেন; একদল জেলে চলে গেলে, আব একদল তৎক্ষণাৎ সামনে এসে দাঁড়াতেন। বে-আইনী সভা ও শোভাযাত্রা তো ছিলই। ১৯৩২ সালের আন্দোলন পবিচালনা করতে গিয়ে সরলাবালা দেব দেড়বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। অন্যান্য বহু মহিলা-কর্মী কারারুদ্ধ হন।

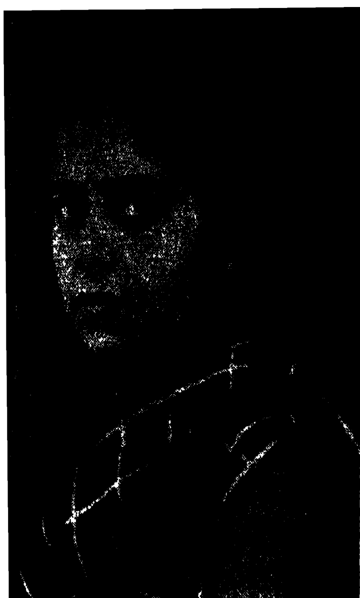
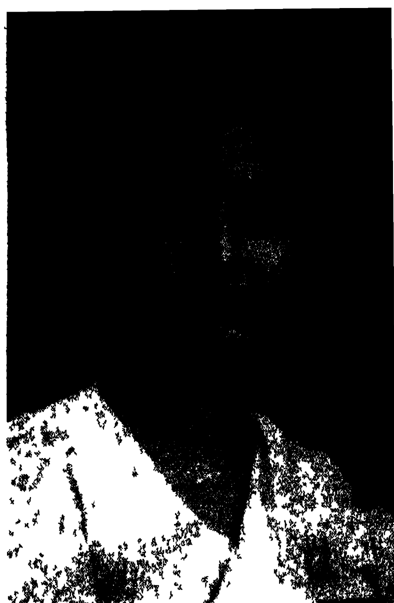
জেল থেকে ফিরে আসার পর সরলাবালা দেবের পরিচালনায় মহিলা-কর্মিগণ তাঁত, চরকা, স্কুল, শিল্পশিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা, হরিজন স্কুল প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। কাজ শুধুমাত্র শহরেই আবদ্ধ ছিল না, গ্রামে গ্রামেও তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভানুবিল অঞ্চলে মণিপুরী কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'-র মহিলাগণও যোগদান করেন। লীলাবতী দেবী ও সাবিত্রী সিং নামে দুইটি মণিপুরী নারীও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে গ্রেপ্তার হন ও জেলে প্রেরিত হন। অত্যাচারী ও শোষণপরায়ণ জমিদারের বিরুদ্ধে ছিল মণিপুরী কৃষকদের আন্দোলন।

১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান ক'রে সরলাবালা দেব, শশীপ্রভা দেব ও নরেশনন্দিনী দত্ত কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সরলাবালা দেব শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের ডিক্টেটার নির্বাচিত হন। দলে দলে মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন। আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে সরলাবালা দেব কারাবরণ করেন; মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

শ্রীহট্টের মহিলা-আন্দোলন ও নারীজাগরণে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন সরলাবালা দেব।

সুর্মা ভ্যালি—অর্থাৎ শ্রীহট্ট জেলা ও কাছাড়া জেলা—ছিল তখন বাংলা-দেশের সঙ্গে যুক্ত। তাই বাংলার নারী-আন্দোলনের সঙ্গে আসে ঐখানকার আন্দোলনের কাহিনী। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর সুর্মা ভ্যালির কাছাড় জেলা এবং করিমগঞ্জের একটা অংশ রইল আসামের সঙ্গে যুক্ত, শ্রীহট্ট জেলার অবশিষ্ট অংশ চলে যায় পাকিস্তানে।

শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ)

★

১৯১৭ সালের ২২শে মে (৯ই জ্যৈষ্ঠ) সুনীতি চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। পিতৃভূমি তাঁর ত্রিপুরা জেলাব নবীনগর থানার মধ্যে ইব্রাহিমপুর গ্রামে। তাঁর পিতা উমাচরণ চৌধুরী ও মাতা সুরসুন্দরী দেবী।

১২।১৩ বছর বয়স থেকেই সুনীতির মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল। কুমিল্লার বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও তাঁদের বিপ্লবী জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী তিনি বিস্মিত হ'য়ে শুনতেন এবং তাঁদের কথা আরো জানবার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে উঠতেন। তাঁর দাদারা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী।

১৯১৬ সালের ২২শে নভেম্বর শান্তি ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়। তাঁর পিতৃভূমি বরিশাল, কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছিলেন কুমিল্লায়।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন কুমিল্লা কলেজের প্রফেসার। তাঁর মাতা সলিলাবালা ঘোষ। শান্তির পিতা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও আদর্শবাদী।

তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সন্তানরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আত্মত্যাগ করতে শেখে। তিনি নিজেই তাদের স্বদেশী গান শেখাতেন। একবার সরোজিনী নাইডু কুমিল্লায় একটি সভায় বক্তৃতা দেন। সেই সভায় শান্তি গাইলেন—

"ভারত আমার, ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র" ···

সভা থেকে ফিরে এসে বাবার কাছে শান্তি যখন মহা উৎসাহে সভার বর্ণনা করছিলেন, বাবা বললেন, "আজ তুমি যাঁর সভায় গান গাইলে, একদিন যেন তুমি তাঁর মতো বড় হ'তে পার।"

১৯২৬ সালে শান্তির পিতার অকালমৃত্যু হয়।

১৯২৮ সালে সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে কুমিল্লায় যে তীব্র বিক্ষোভ জেগেছিল তাতে শান্তির অন্তর আলোড়িত হ'যে ওঠে।

শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। শান্তির সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম। প্রফুল্লনলিনী যুগান্তর নামে বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। শান্তি ও সুনীতিব তেজস্বিতা প্রফুল্লকে আকৃষ্ট করে। প্রফুল্ল তাঁদের প্রভাবান্বিত করেন এবং দলেব নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিযে দেন। শান্তি ও সুনীতি দলের উৎসাহী কর্মী হ'য়ে ওঠেন। নানা স্বদেশী বই পড়তে পড়তে তাঁদের মন আরো চঞ্চল ও প্রস্তুত হ'য়ে উঠতে থাকে।

১৯৩০ সালে কুমিল্লায় চলেছিল আইন অমান্য আন্দোলন। জনতার উপরে ইংরেজের অত্যাচার কুমিল্লার সমস্ত কিশোর ও যুবমনকে প্রচণ্ড একটা ঘা দিয়ে ফিরছিল। তার ঢেউ এসে ধাক্কা দিতে লাগল শান্তি সুনীতি প্রফুল্ল প্রভৃতিকেও। তাঁদের মনে হ'ত ইংরেজ তাড়াতে পারলে তবেই আসবে আমাদের দেশের মঙ্গল। শোভাযাত্রার উপরে লাঠিচার্জের ফলে কর্মীদের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তাঁদের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠত।

তাঁরা চমৎকার লাঠি ও ছোরা খেলা শিখে নিলেন। তারপর অভ্যাস করতে লাগলেন রিভলভার ছুঁড়তে ময়নামতী পাহাড়ে গিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় লাঠি-ছোরা খেলা শেখাবার ও বিপ্লবাত্মক পুস্তক পড়াবার মধ্য দিয়ে তাঁরা সংগঠন ক'রে চলেছিলেন। উৎসাহের একটা নতুন জোয়ারে ছোট কুমিল্লা শহর তখন জীবন্ত।

১৯৩১ সালের প্রথমার্ধে কুমিল্লায় ছাত্র-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই

কিশোরী বন্ধুরা গ'ড়ে তুলেছিলেন ছাত্রীসংঘ। প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম তার সভানেত্রী, শান্তি ঘোষ সম্পাদিকা এবং সুনীতি চৌধুরী ক্যাপ্‌টেন। ছাত্রী-সংঘের প্রায় ৫০।৬০টি ছাত্রীকে ক্যাপ্‌টেন সুনীতি শেখাতেন ড্রিল ও প্যারেড। এই ছাত্রীরা ছিলেন ছাত্র-কনফারেন্সের সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ স্বেচ্ছাসেবিকা।

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল, শান্তি, সুনীতি শুনেছেন বিপ্লবীদের অনুষ্ঠিত গার্লিক হত্যা, সিম্পসন হত্যার ঘটনাবলী। প্রফুল্ল ও শান্তি ভাবলেন তাঁরাও কেন করবেন না? দলের নেতাদের কাছে প্রফুল্ল ও শান্তি কিছু একটা বিপ্লবী কাজ করবার জন্য বারবার তাগিদ দিতে থাকেন।

দলের নেতারা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্টেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'রে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে চরম আঘাত হানবেন। দলের পুরাতন কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রফুল্ল থাকবেন বাইরে। দরকার হ'লে তিনি আত্মগোপন ক'রে কাজ ক'রে যাবেন। তাঁর বাইরে থাকা তখন বেশী প্রয়োজন ছিল। আরো স্থির হয় যে, শান্তি সুনীতি একটা দরখাস্ত দেবার অজুহাতে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে কাজ হাসিল করবেন।

১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সকালে শান্তি সেজেগুজে বসে আছেন এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী এল দলের দাদাদের নির্দেশমতো। শান্তি গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ীতে ছিলেন সুনীতি। তাঁদের গাড়ী গিয়ে ঢুকলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে।

চাপরাসীর হাতে তাঁরা ইন্টারভিউ-কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স বেরিয়ে এলেন। দায়িত্ব পালনের সুযোগ সমাগত দেখে শান্তি সুনীতি গুলী ছুঁড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হ'ল। শান্তি দেখলেন সমস্ত ঘরটাতে চলেছে ছুটোছুটি দাপাদাপি এবং বিকট চীৎকার। সুনীতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুজন লোকে তাঁকে জাপটে ধরেছে রিভলভারটা কেড়ে নিতে। শান্তিকে পেছন থেকে একজন লোক শক্ত ক'রে ধ'রে রয়েছে, আরেকজন শান্তির রিভলভার-সুদ্ধ হাতটা চেপে ধরেছে। অশ্রাব্য ভাষায় তারা গালাগালি করছে। চাপরাসীরা তাঁদের কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মারছে। পুলিস-লাইনের সামনে পাগলা-ঘন্টি বেজে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে পুলিস এসে সব ঘিরে ফেলল; শান্তি-সুনীতির হাত পেছনে

বেঁধে দিয়ে তাঁদের বেদম প্রহার করতে লাগল। এমন সময় ডি.আই.বি. ইন্সপেক্টার এসে প্রহারের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁদের দুজনকে দুই জায়গায় সরিয়ে দেয়। জেরা চলে আলাদা আলাদা ভাবে। গুপ্তকথা পুলিস কিছুই আদায় করতে পারেনি। তারপর নিয়ে যায় তাঁদের কুমিল্লা জেলে।

পরদিন বন্দী হয়ে এলেন সেখানে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের ইন্দুমতী সিংহ। চট্টগ্রামের অনন্ত সিংহের ভগ্নী ইন্দুমতী সিংহ তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অর্থসংগ্রহের জন্য কুমিল্লায় গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পরে শান্তি-সুনীতিকে নিয়ে আসা হয় কলিকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। মামলা শুরু হয় ১৯৩২ সালের ১৮ই জানুয়ারি। মামলার সময় শান্তি সুনীতি তাঁদের হাসি, উচ্ছ্বাস ও তেজস্বিতায় সমস্ত কোর্টকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। মামলার দ্বিতীয় দিনে ডকে তাঁদের বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি ব'লে তাঁরা পিছন ফিরে দাড়িয়ে রইলেন। তারপর থেকে শেষদিন পর্যন্ত ডকে তাঁদের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৭শে জানুয়ারি শান্তি-সুনীতি সমগ্র সত্তা কেন্দ্রীভূত ক'রে যখন অপেক্ষা করছিলেন ফাঁসীর আদেশ শুনবার জন্য তখন তাঁরা দণ্ডাদেশ শুনলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের। অফুরন্ত উৎসাহভরা প্রাণ তাঁদের সেই মুহূর্তে নিরাশাবোধই করেছিল। কিন্তু তাঁরা যে ১৪।১৫ বছরের কিশোরী নাবালিকা! স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী! ফাঁসী কি ক'রে হবে?

এই দুটি কিশোরী মেয়ের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের বুকে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা তখনকার দিনের লোক আজও হয়তো ভুলে যাননি। যে বাংলাদেশের নারী-সমাজ শত লাঞ্ছনাও মুখ বুজে সহ্য করেন, শত আঘাতেও নীরবে অশ্রুপাত করেন কিন্তু প্রত্যাঘাত করার কথা মনে আনেন না, সেই সমাজের দুটি কিশোরীর একি রণরঙ্গিণী মূর্তি! দ্বিধাগ্রস্তের মনে সেদিন দৃঢ়তা জাগলো। যুবসমাজের চিত্তে জাগলো চমক, উৎসাহে উদ্দীপনায় তারা দুঃসাহসের পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত। ছোট্ট দুটি মেয়ে যেন ধূমকেতুর মতো সমগ্র দেশকে তোলপাড় ক'রে দিয়ে গোটা সমাজের হ'য়ে শাস্তি বহন করতে কারান্তরালে চলে গেলেন দেশবাসীকে চাঞ্চল্যে ও বিস্ময়ে হতবাক্ ক'রে দিয়ে।

শান্তিকে করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী, সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর। বিভেদ এনে শাসন করা হচ্ছে ইংরেজের নীতি। শান্তি-সুনীতিকে মাঝে মাঝে

একসঙ্গে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আলাদা আলাদা ক'রে প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর, রাজসাহী, হিজলী প্রভৃতি জেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্থানান্তরিত করা হ'ত।

যখন তাঁরা মেদিনীপুর জেলে ছিলেন তখন সেখানকার জেলার ও মেট্রনের অনাচারের বিরুদ্ধে শান্তি, সুনীতি ও বীণা দাস অনশন করেছিলেন সাতদিন। ফলে জেলারকে ওখান থেকে বদলি করা হয়। কিন্তু এই বন্দিনীদেরও পৃথক পৃথক জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। শান্তি ও বীণা গেলেন হিজলী জেলে, যেখানে ছিলেন বিনাবিচারে বন্দী রাজবন্দী মহিলাগণ। সুনীতিকে নিয়ে যায় রাজসাহী জেলে। শান্তি সুনীতি যেখানেই যখন গেছেন, তাঁদের চমৎকার কণ্ঠসঙ্গীতে অন্যসকল বন্দীকে ও সারা জেলখানাকে তাঁরা মাতিয়ে রাখতেন।

মেদিনীপুর জেলে থাকতেই সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করা হয়। কারাজীবনের মর্মান্তিক শাস্তি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর জীবন যাপন করা। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর প্রতি ছিল সর্বপ্রকার অসম্মানজনক ব্যবহার। কুর্তা ও শাড়ী যে একেবারে চটের মতো মোটা হ'তে পারে তা তখনকার দিনের তৃতীয়শ্রেণীর কয়েদী ভিন্ন অন্যে জানে না। তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্য সাধারণ লোকের কল্পনার বাইরে। কী শক্ত আর মোটা ভাত। সেগুলি চিবোতে না পারলেও গিলতেই হবে। বালতি-ভর্তি হল্‌দে রঙের জল—তার নাম ডাল। কী ডাল সেটা বোঝা যায় না। তাতে আবার এমন কাঁচা-কাঁচা গন্ধ যে, খেতে গিয়ে মনে হয় যেন সদ্য ক্ষেত থেকে কাঁচা ডাল অসময়ে তুলে এনেছে। আর তরকারী? বিস্বাদ ঘ্যাঁটটা গলা দিয়ে যাবার সময় গলার মধ্যে কেমন একটা ঘ্যাঙডানির কষ্ট হয়, কেমন খুসখুস করে। এই হচ্ছে ইংরেজ আমলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য খাদ্যের রূপ। বাড়ীতে অতি-দরিদ্রের মুখের ডালভাতও এর কাছে অমৃত। তা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী পাবে একখানা মাত্র বই। কারাজীবনে কখনো অল্পদিনের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে সুনীতি চৌধুরীকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময় শুধুই সাধারণ কয়েদীরা ছিল তাঁর সঙ্গী, অর্থাৎ প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীজীবনে তাঁর উপর অপমানকর অন্যান্য উৎপীড়নেরও অন্ত ছিল না।

ওদিকে সুনীতিদের বাড়ীটাকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁদের পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। সুনীতির বাবার পেনসান বন্ধ ক'রে দিল। সুনীতির দুই দাদাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করল।

তাঁর পিতামাতা ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে উপবাসের মুখে পড়ে গেলেন। আত্মীয়স্বজনেরা সাহায্য করতে গেলে পুলিস তাঁদের নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। তাঁরা সাহায্য বন্ধ করলেন। সুনীতির ছোট ভাই আর্থিক সঙ্গতির চেষ্টা করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লিষ্ট জীবন যাপন করবার ফলে যক্ষ্মাতে মৃত্যুবরণ করেন। এর উপরেও বাড়ীতে পুলিসের অত্যাচারের অবধি ছিল না। বাড়ীর এই নিদারুণ দুঃখের কথা সুনীতি জেলে সবই জানলেন, কিন্তু দুঃখের বজ্রাঘাতে মাথা নত করবেন সুনীতি সে-মেয়ে ছিলেন না। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া এ-মেয়ে। ভারতের উজ্জ্বল এক বত্ন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে বাংলার কারাগারে সকলের অজ্ঞাতে ভস্মে আচ্ছাদিত রইলেন।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" কাকে বলে জানি না, কিন্তু সাধারণ জীবন যে কত অসাধারণরূপে ফুটে উঠতে পাবে—কত 'স্থিতধী' হ'তে পারে তা দেখা যায় সুনীতির মতো মেয়ের মধ্যে।

কারাপ্রাচীরের দুর্ভেদ্য লৌহবর্মের মধ্যে শান্তি সুনীতি কাটিয়ে দিলেন সাতটা শীত ও বসন্ত। অবশেষে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় অন্যসকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে তাঁদেরও মুক্তির আদেশ আসে ১৯৩৯ সালের এক প্রাতে।

মুক্তির পর শান্তি সুনীতি পড়াশুনা করতে থাকেন। দুজনেই ম্যাট্রিক পাস করলেন। তারপর শান্তি পাস করেন আই.এ.; সুনীতি আই.এস্‌সি। সুনীতি এম্.বি. পাস ক'রে ডাক্তাব হন। ডাক্তাররূপে আজ তিনি নীরবে সেবা ক'রে চলেছেন কত দুঃস্থ ও পীড়িত মানবের। ১৯৪৭ সালে সুনীতির বিবাহ হয় চব্বিশ-পরগনার প্রদ্যোতকুমার ঘোষের সঙ্গে।

শান্তির রুচি ফুটে উঠল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। আপন জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন তিনি 'অরুণ-বহ্নি' নামক পুস্তকে। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি কর্ম্মমুখব।

১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্তমানে শান্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান-সভার সদস্য।



বীণা দাস (ভৌমিক)

★

বীণা দাস ১৯১১ সালের ২৪শে আগস্ট কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব দাস ও মাতা সরলা দাস। পিতৃভূমি তাঁর চট্টগ্রাম। তাঁর দিদি কল্যাণী দাসের জীবনীতে পূর্বেই তাঁর শৈশবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

শৈশব থেকে বীণা সমগ্র পরিবারের নিবিড় স্নেহমমতা এবং অগাধ বিশ্বাস পেয়ে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছিলেন। বড় হবার সাথে সাথে বাইরের জগতের সঙ্গে যতই পরিচিত হ'তে লাগলেন ততোই তিনি অনুভব করলেন 'অসীম বেদনাভরা মানবজীবন'। তাঁর মানসিক সুখশান্তির জগতে আলোড়ন দেখা দিল। দেশের দুঃখ দুর্গতি ও পরাধীনতার গ্লানি তাঁর মনকে আকুল ক'রে তোলে।

অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রবল তরঙ্গ তখন দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বীণাদের পরিবারেও এই তরঙ্গের ধাক্কা লাগে। তাঁর মেজদাদা আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন। পিতা নিজে চরকা ও খদ্দর এনে দিতেন। তিনি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অন্যদিকে পিতার জীবন থেকে বীণা শিক্ষা পেয়েছিলেন, একটা আদর্শের জন্য মানুষ কতবড় ত্যাগস্বীকার নিজের জীবনে করতে পারে।

মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের আকুল আহ্বান এবং আদর্শবাদী পিতার আদর্শনিষ্ঠা বীণার মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে তুলেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথকে নিজের জীবনে বেছে নিতে।

১৯২৮ সালে এসেছিল সাইমন কমিশন। বেথুন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। ঐ সালেই কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে বীণা ও কল্যাণী দুই ভগ্নী পরম উৎসাহে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীতে যোগদান করেন।

সেই সময়ে বীণা বেথুন কলেজে পড়তেন। তাঁর সহপাঠী সুহাসিনী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্ত ছিলেন একটি ছোট বিপ্লবী দলের সভ্য। বীণার মতো আদর্শবাদী আধার পেয়ে তাঁরা বীণাকে তাঁদের বিপ্লবী দলে টেনে নেন।

১৯৩০ সালে আরম্ভ হয়েছিল গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। পাশাপাশি চলেছিল বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দিয়ে যার আরম্ভ। বীণা কান পেতে শোনেন আর বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁদের গৌরবগাথা নিয়ে মনে মনে ছবি আঁকেন।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে ডালহাউসি স্কোয়ারে বাংলার অত্যাচারী পুলিস-কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্টকে বোমা ও রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করবার অপরাধে গ্রেপ্তার হন দীনেশ মজুমদার এবং নিহত হন অনুজা সেন। ঢাকায় বিনয় বসু লোম্যানকে গুলীর আঘাতে পররাজ্য-শাসনের চরম পুরস্কার দিয়ে পালিয়ে যান। তারই কিছুদিন পরে আবার কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয় বসুর আবির্ভাব হয় দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তের সঙ্গে। তিনজনেই আক্রমণ করেন সিম্পসন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজকে। বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত নিজ মস্তকে গুলী ক'রে ও সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলের দুটি কিশোরী ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে নিহত ক'রে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা বাংলাদেশের সত্তাকে প্রবল ধাক্কায় আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার আক্রমণের পর বীণাদের সেই ছোট দলের নেতা এবং তাঁদের আরো অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। তা ছাড়া নানা আভ্যন্তরীণ কারণে তাঁদের ছোট দলটি ভেঙে যায়। এদিকে চলেছে তখন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে

স্বাধীনতা-সংগ্রামের মরণ-উৎসব। বীণা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলেন ওই সংগ্রাম-সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে।

একদিন তিনি যুগান্তর-দলের কর্মী কমলা দাশগুপ্তের কাছে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন এবং 'ডিগ্রী' নেবার সময় কন্‌ভোকেশান-হলে অথবা কলিকাতার রেস-কোর্সে গভর্নরকে গুলী করবার জন্য রিভলভার চাইলেন।

তখনকার দিনে গুপ্তদলগুলি একে অন্যের কাছে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা অথবা কথাবার্তা বলতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না। তাই বীণাকে দিয়ে এ কাজ করাবাব এতবড দায়িত্ব নেওযা সম্বন্ধে কমলা প্রথমদিনই বীণাকে কথা দিলেন না।

বীণাকে তিনি চিনতেন। তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু কল্যাণী দাসেব ছোটবোন বীণা। বীণার স্বভাব ছিল মধুর ও আদর্শপ্রবণ, আর ছিল তাঁর আবেগপূর্ণ প্রাণ।

বীণার সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন এই কাজের বিপদের দিকটা আলোচনা ক'রে বোঝাতে লাগলেন যেন মুহূর্তের আবেগে তিনি কিছু কবতে না যান। বীণা বইলেন দৃঢ আপন সংকল্পে।

কমলা অন্যদিকে আলোচনা করতে থাকলেন নিজেদের দলেব মধ্যে। তিনি ডেকে পাঠিযেছেন তাঁর পরম বিশ্বাসের পাত্র সুধীর ঘোষকে। সুধীরেব সঙ্গে তাঁব আলোচনার মূল কথাটা দাঁডাল এইরকম: গভর্নর হচ্ছেন শাসন ও প্রভুত্বের পূর্ণ প্রতীক। এই পূর্ণ প্রতীককে আঘাত ক'রে বিপ্লবের বন্যাটাকে তীব্রতম স্রোতে, দুর্দম গতিতে এগিযে নিযে গিযে নিজেদের নিঃশেষে অবলুপ্ত ক'রে দেওযাই ছিল তখন তাঁদের একমাত্র সাধনা ও লক্ষ্য। অতএব পরামর্শে স্থির হয, কন্‌ভোকেশান-হলে গভর্নরকে গুলী করা হবে এবং গুলী করার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে। এই কাজের জন্য চরম শাস্তির যে বিধান ছিল—সেই ফাঁসী, দ্বীপান্তর, বর্বব অত্যাচার সবই বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন তাঁরা।

কমলা দাশগুপ্ত ২৮০৲ টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে দিলেন সুধীর ঘোষের হাতে রিভলভার কিনে আনতে।

কয়েকদিন পরেই এল অতিকষ্টে স্মাগ্‌ল্-করা রিভলভার। সেদিনই বিকালে কমলা চলে গেলেন বীণার সঙ্গে দেখা করতে। আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিলেন তিনি বীণার হাতে, বুঝিয়ে দিলেন তার প্রতিটি অংশের ব্যবহার অন্যের অলক্ষ্যে।

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি সেনেট-হলে কন্‌ভোকেশান বসেছে। গভর্নর স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন অভিভাষণ পাঠ শুরু করেছেন। বীণা দাস নিজের আসন থেকে উঠে এসে গভর্নরের কয়েক হাত দূর থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন। গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে গুলী চলে গেল। সৈনিকের জাত, অতি সতর্ক কান, তৎক্ষণাৎ গভর্নর মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। কর্নেল সুরাওয়ার্দি ডায়াস থেকে ছুটে এসে বীণার গলা টিপে ধ'রে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করতে থাকেন। তবুও বীণার হাতের বাকী গুলী কয়টা ঐ অবস্থাতেও ছুটেছিল।

বীণা দাসকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। অপমানকর ভাষায় পুলিস তাঁকে জেরা করে রিভলভার পাবার রহস্য জানতে। বীণা রইলেন নিরুত্তর।

কোর্টে বীণা একটি বিবৃতি দেন। একদিনেই বিচার শেষ ক'রে তাঁকে* ৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পরাধীন ভারতে যেসব আত্মভোলা কর্মী স্বাধীন ভারতের সৌধমূল গেঁথে তুলবার জন্য আত্মবিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন—বীণা দাস তাঁদের অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ, শক্তিধর গভর্নরের প্রতি গুলী-নিক্ষেপ সেদিন ভূমিকম্পের মতো ফাটল ধরিয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমিতে।

যদিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের পুলিস জানেনি, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কমলা দাশগুপ্ত এবং সুধীর ঘোষকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে জেলে নিয়ে যায় এবং রাজবন্দী ক'রে রাখে তাঁদের ছয়বৎসরেরও বেশী।

বীণা দাসকে নিয়ে যায় প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুর জেলে। সেখানে ছিলেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। মেদিনীপুরে কিছুদিন তাঁদের আনন্দেই কেটেছিল। কিন্তু জেলখানা আনন্দের জায়গা নয়। ঐ জেলের জেলারের অনাচারের প্রতিবাদে এঁরা তিনজন অনশন আরম্ভ করেন। উপবাসের সপ্তম দিনে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবী মেনে নিলেন। তারপর বীণা দাস ও শান্তি ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয় হিজলী জেলে,

* এই ঘটনার বিশদ বিবরণ লেখিকার 'রক্তের অক্ষরে' পুস্তকে আছে।

যেখানে রাজবন্দিনীরা ছিলেন। সুনীতি চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজসাহী জেলে।

বাংলাদেশের নানা জেলে স্থানান্তরিত হ'য়ে থাকার পর গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় সকল রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে বীণাও মুক্তি পান। পুরো সাতবছর জেলে কাটিয়ে বীণা বেরিয়ে আসেন ১৯৩৯ সালে।

গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় শুধু রাজনৈতিক বন্দী নন, বিনাবিচারে বন্দীরাও সকলেই মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৮ সালের মধ্যে। বেরিয়ে আসার পর সব দলই নতুন পরিস্থিতিতে আত্মচিন্তা করতে লাগলেন। যুগান্তর-দলের নেতারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি ও গুপ্তদল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে স্থির করেন যে, তাঁদের আর গুপ্তদল এবং পৃথক কর্মপদ্ধতি রাখবার প্রযোজনীয়তা নেই। তাঁরা নিজেদের দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন। 'ফরওয়ার্ড' সাপ্তাহিক কাগজ তখন তাঁরাই পরিচালনা করেন। 'মন্দিরা' নামে একটি রাজনৈতিক মাসিকপত্রিকাও তারা পরিচালনা করেন। মুক্তির পর বীণা দাস এসে এদের সঙ্গে কাজে যুক্ত হলেন। 'মন্দিরা'র সম্পাদিকা তখন কমলা দাশগুপ্ত। কঠিন পরিশ্রম ছিল এই কাগজ পরিচালনা করা। মনের মধ্যে অদ্ভুত আশা নিয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে ক'রে কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, মায়া ঘোষ, রেবা ঘোষ, কমলা সেন, সুপ্রীতি মজুমদার, প্রভাবতী বসু, শান্তা বসু, স্নেহলতা সেন, দুলু দত্ত ও অন্যান্য সহকর্মিগণ 'মন্দিরা'র জন্য খাটতেন। লেখা সংগ্রহ করা, ডালহাউসি স্কোয়ারের বিরাট দালানগুলি ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন যোগাড় করা প্রভৃতি কোনো কাজকেই তাঁদের নীরস বা একঘেয়ে মনে হ'ত না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ যে। বীণা দাস ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর লেখাগুলি আজও পুরাতন 'মন্দিরা'র আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

'মন্দিরা' মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন :

কমলা চ্যাটার্জী—বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে কার্তিক ১৩৪৫ পর্যন্ত।

কমলা দাশগুপ্ত—অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ থেকে শ্রাবণ ১৩৪৯,
পৌষ ১৩৫২ থেকে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত।

স্নেহলতা সেন—ভাদ্র ১৩৪৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ পর্যন্ত। (এইসময় কমলা দাশগুপ্ত জেলে ছিলেন।)

বীণা দাস ওদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে গণসংযোগের

কাজও করতে থাকেন। কংগ্রেসের এক প্রধান কর্মসূচী ছিল গণসংযোগ করা। তিনি টালিগঞ্জের চালের কলের বস্তীতে গিয়ে বস্তীবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তাদের চরম দুর্গতি নিজের হৃদয়ে অনুভব করতেন। দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলত।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে আরম্ভ হয় শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম। বীণা দাস ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি ছিলেন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা। তিনি দক্ষিন কলিকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন হাজরা পার্কে। বে-আইনী সভা। একটি সহকর্মীকে ব্যাটন দিয়ে প্রহাররত সার্জেণ্টের হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরতেই পুলিস বীণা দাসকে গ্রেপ্তার করে। এবারে তিনি নিরাপত্তা বন্দী হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে রইলেন প্রায় তিন বছর। জেল থেকে মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সদস্য ছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কর্মচারীদের ইউনিয়নের তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ঐ ইউনিয়নের কর্মীদের অভিযোগ ও বিক্ষোভ জমা হ'য়ে ছিল বহুদিনের। অভিযোগের প্রতিকারের জন্য এক দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুই সহকর্মী ও সহায়ক ছিলেন তারাদাস ভট্টাচার্য এবং বীরেশ্বর ঘোষ। এ-ছাড়া আরো কতকগুলি ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীণা।

নোয়াখালির দাঙ্গার পর তিনি সেখানে দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে চলে যান। গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল গ্রামে গ্রামে গিয়ে দু-একটি কর্মী মিলে এক-একটি কেন্দ্র ক'রে বসবেন। কর্মীদের কর্তব্য ছিল গ্রামের ভয়ার্ত লোকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করা, পুনর্বসতি স্থাপন করা, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি। বীণা দাসের উপর ভার ছিল রামগঞ্জ থানার নোয়াখোলা গ্রামে কেন্দ্র ক'রে বসার।

স্বাধীনতা আসার মুখে সাহিত্যিক বীণা লিখেছিলেন আপন জীবন-কাহিনী 'শৃঙ্খল-ঝঙ্কার' নামক পুস্তকে।

১৯৪৭ সালে তাঁর বিবাহ হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে।



প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার



১৯১১ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। দেশও চট্টগ্রামেই। তাঁর পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার ও মা প্রতিভাময়ী দেবী।

প্রীতিলতার শৈশবে চট্টগ্রামের মেয়েদের লেখাপড়ার প্রচলন বিশেষ ছিল না। প্রীতির পিতাও মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে প্রথমে উদাসীন ছিলেন। ছেলেদের জন্য তিনি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। প্রীতিলতা তার দাদার পড়ার ঘরের পিছনে বই হাতে লুকিয়ে থাকত। যে মুহূর্তে দাদার পড়া হয়ে যেতো, প্রীতিলতা ছুটে গিয়ে মাস্টারমশাইর কাছে বসত। ওর এত আগ্রহ দেখে তিনিও পড়াতেন। মায়ের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় ও সাহায্যে এবং প্রীতিলতার নিজের উৎসাহে সাতবছর বয়সে প্রীতি স্কুলে ভর্তি হয়।

বড় হয়ে ছাত্রীজীবনে প্রীতিলতা ঢাকায় লীলা নাগের 'দীপালী সংঘ' এবং কলিকাতায় কল্যাণী দাসের 'ছাত্রীসংঘ'-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এই মেলামেশা তাঁকে রাজনৈতিক প্রেরণা দেয়। ওদিকে বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারও তাঁর মধ্যে বিপ্লবী বীজ বপন করবার চেষ্টা করেন। পরে তিনি সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

স্কুলের ছাত্রী প্রীতিলতা তাঁর কৃতিত্বে সকলের প্রিয়পাত্রী হন। তখন থেকেই তিনি নানা বিপ্লবাত্মক বই পড়তেন। রাত জেগে ইংরিজিতে ডায়েরী লিখতেন। বাংলায় নানা প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখে তিনি সকলকে চমৎকৃত করতেন। শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবান পার্থসারথির রূপ তাঁর উপাস্য ছিল।

আই.এ. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৩০ সালে। বেথুন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি পারিতোষিক পান। তারপর বিপ্লবী কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে, ১৯৩২ সালে বি.এ. পরীক্ষার সময় ইংরাজি অনার্স তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় এবং তিনি ডিস্টিংশনে বি.এ. পাস করেন।

১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কত বিপ্লবী প্রাণ আহুতি দিলেন, কতজন বন্দী হলেন এবং অনেকে আত্মগোপন ক'রে বিপ্লবী কাজ পরিচালিত করতে থাকলেন। এই সময় প্রীতিলতা বিপ্লবীদের গোপন খবর আদানপ্রদান করতেন এবং চট্টগ্রাম ও কলিকাতার ভিতর সংযোগ রক্ষা করতেন। চাঁদপুরে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টার তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রীতিলতা আদেশ পেলেন মাস্টারদার কাছ থেকে। যদিও তখনো পর্যন্ত প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদার সাক্ষাৎ হয় নাই। তারপর প্রীতিলতা প্রায়ই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দেখা করেছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে রামকৃষ্ণের বোন ব'লে জানত। একদিন সকাল আটটায় প্রীতিলতা যথারীতি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হঠাৎ শোনেন যে, সেদিন ভোর চারটায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয়ে গেছে। শোনামাত্র তিনি এমন একটা মানসিক আঘাত পেলেন যে, তিনি যেন দিশা হারিয়ে ফেললেন। জেলের দরজায় একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে তাঁর কপালটা অনেকখানি ফুলে উঠল। অথচ সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালও হ'ল না। সেই থেকে কিছুদিন পর্যন্ত তিনি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন না, কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলেন, ভাবতেন পড়াশুনা ক'রে কি আর হবে?

১৯৩২ সালে বি.এ. পাস করার পর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে নন্দনকানন গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

সেই সময় ধলঘাট গ্রামে ৺নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর

বাড়ীতে সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। প্রীতিলতা ধলঘাট গ্রামে লুকিয়ে পুরুষের বেশে গিয়ে সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন। কল্পনা দত্ত তাঁকে মাস্টারদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই তাঁর সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা।

গরীব বিধবা মা সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এই পলাতক বিপ্লবীদের সেবাযত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ধলঘাট মিলিটারী ক্যাম্প অদূরে অবস্থিত ছিল। প্রীতিলতা এখানে মাঝে মাঝে এসে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতেন।

একদিন ঐ বাড়ীর উপর পুলিসের নজর পড়ে। ১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাত ৮টায় মিলিটারী ও পুলিস বাড়ী বেষ্টন করে। বাড়ীতে আছেন তখন মাস্টারদা সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

তাঁরা সবাই নীচের ঘরে খেতে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে সবাই উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি ভিতরের বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে তাঁরা দোতলায় চলে যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ধাক্কা দিয়ে নীচের ঘরের দরজা খুলে ফেলে। কাউকে না দেখে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে সবাই তৈরী হ'য়েই ছিলেন। দোতলায় ঢুকবার মুখেই নির্মল সেনের গুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। কিছুসময় কোনো সাড়াশব্দ নেই। সব নিস্তব্ধ। বিপ্লবীরা অন্ধকারে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলেন। নির্মল সেন মিলিটারী বেষ্টনীর অবস্থান লক্ষ্য করবার জন্য সন্তর্পণে বারান্দার টিনের উপরে উঠতে গেলে শব্দ হয়। শব্দ শুনেই গুর্খারা গুলী চালায়। নির্মল সেন নিহত হন। মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেন তখন উপর থেকে অন্ধকারে নেমে আসেন। আস্তে আস্তে পূর্বদিকের গড় পার হয়ে পাটিপাতার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা অগ্রসর হন। সন্‌সন্‌ শব্দ লক্ষ্য ক'রে গুর্খা সৈন্যরা গুলী ছুঁড়তে থাকে। অপূর্ব সেন গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা বেষ্টনী ভেদ ক'রে অন্য গ্রামে ভিন্ন আশ্রয়ে উপনীত হন। সাবিত্রী দেবী ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণকে ভোররাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। ধলঘাট গ্রামে ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে যায়। 'রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ' নামে একটি লেখা প্রীতিলতা মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন। লেখাটি এবং অন্যান্য কিছু দলিলপত্র এই সময়ে তাঁরা ডোবাতে ফেলে দিয়ে চলে যান। লেখাটি পুলিসের হাতে পড়ে যায়।

পরের দিন প্রীতিলতা যখন নিজের বাড়ীতে ভালো মেয়েটির মতো ব'সে আছেন তখন সদলবলে পুলিস গিয়ে হাজির। বাড়ী খানাতল্লাসী ও নানা প্রশ্নের পর তারা সেদিন চলে যায়। প্রীতিলতা পড়লেন পুলিসের কড়া নজরে। ঘন ঘন বাড়ী তল্লাসী হ'তে লাগল। প্রীতিলতা তখন কাজ করবার সুবিধার জন্য মাস্টারদার কাছে আত্মগোপন করবার নির্দেশ চাইলেন। মাস্টারদার নির্দেশে তিনি তাঁর কাছেই চলে গেলেন। বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সময় শেষবারের মতো গাইলেন "শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও— জননী এসেছে দ্বারে"।

প্রায় তিনমাস তিনি মাস্টারদার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রামের নানা স্থান থেকে ঘন ঘন বিপ্লবাত্মক কাজের সংবাদ আসতে থাকে। ইংরেজ সরকার গ্রামের ভিতরও তোলপাড় ক'রে তোলে। মিলিটারী ও পুলিস গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সমস্ত জায়গা ছেয়ে ফেলে এবং অত্যাচারের নির্মম চাকা চালিয়ে দেয়। একটা গ্রাম তো জ্বালিয়েই দিয়েছিল। তখন কিসের পড়াশুনা? যুবশক্তি পড়াশুনার কথা ভাবতে পারত না। মিলিটারী ও পুলিসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করা। সূর্য সেনের জন্য ঘোষণা করা ছিল দশহাজার টাকা পুরস্কার, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের জন্য পাঁচশত টাকা।

প্রীতিলতা ক্রমে মরিয়া হ'য়ে উঠলেন। তিনি মাস্টারদার নিকট থেকে বিশেষ কোনো বিপ্লবী কাজ করবার আদেশ চাইলেন। অবশেষে অনুমতি মিললো।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে দশ-বারোজন কর্মী গিয়ে পাহাড়তলী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন বোমা ও রিভলভার দিয়ে। ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। কর্মীরা সকলেই অক্ষতদেহে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান। কিন্তু সফলকাম প্রীতিলতা আর ফিরলেন না! তিনি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত পাহাড়তলী পুলিস ঘিরে ফেলে। অত্যাচারের অন্ত রইল না।

পুলিসের নির্যাতনের মুখে প্রীতিলতাকে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ সেদিন আসতে পারেনি। শহীদ প্রীতিলতার নশ্বর তনু সেদিন অজ্ঞাত

অখ্যাত ভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেল। মৃত্যুকালে বয়স ছিল তাঁর মাত্র একুশ বছর।

পাহাড়তলী ইযোরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আগের দিন, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন তিনি তাঁর মাকে যে চিঠিখানি লিখে গিয়েছিলেন তা নীচে দিলাম ঃ

"মাগো! তুমি আমায ডাকছিলে? আমার যেন মনে হ'ল তুমি আমার শিযরে ব'সে কেবলি আমার নাম ধ'রে ডাকছ, আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা! সত্যই কি তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায ডেকে ডেকে হযরান হ'য়ে চলে গেলে। স্বপ্নে একবার তোমায দেখতে চেয়েছিলাম—তুমি তোমার বড আবদারের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে। কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বল্লাম না। দুচোখ মেলে কেবল তোমার অশ্রুজলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মুছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না। মা! আমায তুমি ক্ষমা কর—তোমায বড ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেজেছে। তোমাকে দুঃখ দেওযা আমার ইচ্ছা নয। আমি স্বদেশজননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

"একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি মা! প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আমার অভাব তোমাকে যে পাগল ক'রে তুলেছে তা আমি জানি। মাগো! আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছ—'ওগো, তোমরা দেখে যাও—আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।' তোমার সেই ছবি আমার চোখের উপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর বাজায়। মাগো, তুমি অমন ক'রে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কি করবে মা! দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ্য

করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে? আর কেঁদোনা মা! তুমি আর চোখের জল ফেলো না। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! তোমার সঙ্গে আমি যে দুর্ব্যবহার ক'রে এসেছি সেকথা নিযতই আজ আমার বুকে শেলের মতো বিঁধে। ইচ্ছা হয ছুটে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তুমি আমায আদর ক'রে বুকে টেনে নিতে চেযেছ—আমি তোমার হাত ছিনিযে চলে এসেছি—খাবারের থালা নিযে আমাকে কত সাধাসাধিই না করেছ—আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

"না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওযা ভিন্ন আর আমার উপায নেই। আমি তোমাকে দু'দিন ধ'রে সমানে কাঁদিয়েছি—তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে একটুকু টলাতে পারেনি। কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হ'তে পাবল কি ক'রে? ক্ষমা কবো মা! আমায তুমি ক্ষমা করো!"

এঁদেরই স্মরণ ক'রে স্বাধীন ভারতের কবি গাইলেন:

"মুক্তির মন্দিব-সোপান-তলে
কত প্রাণ হ'ল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।"

কল্পনা দত্ত (যোশী)



চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে কল্পনা দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই। তাঁর পিতা বিনোদবিহারী দত্ত ও মাতা শোভনাবালা দত্ত। পিতৃভূমি চট্টগ্রামেই।

কল্পনা দত্তের ঠাকুর্দা ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইংরেজ সরকার তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিকে অনেকখানি সম্মান দিত। ফলে তাঁদের বাড়ীটা পুলিসের নজর থেকে বহুদিন নিরাপদ ছিল।

শৈশব থেকেই কল্পনার মনের গঠন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। তাঁর স্পর্শকাতর মন যখন দেখত, কোনো ভিখারী তার দুঃখের বোঝা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, অথবা কোনো দুঃখী এসে তার দুঃখকাহিনী বর্ণনা ক'রে গেল তখন বালিকা কল্পনার মনে এই কামনা জাগত—সংসারে যেন দারিদ্র্য না থাকে, দুঃখ না থাকে, সকলেই যেন একসঙ্গে সুখে দিন যাপন করতে পারে। রূপকথার কল্পনার রাজ্য তাঁর মনে সত্য হয়ে দেখা দিত।

আর একটু বড় হবার পর প্রায় বারো বছর বয়স থেকেই তাঁর হাতে এসে পড়ে ক্ষুদিরাম-কানাইলালের জীবনী, 'পথের দাবী' প্রভৃতি স্বদেশী বই। এগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মনে হ'ত ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে যদি আমরা সরিয়ে দিতে পারি, যদি আমরা স্বাধীন হ'তে পারি, তবেই আমাদের দেশের দুঃখ দূর হবে। তাঁর ছোটকাকা তাঁকে আদর্শ দেশসেবিকারূপে গ'ড়ে উঠবার প্রেরণা দিতেন। ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসিক কাজের দিকে তাঁর প্রবণতা জাগে। তিনি তখন নিজেকে ফাঁসীর জন্য মনে মনে প্রস্তুত ক'রে তুলছিলেন।

১৯২৯ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। লেখাপড়া অথবা জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রেই তিনি সর্বদা একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকতেন। তাঁর চোখে মুখে ও চেহারায় এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যা লোকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করত।

তিনি যখন কলিকাতা এসে বেথুন কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রথম বার্ষিক

শ্রেণীতে পড়ছিলেন তখন রাজনৈতিক ধারাগুলি একে একে তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। কল্যাণী দাসের 'ছাত্রীসংঘে' তিনি যোগদান করেন। ফলে বেথুন কলেজে হরতাল পালন এবং অন্যান্য আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ওদিকে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের অনুগামী পূর্ণেন্দু দস্তিদার কল্পনার মতো একটি প্রস্তুত ক্ষেত্র পেয়ে বিপ্লবের বীজ বপন করবার চেষ্টা করেন। এইভাবে কল্পনা বিপ্লবীদের প্রথম সংস্পর্শে আসেন।

এমন সময় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়—নেতা সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে। তখনো সূর্য সেন অর্থাৎ মাস্টাদার সঙ্গে কল্পনা দত্তের যোগাযোগ হয় নাই। ঐ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কল্পনা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিপ্লবী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার জন্য। তার কয়েকদিন পরেই তিনি চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়ের মারফত সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। মাস্টারদা তখন নিজেই কল্পনার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রশস্ত্র ও গোপন জিনিস তিনি নিজের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন।

১৯৩০ সালের শেষের দিকে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অনেক পলাতকই গ্রেপ্তার হয়ে চট্টগ্রাম জেলের হাজতে ছিলেন। তাঁরা জেলের ভিতরে ও বাইরে বহু স্থানে ডিনামাইট বসিয়ে নানা জায়গা উড়িয়ে দিয়ে জেলের বন্দীদের মুক্ত করতে এবং চট্টগ্রামের পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট ও ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে মাস্টারদার সঙ্গে ১৯৩১ সালের মে মাসে কল্পনা দত্তের দেখা হয় এবং মাস্টারদার নির্দেশমতো তিনি কাজ করতে থাকেন। ফলে তিনি এই ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। কল্পনা দত্ত কলিকাতা থেকে বোমা তৈরী করবার মালমশলা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান এবং চট্টগ্রামের বাড়ীতে বসে গান্-কটন্ তৈরী করতে থাকেন। সেগুলি চলে যেতো জেলের ভিতরে। এই সময় চট্টগ্রাম জেলের অনন্ত সিং প্রভৃতির সঙ্গে মাস্টারদার যোগাযোগ রক্ষা হ'ত কল্পনা দত্তের মাধ্যমে। ১৯৩১ সালে ঐ ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার আগের দিনই পুলিস সেটা আবিষ্কার ক'রে ফেলে। যদিও পুলিস কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পায় নাই, কিন্তু তারা তাঁকে সন্দেহ ক'রে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার আদেশ দেয়, অর্থাৎ তাঁকে শুধু চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে বি.এস্‌সি. পড়বার

অনুমতি দেয় এবং কলেজ থেকে বাড়ী যাতাযাত ছাড়া অন্যত্র যাতাযাত বন্ধ ক'রে দেয়।

সেই সময় তিনি অনেকদিন রাত্রে পালিযে গ্রামে চলে যেতেন এবং সূর্য সেন, নির্মল সেন প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করতেন, রিভলভার ছুঁড়তে অভ্যাস করতেন। তিনি একদিন মাস্টারদার সঙ্গে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্তকে দিয়ে মাস্টারদা কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ করাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাহাড়তলী ইযোরোপীযান ক্লাব আক্রমণ করবার জন্য এঁদের দুজনের যাবার কথা ছিল। ঐ কাজের এক সপ্তাহ পূর্বে কল্পনা গ্রেপ্তার হযে যান। পাহাড়তলী ইযোরোপীযান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কল্পনাকে মাস্টারদা ডেকে পাঠিযেছিলেন। যে পথ দিযে তাঁর কাছে যেতে হবে সেই এলাকায একটি মেযের পক্ষে একা যাওযা তখন নিরাপদ ছিল না। সেজন্য কল্পনা পুরুষের বেশে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হন। কিন্তু পথে ঐ বেশেই তিনি গ্রেপ্তার হ'যে যান। একমাস পরে পুলিস কোনো কিছু প্রমাণ না পেযে তাকে জামীনে খালাস দেয়। মামলা ছিল '১০৯ ধারার' 'ভ্যাগাবণ্ড কেস'। তখন তিনি মাস্টারদার নির্দেশে আত্মগোপন করেন।

তিনি যখন মাস্টারদার সঙ্গে গৈরালাতে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে পলাতক ছিলেন তখন ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুযারি হঠাৎ মিলিটারী এসে রাত্রে সেই বাড়ী ঘেরাও ক'রে ফেলে। মাস্টারদার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণীন্দ্র দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত ও ব্রজেন সেনগুপ্ত। মিলিটারী বাড়ী ঘেরাও করেছে টের পেয়েই বিপ্লবীরা পালিয়ে যাবার জন্য সন্তর্পণে এগিয়ে যান। একপাশে খাদ, অন্যপাশে পুকুর—মাঝখানে বাঁধের উপর বাঁশঝাড়ের সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হন তাঁরা। মিলিটারী ও বিপ্লবী উভযপক্ষে সংগ্রাম চলে। মিলিটারীর লোকেরা ইলুমিনেটিং বোমা ছুঁড়ে দিবালোকের মতো আলো ক'রে ফেলে বিপ্লবীদের দেখতে পায়। বেয়নেট চার্জ ক'রে বাঁশঝোপের মধ্যে অবস্থানকারী বিপ্লবী-বীর সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে তারা ধরে ফেলে। শান্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাশগুপ্ত গুলী করতে করতে অন্তর্ধান হন। কল্পনা দত্ত মাস্টারদার সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তিনি পড়লেন গিয়ে ডোবায়। ডোবায় ছিলেন মণীন্দ্র দত্ত। ডোবা থেকে দুজনেই উঠে একটা বাঁশঝোপে আশ্রয় নিয়ে পুনরায় তাঁরা গুলী চালাতে

লাগলেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার একটা পুকুরের মধ্যে তাঁরা প্রায় একঘণ্টা ডুবে রইলেন শুধু নাকটুকু বের ক'রে। সেখান থেকে বহুকষ্টে তাঁরা মিলিটারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।

ওদিকে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে হাতে ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে সিপাহীরা টেনে নিয়ে যায় পটিয়া থানার দিকে। মাস্টারদা দড়ির টান সামলাতে না পেরে পথিমধ্যে কর্ষিত জমির মাটির ঢেলার উপর প'ড়ে যান।

সন্ধ্যায় মিলিটারী রিজার্ভ-ট্রেনে উঠিয়ে তাঁদের ষোলোশহর স্টেশনে আনা হয়। সেখানে ট্রেনের কামরায় উঠে গোয়েন্দা পুলিস ও শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টরা মাস্টারদার নাকে মুখে নির্মমভাবে ঘুষি মারতে থাকে। তাঁর নাক থেকে রক্তস্রোত বয়ে চলে, মাস্টারদা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। জল দিয়ে তাঁকে কিছু সুস্থ ক'রে আই.বি. অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তারপর এস.পি. হিক্স এবং এ.এস.পি. স্প্রিংফিল্ড এসে ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো তাঁদের মারতে আরম্ভ করে। ষোলোশহরের ঘটনার কথা বলার পর প্রহার বন্ধ হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

মাস্টারদাকে জেল থেকে বের ক'রে আনবার জন্য বাইরে অবস্থিত বিপ্লবীরা একটা প্রস্তুতি করতে লাগলেন। প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ তখন একদিন হঠাৎ তাঁদের একটি কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজ-পত্র ও রিভলভার পাওয়া যায়। ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ফলে মাস্টারদাকে নির্জন কক্ষে মিলিটারী প্রহরায় রাখা হয় এবং বৈদ্যুতিক তার দিয়ে জেলপ্রাচীর ঘিরে দেওয়া হয়।

এই সময়ে গ্রামে গ্রামে মিলিটারীর অত্যাচারের অবধি ছিল না। চট্টগ্রামকে 'মিলিটারী এরিয়া' ঘোষণা করা ছিল। প্রতি গ্রামেই ছিল মিলিটারী ক্যাম্প। আত্মগোপন ক'রে থাকা তখন অতি কঠিন কাজ। সেজন্য অবিরাম আশ্রয়স্থান পরিবর্তন করতে করতে কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, মনোরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দে এবং অর্ধেন্দু সমুদ্রের কাছে গাহিরা নামে একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে কয়েকদিন আত্মগোপন ক'রে থাকার পর ১৯৩৩ সালের ১৯শে মে তারিখে অতিভোরে মিলিটারী এসে অবিশ্রান্ত গুলীবৃষ্টি করতে থাকে। বিপ্লবীপক্ষেরও গুলী চলে। যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবী মনোরঞ্জন দত্ত নিহত হন। আশ্রয়দাতা পূর্ণ তালুকদারও

নিহত হন, তাঁর ভাই নিশি তালুকদার আহত হন মারাত্মকভাবে। বিপ্লবীদের গুলী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবার পরে সকলেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। মিলিটারী সুবাদার কল্পনা দত্তকে ভীষণ এক চপেটাঘাত করে। তৎক্ষণাৎ মিলিটারী সৈনিকরা তীব্র প্রতিবাদ করে। বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের চোখে লোহার কাঁটাওলা মিলিটারী বুট দিয়ে তারা এমন লাথি মারে যে, তাঁর চোখ থেকে দরদর ধারায় রক্ত বের হ'তে থাকে। পরে বাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবার সময় আবার তাঁকে হাণ্টার দিয়ে মারতে থাকে। তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার পথে অন্য ছেলেদের মতো কল্পনা দত্তকেও হাতে হাতকড়া লাগিয়ে এবং কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়।

এই মামলার নাম ছিল 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টারী কেস'। এর চার্জ ছিল রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন, হত্যা প্রভৃতি। এই মামলার আসামী ছিলেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত। মামলার রায়ে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসীর আদেশ এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

১৯৩৭ সালের ১২ই জানুয়ারি রাত্রি ১২টার সময় বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সূর্য সেন ও তাঁর যোগ্য শিষ্য তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়ে যায়। সেই সাধনাপূত মৃতদেহ দুটি কোথায় গেল আজও তা কেউ জানে না।

কল্পনা দত্ত প্রায় ৬ বছর জেলে থাকার পর মুক্তি পান ১৯৩৯ সালের মে মাসে। বি.এস্‌সি. পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে তিনি গ্রেপ্তার হন, মুক্তির পর ১৯৪০ সালে তিনি বি এ পাস করেন।

১৯৪০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিস তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে।

বিপ্লবীর দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা যেন সেদিন বিপদকে প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান ক'রে ফিরছিল। বিপন্ন জীবনকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে করতে ছুটে চলেছিলেন আত্মাহুতি দিতে উন্মুখ বিপ্লবীরা। বরেণ্য বিপ্লবী মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে কল্পনা দত্তের নামও বিপ্লবের ইতিহাসে একসঙ্গে লিখিত হবার দাবী রাখে।

১৯৪৩ সালের ১৪ই আগস্ট কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. যোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।



উজ্জ্বলা মজুমদার

(রক্ষিত রায়)



১৯১৪ সালের ২১শে নভেম্বর ঢাকা শহরে উজ্জ্বলা মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা জেলায় কুসুমহাটির সুরেশচন্দ্র মজুমদারদের জমিদার-পরিবার সাহসে ও দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ ব'লে পরিচিত ছিল।

আট বছর বয়সে উজ্জ্বলার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা ছিলেন বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত। ১৯২৮ সালে উজ্জ্বলার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর বাবা কলিকাতা থেকে ঢাকা শহরে দু-একটি অস্ত্র নিয়ে যাবার প্রয়োজনে নিজেই কন্যার কোমরে ঐ অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে ঢাকা চলে যান। মুখে বিপ্লবের কথা বলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই সেখানে ছিল না। তাঁকে দিয়ে এই বিপ্লবী কাজ করানোর অর্থই ছিল তাঁকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। উজ্জ্বলা বুঝলেন ইংরেজের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তি পাবার এই প্রকৃষ্ট পথ। তিনি 'বি.ভি.' নামক বিপ্লবীদলে যোগদান করেন।

১৯৩০—৩২ সাল বাংলার ইতিহাসে তথা ভারতের ইতিহাসে এনেছিল মহা কর্মসাধনার কাল। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ক'রে তুলেছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজ-বিরোধী, অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাইটার্স বিল্ডিংসে বিপ্লবীদের কাণ্ড, লোম্যান-সিম্প্‌সন-পেডি-গার্লিক-স্টিভেন্স-ক্যামেরন-

ডগলাস-বার্জ হত্যা; এবং হডসন-নেলসন-ভিলিয়ার্স-ক্যাসেল-গ্রাস্‌বি-ডুর্নো-জ্যাক্‌সন প্রমুখের রক্তাক্ত রূপ ভারতবাসীকে বিস্মিত ক'রে তুলেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে ভয়স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল।

এদেশের নারী তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ। শান্তি, সুনীতি ম্যাজি-স্ট্রেট স্টিভেন্সকে নিহত করেছেন। বীণা দাস কলিকাতা সেনেট-হলে গভর্নর জ্যাক্‌সনকে গুলী করেছেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার শহীদ হয়েছেন। ওদিকে 'বেণু', 'স্বাধীনতা' পত্রিকা এবং 'চলার পথে' প্রভৃতি পুস্তক বিপ্লবের পথে আত্মাহুতি দেবার জন্য যুব-বাংলাকে আহ্বান জানাচ্ছিল। সেই আহ্বান সেই যুগে তরুণ-তরুণীদের চিত্তে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল। উজ্জ্বলাও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উজ্জ্বলা ছাত্রীদের মধ্যে ও তরুণীদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত ক'রে চলেছিলেন। তাঁদের বাড়ীটা তখন ছিল বিপ্লবীদের একটা আড্ডা। নির্বিরোধ বিমাতা এবং স্নেহশীলা ঠাকুরমা কোনোদিকেই নজর দিতে পারতেন না। পিতাও অধিকাংশ সময় ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কলিকাতা থাকতেন।

১৯৩৪ সালের মে মাসে পুলিসের সমস্ত সতর্কতা উপেক্ষা ক'রে কয়েকটি তরুণ ও একটি তরুণী দার্জিলিং এসে পৌছলেন একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

দার্জিলিং-এর স্নো-ভিউ হোটেলে উঠলেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী এবং জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে উঠলেন ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী। একটি হারমোনিয়ামের মধ্যে উজ্জ্বলা মজুমদার এনেছিলেন দুটি আগ্নেয়াস্ত্র দুর্ধর্ষ গভর্নর এণ্ডারসানের উপর আক্রমণের জন্য।

প্রথমজীবনে গ্রামে থাকায় উজ্জ্বলার পাঠ্যজীবন দেরীতে আরম্ভ হয়। প্রায় কুড়িবছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ঠাকুরমাদের জানালেন পরীক্ষার পর বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছেন কয়েকদিনের জন্য। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে একবস্ত্রে চলে আসেন তিনি কলিকাতা, তারপর দার্জিলিং।

দার্জিলিং পৌঁছে তাঁরা শুনলেন গভর্নর একটি 'ফ্লাওয়ার শো'-তে আসছেন। কৌশলে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলেন কিন্তু কাজ সমাধা করা সম্ভব হ'ল না। তবু তাঁরা উৎসাহ হারালেন না।

সেদিন ৮ই মে ১৯৩৪ সাল। দার্জিলিং সহরে লেবং-এর মাঠে ঘোড়দৌড়

হচ্ছে। গভর্নব এণ্ডারসন উপস্থিত থাকবেন। স্যানাটোরিয়াম থেকে দামী ইওরোপীয় পোশাক প'রে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী বের হলেন। তাঁদেব সঙ্গে লুক্কায়িত আছে গুলীভরা রিভলভার। তাঁদের দূর থেকে অনুসরণ ক'বে চললেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। উজ্জ্বলা মজুমদারের পরনে একটি রঙীন শাড়ী, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী পরিধান করেছেন স্বদেশী পরিচ্ছদ।

ঘোড়দৌড়েব মাঠে সকলেই উপস্থিত হলেন। গভর্নর তাঁর আসনে উপবিষ্ট। ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী গভর্নরের কাছাকাছি রিভলভারের তাক-মতো জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছেন। এখন প্রার্থিত লগ্নের অপেক্ষা।

এদিকে দলের নির্দেশমতো উজ্জ্বলা মজুমদাব ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর কাজ হযে গেছে। তাঁবা লেবং ত্যাগ কবলেন। দার্জিলিং স্টেশনে এসে অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁবা ট্রেনে উঠে বসলেন। টিকিট কবাই ছিল। ততক্ষণে লেবং-এর মাঠে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছে।

সন্ধ্যার একটু আগে শিলিগুড়িতে ট্রেন এসে পৌছালে পুলিস-বাহিনী হন্তদন্ত হযে ট্রেন ঘেবাও করল। টেলিফোন-কলে তাবা আদেশ পেয়েছে ট্রেন তল্লাসী ক'বে একটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করতে। তার চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, পরনে গোলাপী রঙেব শাড়ী ও গায়ের রং গৌর। পুলিসের দৃষ্টি উজ্জ্বলা মজুমদারের উপরেও পড়ল। কিন্তু তাঁর চোখেও চশমা নেই, পবনেও সাদা শাড়ী।

তারা দুজনে কলিকাতা এসে পৌছালেন। অবশেষে পুলিস উজ্জ্বলা মজুমদারকে খুঁজে বের করল ভবানীপুরে শোভারাণী দত্তের বাসায়। শোভারাণী 'যুগান্তর'-দলের কর্মী। রাজনৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে তখনকার দিনে যে-কয়েকটি মহিলা অগ্রসর হয়েছিলেন শোভারাণী দত্ত তাঁদের অন্যতম। শোভারাণী দত্তের বাসা থেকে ১৮ই মে উজ্জ্বলা মজুমদার ও শোভারাণী দত্তকে গ্রেপ্তার ক'বে পুলিস নিযে যায়। শোভারাণী অবশ্য লেবং ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সূত্রে তাঁর দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না।

উজ্জ্বলাকে আনা হয় প্রথমে কার্সিয়াং জেলে এবং পরে দার্জিলিং জেলে। তাঁর বিপ্লবী বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী দার্জিলিং জেলে ছিলেন আগে থেকেই। কলিকাতা থেকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছিল মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী, সুকুমার ঘোষ প্রভৃতিকে।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের মামলা শুরু হয়েছে। সকলেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনবার জন্য প্রস্তুত। বিচারে ভবানী ভট্টাচার্য, রবি ব্যানার্জী ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর ফাঁসীর হুকুম হয়, উজ্জলা মজুমদারের সাজা হয় বিশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, অপর বন্দীদের সাজা হয় দ্বীপান্তরের। হাইকোর্টের আপীলের রায়ে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসীর হুকুম বহাল রইল। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ও রবি ব্যানার্জীর বিশ বৎসর এবং উজ্জলা মজুমদারের চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। দণ্ডিত বন্দীরা অন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। উজ্জলা মজুমদারকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে।

১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ছিল ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসীর তারিখ। রেখেছিল তাঁকে রাজসাহী সেনট্রাল জেলে। অন্যদিকে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলের রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ উজ্জলা মজুমদার। দুর্গম পথের সহযাত্রী, বন্ধু ও সতীর্থ ভবানীর কথা তাঁর বিনিদ্র রজনীতে বার বার মনে পড়ছে। সে-রাতের স্মৃতিকাহিনী উজ্জলা প্রায় এক যুগ পরে নিজেই লিখেছিলেন—"তারপর রাজসাহী জেলের এক অসহ্য রাত। দূরান্তের অপর এক জেলে বসে শুনি, রাত্রির গভীরে কিশোর বন্ধুর কণ্ঠে তুলে দিয়েছে ফাসীর রজ্জু বিদেশী শাসক। মুহূর্তে ধুলায় গড়িয়েছে তার সোনার শরীর। সে দুঃসহ রজনীর ব্যথাবিধুর ইতিহাস জীবনে ভুলবার নয়। কিন্তু তারো মধ্যে ছিল এক পরম বাণী। সারারাত সেই বাণীকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম ভবানীরই কণ্ঠে বারে বারে শোনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে—

'কাঁপিবে না ক্লান্ত কর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি
দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।' "

তারপর বাংলাদেশের নানা জেলে কেটে গেল উজ্জলার বন্দীজীবনের পাঁচটি বছর।

অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে ঢাকা জেল থেকে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে উজ্জলা মজুমদার মুক্তি পান।

চলে আসেন তিনি কলিকাতায়। ১৯৪২ সালে আরম্ভ হয় শেষ জাতীয় সংগ্রাম 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে উজ্জলা

পুনবায গ্রেপ্তার হন। পুলিস তাঁকে নিবাপত্তা আইনে বন্দী ক'বে রেখে দেয় প্রেসিডেন্সি জেলে।

১৯৪৬ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে তিনি মুক্তি পান। মুক্তিব পর বন্ধুদেব সঙ্গে তিনি 'ফবওযার্ড ব্লক' দল গঠনে অগ্রসব হন।

নোযাখালিতে দাঙ্গা হযে যাবাব পব সেখানে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিযে তিনি সেবাব কাজে আত্মনিযোগ কবেন।

১৯৭৭ সালে এল স্বাধীনতা। তখন শবৎচন্দ্র বসুব নেতৃত্বে গঠিত সোশ্যালিস্ট বিপাব্লিকান পার্টিব সঙ্গে তিনি যুক্ত হ'ন। জেলেব মধ্যে তিনি বি এ এবং মুক্তিব পব বি.টি পাস কবেন।

বাবাসতে বাজাবহাট থানাব অনুন্নত শ্রেণী অধ্যুষিত কযেকটি গ্রামে 'পল্লী নিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি ও তাঁব বন্ধুবা মিলে সংগঠন কবেন এব় এই সমিতিব মধ্য দিযে তিনি বর্তমানে সমাজসেবাব কাজে সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৪৮ সালেব ১১ই মাচ বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ভূপেন্দ্রকিশোব বক্ষিত বাযেব সঙ্গে তাঁব বিবাহ হয।

জ্যোতিকণা দত্ত (বেরা)



জ্যোতিকণা দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লায় মামাবাড়ীতে। তাঁদের দেশ কুমিল্লা জেলার কালিকচ্ছে। তাঁর পিতা মোহিনীমোহন দত্ত ও মাতা চারুনলিনী দত্ত।

স্বাধীনচেতা নির্ভীক পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন জ্যোতিকণার পিতামহ। তিনি হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান ধর্মের সমন্বয় করবার জন্য আরবী, ফার্সী, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা শিখে গীতা, কোরান, বাইবেল অনুবাদ ক'রে জ্যোতিকণা প্রভৃতি নাতনী ও নাতিদের শোনাতেন। জ্যোতিকণার কাকা হচ্ছেন স্বনামধন্য বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত।

ছোটবেলা থেকেই জ্যোতিকণা লেখাপড়ায় ভালো ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রীজীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু তখনকার দিনের বিক্ষুব্ধ হাওয়া অনেক ভালো ছাত্রীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আকর্ষণ ক'রে নিত। বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে বন্ধু বনলতা দাশগুপ্ত যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন নাই।

জ্যোতিকণা দত্ত বিপ্লবীদলের সভ্য ছিলেন না, কিন্তু বৈপ্লবিক কাজের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁর মনে ছাপ ফেলেছে, এমন সময় একদিন বনলতা দাশগুপ্ত কয়েকটি পিস্তল এনে তাঁকে দিলেন লুকিয়ে রাখতে। দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডিং-এ তিনি থাকতেন। ঐ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন তিনি ও বনলতা ১৯৩৩ সালে।

হঠাৎ একদিন বোর্ডিং-এর কোনো ছাত্রীর টাকা চুরির জন্য তল্লাসী হয় বোর্ডিং-এর সমস্ত মেয়েদের বাক্স এবং বিছানা। টাকার জন্য তল্লাসী করতে গিয়ে জ্যোতিকণার জিনিসপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত পিস্তলগুলি ধরা পড়ে যায়। কলেজের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেন এবং জ্যোতিকণা গ্রেপ্তার হয়ে যান। অস্ত্র-আইনে তাঁর চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

জেলের মধ্যে যেসব বন্দিনী আপন স্বভাবমাধুর্যে সকলকে মুগ্ধ ক'রে

রেখেছিলেন, জ্যোতিকণা তাঁদের অন্যতম। এমন স্নিগ্ধ মধুর স্বভাব, এমন শিশুর মতো সরলতা, এমন আত্মবিশ্লেষণ ক'রে ক'রে নিজেকে বিচার করা এ যেন জ্যোতিকণার মতো মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

মুক্তির পব তিনি ডাক্তারী পাস করেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মতিরাম বেরা নামে একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয। বর্তমানে তিনি লণ্ডনে আছেন। সেখানেই তাঁব স্বামী স্থাযিভাবে বসবাস করছেন।

পারুল মুখার্জী

ও

উষা মুখার্জী

★



পারুল মুখার্জী

পারুল মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায় ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁর ছোট ভগ্নী উষা মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালে। তাঁদের পিতা গুরুপ্রসন্ন মুখার্জী, মাতা মনোরমা দেবী। অনুশীলন-দলের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অমূল্য মুখার্জী ছিলেন তাঁদের বড ভাই। পিতৃভূমি তাঁদের ঢাকা বিক্রমপুরের বাহেরক গ্রামে। কিন্তু মানুষ হন তাঁরা কুমিল্লায়।

দাদা অমূল্য মুখার্জীর গভীর প্রভাব ছিল এই পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের উপর। দুই ভগ্নী পারুল ও উষা ছোটবেলা থেকে দেখেছেন বাড়ীতে দাদার জন্য পুলিসের অত্যাচার ও হামলা এবং বিপ্লবী ভাইযের অনমনীয় দৃঢ মনোভাব। এই পারিপার্শ্বিকে মানুষ হবার ফলে একটু বড হয়েই তাঁরা দাদার অনুগামী হন।

১৯২৯ সালে কুমিল্লায় একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পারুল ১৪ বছর বয়সে এই সম্মেলনে মেযেদের নিয়ে কলিকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেন। উষা ছিলেন এই বাহিনীর একটি উৎসাহী কর্মী। ক্রমে পারুল ও উষা দুই ভগ্নীই 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করেন।

ছোট বোন উষা মুখার্জী ছিলেন যেমন ডানপিটে তেমনি বেপরোয়া। তাঁর সাহস ও সদাহাসি মুখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। লাঠি-ছোরা খেলতে, কুচকাওয়াজ করতে তিনি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৪ সালে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে হিজলী জেলে রাজবন্দীরূপে আট্‌কে রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

বড ভগ্নী পারুল মুখার্জী ১৯৩২ সালে কুমিল্লায় স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৩ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক ষডযন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুলিস তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে খোঁজ করতে থাকে। সেই সময়ে তিনি পলাতক হন। তিনি রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানে অনুশীলন-দলের সংগঠন গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছিলেন।

এই সময়ে টিটাগডের একটি পল্লীর মধ্যে বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কাজের এক বিরাট আয়োজন চলেছিল। তাঁদের এখানকার বাসাটিকে সন্দেহমুক্ত রাখবার জন্য পলাতক পারুল মুখার্জীকে খুলনা থেকে টিটাগডের বাসায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর উপস্থিতিতে বাসাটি সাধারণ গৃহস্থের বাসার রূপ ধারণ করে। সেখানে থেকে অনুশীলন-দলের বিপ্লবীরা বোমা বারুদ প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা করছিলেন। ডিনামাইট এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থাও চলেছিল।

১৯৩৫ সালের ২০শে জানুয়ারি ভোর চারটায় অসংখ্য পুলিস টিটাগডের বাসাটা ঘিরে ফেলে। টের পেয়েই বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও শ্যামবিনোদ পাল ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে একতলার ছাদ থেকে বাইরে লাফিয়ে পডলেন। লাফিয়ে পডার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন।

পারুল মুখার্জীও তাঁদের সঙ্গে ছাদে উঠেছিলেন। কিন্তু কি যেন মনে ক'রে তিনি উল্টোদিকে লাফ দিয়ে উঠোনে প'ড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। পুলিস দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে এক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পারুল মুখার্জী। তিনি কাগজপত্রগুলি নিশ্চিহ্ন করবার আশায় তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিস অর্ধদগ্ধ কাগজপত্রগুলি হস্তগত করে। সেই বাসাতে পুলিস পায় পিস্তল, বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা-তৈরীর ফরমুলা প্রভৃতি। পারুল মুখার্জী গ্রেপ্তার হলেন।

পারুল মুখার্জীকে পুলিস-হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে ইতর ভাষায় গালাগালি করেও যখন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি তখন গোয়েন্দা-অফিসার উৎপীড়নের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে পারুল মুখার্জীর দিকে ছুটে যায়। পারুল

চীৎকার ক'রে জুতো ছুঁড়তে থাকেন—কিন্তু রুখতে পারছিলেন না। এমন সময় চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আর-একটি গোয়েন্দা-অফিসার ছুটে এসে এই অফিসারকে ধমকাতে থাকেন—"আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছেন না—আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"—পশুটা নিরস্ত হ'ল।

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধোদ্যমের প্রচেষ্টার মামলা আলিপুর কোর্টে একটি ট্রাইবুনালের অধীনে আরম্ভ হয়। এর নাম ছিল 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে এই মামলার রায় বেরোয়। মোট ১৭ জনের সাজা হয়। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রফুল্ল সেনের চৌদ্দ বৎসর, শ্যামবিনোদ পালের দশ বৎসর এবং অন্যান্য অনেকেরই কঠিন শাস্তি হয়। পারুল মুখার্জীর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

তাঁকে নানা জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ত। ১৯৩৬ সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন তখনকার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জেলের নিয়ম হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের ওয়ার্ডের ভিতরে তালাবন্ধ হ'তে হবে। একদিন তিনি বিকালবেলা প্রেসিডেন্সি জেলের ক্ষুদ্র ফিমেল-ইয়ার্ডের চত্বরে পায়চারি করছিলেন। তখনো লক-আপ হবার প্রায় আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী ছিল। এমন সময় মেট্রন তার ডিউটি তাড়াতাড়ি সমাধা করতে গিয়ে পারুল মুখার্জীকে তখনই লক-আপ হ'তে বলে। পারুল মুখার্জী অসময়ে ওয়ার্ডে ঢুকতে অস্বীকার করাতে মেট্রন জোর ক'রে তাঁকে ওয়ার্ডে ঢোকাতে চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ পারুল মেট্রনকে করলেন এক চপোটাঘাত। মেট্রন মাটিতে পড়ে গেল। মেট্রনকে মারা? জেলের জমাদারনী ও লাল-কালো-বিল্লাধারী কয়েদীরা ছুটে এসে পারুল মুখার্জীকে ধ'রে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে উদ্যত হ'ল। গোলমাল শুনে অন্যান্য রাজবন্দী মেয়েরা তখনি এসে পড়লেন। তাঁকে আর মারা হ'ল না। মেট্রনের গায়ে আঘাত করার অপরাধে পারুল মুখার্জীর শাস্তি হ'ল জেল-কোড অনুসারে। বেপরোয়া পারুল এসব শাস্তি হেসেই উড়িয়ে দিতেন।

১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় পারুল মুখার্জী অন্যান্য মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মুক্তি পান।

সাবিত্রী দেবী



চট্টগ্রামে ধলঘাট নামক গ্রামে ৺নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আশ্রয় দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা বিপ্লবী সূর্য সেনকে অর্থাৎ মাস্টারদাকে। মাস্টারদার অনুগত কর্মী নির্মল সেন, অপূর্ব সেন এবং প্রীতিলতা ওযাদ্দাদার তখন সেখানেই আত্মগোপন ক'রে ছিলেন।

১৯৩২ সালের ১২ই জুন রাতে মিলিটারী এসে হঠাৎ সেই বাড়ী ঘিরে ফেলে। মিলিটারী ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে বেধেছিল তুমুল সংগ্রাম। বিপ্লবীদের গুলীতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন মিলিটারীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। সেই দারুণ গোলমালের মধ্যে মাস্টারদা প্রীতিলতাকে নিয়ে অন্তর্ধান হন।

বিপ্লবীবীর সূর্য সেন ও তাঁর অনুবর্তীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে সাবিত্রী দেবীর এবং তাঁর একমাত্র ছেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীব প্রতি চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে জেলে রেখে দেওয়া হয়।

নিযে গেল তাঁদের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট তখন কাটারিয়া—যেন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার একটা প্রতিমূর্তি। রামকৃষ্ণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'য়ে জেল-হাসপাতালে নামমাত্র চিকিৎসাধীন রইলেন। তাঁর শীর্ণ দুর্বল পা-দুখানিতে লোহার ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে দেওয়া আছে। লোহার ডাণ্ডা বহন করছেন যক্ষ্মারোগী শুয়ে-শুয়েও। রোগের অসহ্য যাতনা ও কাশির যন্ত্রণার সঙ্গে বেজে চলেছে পায়ের শৃঙ্খল। বোধকরি ইংরেজ শাসনের চরম বর্বরতার এক পৈশাচিক পরিচয় পেয়েছিল সেদিন মেদিনীপুর জেলের হাসপাতাল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কাটারিয়া ছিলেন ডাক্তারও। তিনি ডাক্তারি কতখানি করেছেন সে-পরিচয় জানি না, কিন্তু তাঁর নির্যাতনের এক চরম রূপ ছাপ রেখে গেছে হাসপাতালের যক্ষ্মারোগীর প্রতিটি নিশ্বাসে। ঐ জেলেরই ফিমেল-ইয়ার্ডে মা সাবিত্রী দেবী অসুস্থ পুত্রকে একবার দেখবার

জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বৃথাই মাথা কুটে মরেছেন, অনুমতি মেলেনি।

একদিন মেদিনীপুর জেলের সিপাইদল কোনো ছুতোয় বিপ্লবীদের একদলকে আক্রমণ করে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিপ্লবী অমূল্য সেন দু'চারজন সিপাইকে ধরাশায়ী করেন। তখন সিপাইদল তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁর মাথা ও হাত ভেঙে দেয়। সংকটাপন্ন ও অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে আনা হয় জেল-হাসপাতালে। বহুক্ষণ পরে যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তিনি দেখলেন তার পাশে স্নেহকাতর উদ্বেগাকুল দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন দুর্বল রুগ্ন রামকৃষ্ণ। ডাণ্ডাবেড়ির ভারে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। অতিক্ষীণ স্বরে মমতার সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা বাক্য ব'লে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে, পায়ের ডাণ্ডা অতিকষ্টে টেনে নিয়ে নিজের শয্যায় চলে গেলেন মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ। অমূল্য সেন বেঁচে উঠেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের দিন ঘনিয়ে এসেছিল। দীপ নিবে গেল কিন্তু ডাণ্ডাবেড়ি তাঁর দেহ থেকে অপসৃত হ'ল না। জীবিতকালে মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর হয়নি একই জেলে থাকা সত্ত্বেও। মৃত পুত্রকে দেখাবার জন্য বিধবা মা সাবিত্রী দেবীকে মেয়েদের 'ডিগ্রী' থেকে এবার নিয়ে আসা হ'ল। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত একমাত্র পুত্রের শবদেহে তখনো বাঁধা রয়েছে ইংরেজের প্রবল পরাক্রমের চিহ্ন ডাণ্ডাবেড়ি। বুঝি এমনসব দুর্লভ রত্নদের মনে ক'রেই কবি লিখেছিলেন—

"তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে
কেমন ক'রে সইব,
বাতাস আলো গেল মরে
একি রে দুর্দৈব!"

মুক্তি পাবার পরও সাবিত্রী দেবীকে পুলিস রেহাই দেয়নি। অনেক কষ্ট ও নির্যাতন তাঁকে প্রতি পদে সইতে হয়। মাস্টারদার প্রতি সাবিত্রী দেবীর অটুট শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর মনোবলের পাথেয়। তারই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি বাকীজীবনে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে। সমস্ত পীড়ন তিনি নীরবে সহ্য ক'রে গেছেন।

স্বাধীন ভারতের ভিত্তি যাঁরা একদিন আপন জীবন বলি দিয়ে গেঁথে গেছেন তাঁদের পশ্চাতে ছিলেন এইসব সাবিত্রী দেবী ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর

মতো কত নীরব ও সর্বংসহা সেবিকা ও সেবক। তাঁরাও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবেননি, দুঃখকে চিরজীবনের পাথেয় ক'রে নিযে শহীদদের এগিয়ে চলার রাস্তা তৈরী ক'রে চলেছিলেন।

জাতির জীবন-সমুদ্রের তলায় কত অমূল্য মণিমাণিক্য এমনি ক'রে ছড়িযে আছে, আমরা তার কতটুকু খবর রাখি!

ইন্দুমতী সিংহ



চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহের বড়ভগ্নী ইন্দুমতী সিংহ। তাঁদের পিতা গোলাপ সিংহ। এঁদের পূর্বপুরুষ রাজপুত ছিলেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী অধিনায়ক সূর্য সেনের বিপ্লবীদলের কর্মী ছিলেন ইন্দুমতী সিংহ। ভাই অনন্ত সিংহ যখন অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পর পলাতক হন এবং পরে গ্রেপ্তার হন, তখন আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলেন। পুলিসের পীড়নের তো কথাই ছিল না।

সেই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃত বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ইন্দুমতী সিংহ। মহিলা হয়েও এবং ইংরাজী না জানা সত্ত্বেও তিনি যে কর্মক্ষমতা দেখিয়েছিলেন তা বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কোথাও হিন্দীতে, কোথাও বাংলায় কথা ব'লে তিনি অদ্ভুত প্রেরণা এনে ফেলতেন দাতার হৃদয়ে। আবার অন্যদিকে পরপদলেহী গোলাম-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকেরা তাঁকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিতে অবধি রাখেনি। তারা তাঁর কথার জবাবও দেয়নি, অস্পৃশ্যের মতো দূর থেকে তাঁকে বর্জন করেছে। কিন্তু ইন্দুমতী সিংহ তাতে দমে যাবার পাত্রী ছিলেন না। সিংহের বাচ্চা, একাই ঝোপ-কাঁটা পার হয়ে চলে গেছেন। স্নান আহার ভুলে গিয়ে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে তিনি মামলার অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ, এমনকি ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু জায়গায় পরিভ্রমণ ক'রে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই দুঃসাহসী নারী, পুলিসের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতার লালবাজারে গিয়েও, পুলিসের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার ক'রে তাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তিনি যখন ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ কাজের জন্য কুমিল্লায় যান তখন ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তার আগের দিনই শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে ঐ কুমিল্লা শহরে গুলী ক'রে নিহত করেন।

ইন্দুমতী সিংহ ডেটিনিউ অর্থাৎ রাজবন্দী রূপে হিজলী জেলে থাকেন প্রায়

ছয় বৎসর। ঐ মামলার অর্থসংগ্রহের কঠিন দায়িত্ব কে নেবে এই চিন্তায় তিনি জেলের মধ্যে রাতে ঘুমাতে পারতেন না—সারারাত ছটফট ক'রে কাটাতেন। অন্যমনা থাকবার জন্য, কার্যান্তরে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তিনি জেলের মধ্যে লীলা নাগের কাছে পড়াশুনা করতে থাকেন—এবং ম্যাট্রিক পাস করেন।

ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় বের হ'ল। দেখা গেল অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছে। ফাঁসীর আদেশ এদের প্রতি যে হয়নি তাই ছিল যথেষ্ট সেদিন।

১৯৩৭ সালে ইন্দুমতী সিংহ জেল থেকে মুক্তি পান।



সুহাসিনী গাঙ্গুলী



সুহাসিনী গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনায। দেশ তাঁব ঢাকা জেলার বিক্রমপুবের মধ্যে বাঘিযা গ্রামে। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও মাতা সরলাসুন্দরী দেবী।

সুহাসিনী দেবী ১৯২৪ সালে ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে ইডেন কলেজেই আই.এ. পডতেন। পরে তিনি কলিকাতা চলে আসেন এবং ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুলে শিক্ষযিত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। তিনি যখনই যেখানে যেতেন তাঁর প্রাণ-মাতানো হাসি এবং উচ্ছল সজীবতা মানুষকে আকৃষ্ট করত। 'আলাপে-প্রলাপে-হাসি-উচ্ছ্বাসে' মানুষকে মাতিয়ে তোলা তাঁর স্বভাব।

১৯২৯ সালে 'ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে সাঁতার কাটা শেখানো হ'ত কলিকাতায শ্রীশ নন্দীর বাগানে। কল্যাণী দাস এবং কমলা দাশগুপ্ত সেখানে যেতেন দেখাশুনা করতে। কমলা দাশগুপ্ত ছিলেন যুগান্তর নামে বিপ্লবী দলেরও কর্মী। মেয়েদের বিপ্লবের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে সংঘবদ্ধ করা তাঁর একটা প্রধান কাজ ছিল। সুহাসিনী গাঙ্গুলীর মধ্যে যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য ছিল এবং একটা বেপরোয়া ভাব ছিল সেটা কমলা দাশগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে বিপ্লবীদলে আনবার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমে আলোচনা করেন। পরে দলের একজন নেতা রসিকলাল দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা ছিল ১৯২৯ সাল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘটে খণ্ডযুদ্ধ। সমস্ত চট্টগ্রামে বিপ্লবের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ে। এ দের মধ্যে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল একে একে চলে আসেন আশ্রয়ের জন্য বিপ্লবী-নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কাছে কলিকাতায়। কলিকাতায় এঁদের রাখা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। তাই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তখনকার ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরকে বেছে নেন আশ্রয়দানের স্থান হিসাবে। রসিকলাল দাসের উপর ভার ছিল ব্যবস্থা করবার। ১৯৩০ সালের মে মাসে রসিকলাল দাস সুহাসিনী দেবীকে চন্দননগর পাঠিয়ে দিলেন আশ্রয়দাত্রীরূপে। শশধর আচার্য নামে আরেকজন বিপ্লবীকে সেখানে পাঠানো হয় আশ্রয়দাতা হিসেবে। ব্যবস্থা এইভাবে করা হয় যেন লোকে জানে শশধরবাবু হচ্ছেন সুহাসিনী গাঙ্গুলীর স্বামী। এই দুঃসাহসিক পরিচয় ও কাজের জন্য যে মানসিক শক্তি, সংস্কারমুক্ত মন ও বেপরোয়া হবার প্রযোজনীয়তা ছিল তার প্রত্যেকটি গুণ সুহাসিনী গাঙ্গুলীর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। একদিকে তিনি দিনে চন্দননগরের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন, অন্যদিকে বাড়ীর অতগুলি লোকের জন্য রান্না ও অন্যান্য গৃহকর্ম অকাতরে ক'রে যেতেন।

হেমন্ত তরফদার নামে বছর কুড়ি বয়সের আরেকটি বিপ্লবী ছেলেকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল সুহাসিনী দেবীর ছোট ভাই পরিচয়ে। হেমন্ত তরফদার হচ্ছেন সেইজাতীয় মানুষ যাঁদের পার্থিব কোনো কিছুই যেন খুব কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে না। পৃথিবীর সুখদুঃখকে যেন তাঁরা কিছুটা দূর থেকে দেখতে পান। এমনকি দুঃখ যখন তাঁদের সামনে এসে একেবারে নগ্নমূর্তিতে চেপে ধরতে যায় তখনো নিজেকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরা দুঃখটাকে তেমনি ক'রে পড়ে নিতে চান যেমন ক'রে আমরা গল্পের বই পড়ি। এমন আপনভোলা দার্শনিক একটি ছোট ভাই পেয়ে সুহাসিনী দেবীর চন্দননগরের জীবন অনেখানি হালকা হয়ে এসেছিল।

কি ক'রে যেন পুলিস এই পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডার খবর পেয়ে যায়। ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোররাত্রি ২টার সময় পুলিস-কমিশনার স্যার

চার্লস্ টেগার্ট নিজে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলে চন্দননগরের সেই গোন্দলপাড়ার বাড়ীটা। বিপ্লবীরা টের পেয়েই রিভলবার নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলে যান বাড়ীর বাগানে। গভীর নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে পুলিসের অনুসন্ধানী আলোর মুখে অজস্র গুলী বিনিময় চলে উভয়পক্ষে। জীবন ঘোষাল গুলীবিদ্ধ হয়ে গাছ থেকে পুকুরের মধ্যে পড়ে যান। পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। অন্যরা মাটিতে শুয়ে প'ড়ে সংগ্রাম করতে করতে গ্রেপ্তার হন। অনন্ত সিং কয়েকদিন আগেই নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এরই কয়েকদিন আগে হেমন্ত তরফদার কোনো কাজের প্রয়োজনে কলিকাতায় এসে সেখানেই গ্রেপ্তার হন।

ওদিকে সুহাসিনী দেবী এবং তাঁর সাজানো স্বামী শশধর আচার্যকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দান করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করবার সময় স্বয়ং টেগার্ট তাঁকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। শশধর আচার্যকে এমন মেরেছিল যে তাঁর চোখ ও পায়ের যন্ত্রণা সারতে বহুদিন সময় লেগেছিল। তারপর শশধর আচার্য ও হেমন্ত তরফদার ডেটিনিউ হয়ে বন্দী ছিলেন ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। সুহাসিনীকে সেসময়ে মামলা থেকে মুক্তি দিলেও, পরে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে ডেটিনিউ ক'রে হিজলী জেলে আটকে রেখে দেয় প্রায় ছয় বছর। মুক্তি পান তিনি ১৯৩৮ সালে।

১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলনের সময় হেমন্ত তরফদার পলাতক অবস্থায় সুহাসিনী দেবীর বাড়ীতে থাকতে পারেন কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। সুহাসিনী দেবী অগাস্ট আন্দোলনের সমর্থক না হ'লেও স্নেহের অমর্যাদা করতে পারেননি। তিনি রাজী হলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর যে রাত্রে হেমন্ত তরফদার ওখান থেকে অন্য আশ্রয়ে চলে যান সেই রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস এসে সুহাসিনী দেবীর বাড়ী ঘিরে ফেলে। পলাতক হেমন্তকে পুলিস পায়নি কিন্তু সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী ক'রে রেখে দেয় প্রেসিডেন্সি জেলে প্রায় তিন বৎসর, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। হেমন্ত তরফদার সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ধানবাদের এক আশ্রমে এসে থেকে যান সন্ন্যাসীরূপে। ঐ সন্ন্যাসীর জীবনই হেমন্তর অন্তরের আসল রূপ।

মমতাময়ী সুহাসিনী পলাতক হেমন্তকে স্নেহবশতঃ আশ্রয় দিয়ে বন্দীজীবন যাপন করতেও কুণ্ঠিত হননি। সদাহাস্যময়ী সুহাসিনী ফুটে উঠেছেন দুঃসাহসী ও স্নেহময়ীরূপে।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম



১৯১৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুমিল্লায়। দেশও সেখানে। তাঁর পিতা রজনীকান্ত ব্রহ্ম এবং মাতা রঙ্গবাসী ব্রহ্ম।

ফৈজন্নেসা গার্লস হাইস্কুলে তিনি লেখাপড়া করতেন। তাঁর পিতা মোক্তার ছিলেন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'রে তিনি কোর্ট বর্জন করেন। এই আবহাওয়াতে মানুষ হবার ফলে তাঁদের বাড়ীটা স্বদেশীভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। প্রফুল্লনলিনী তাঁর পিতার নিকট থেকেই এপথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পান। ছেলেমানুষ মেয়ে প্রফুল্ল অতি অল্প বয়সেই বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কুমিল্লার যুগান্তর-দলের সঙ্গে তিনি ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন।

যখন তিনি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তখন সহপাঠী শান্তি ঘোসকে তিনি বিপ্লবীদলে আনেন। সুনীতি চৌধুরীকেও তিনিই প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান। কিশোরী এই তিন বন্ধু মিলে মহা উৎসাহে ছাত্রীসংঘ সংগঠন ক'রে মেয়েদের মধ্যে একটা কর্মের প্রেরণা এনে ফেলেন। তারপর গুরুতর কোনো বৈপ্লবিক কাজে আত্মোৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষায় প্রফুল্ল ব্রহ্ম ও শান্তি ঘোষ দলের নেতাদের বার বার তাগিদ দিতে থাকেন এবং তাঁরা দুজনে মিলে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু পরে দলের নেতারা মনে করলেন যে, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পুরাতন কর্মী হিসাবে প্রফুল্লনলিনীর তখন বাইরে থাকা একান্ত দরকার। সেজন্য তাঁকে সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়া হ'ল না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি গুলী করতে না গেলেও শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী যখন ১৪ই ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করলেন তখন পুলিস প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মকেও বাইরে থাকতে দিল না। পরদিনই ১৯৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ডেটিনিউ ক'রে রেখে দেয় কুমিল্লা জেলে। পরে নিয়ে যায় তাঁকে হিজলী বন্দীশালায়।

১৯৩৬ সালে প্রথমে তাঁকে কুমিল্লার কাকসার গ্রামে স্বগৃহে এবং পরে কুমিল্লা শহরে অন্তরীণ রাখে। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হয়।

কিন্তু স্থানীয় ডাক্তারগণ প্রথমে রোগ ধরতে পারেন নাই। অবশেষে প্রকৃত রোগ যখন ধরা পড়ে তখন আর অস্ত্রোপচার করবার সময় ছিল না। কলিকাতা নিয়ে যাবার জন্য তাঁর পিতার আকুল প্রচেষ্টা পুলিস ব্যর্থ করে দেয়। ফলে বিনা চিকিৎসায় অস্ফুট মুকুলটি অকালে ঝরে গেল। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৯৩৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শুধু যে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল তাই নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাদের আক্রোশ মেটে নাই। মৃত্যুর পর শ্মশানে যাঁরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন, পুলিস তাঁদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবধি রাখে নাই। এই ছিল পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিহত বীর সৈনিকদের শেষ পুরস্কার।

একেবারে পরপারে গিয়ে প্রফুল্লনলিনী চিরমুক্তি পেয়েছিলেন, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে মৃত্যু পর্যন্তও মুক্তি দিতে সাহস করে নাই।



প্রতিভা ভদ্র (রায়)



প্রতিভা ভদ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই কুমিল্লা শহরে। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলার শ্রীনিধি গ্রামে। কিন্তু মানুষ হয়েছিলেন তিনি কুমিল্লাতেই, কখনো দেশে যান নাই। তার পিতা অশ্বিনীকুমার ভদ্র, মা মৃণালিনী ভদ্র। ১৯৪০ সালে হরিকুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিভা ভদ্রের বিবাহ হয়।

প্রতিভা ভদ্র কুমিল্লা ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ১৯২৮।২৯ সালে এ বি এস এ ছাত্র-সমিতির মারফত কুমিল্লার অনুশীলন নামক বিপ্লবী-দলের কর্মীদের সঙ্গে প্রতিভা ভদ্রের যোগাযোগ ঘটে। তিনি ১৯২৯ সালের শেষভাগে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। তাঁর উপর দল সংগঠনের ভার ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে আছে দায়িত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা। তিনি ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সংঘ, লাঠি ছোরা খেলা শিক্ষার ও কুচকাওয়াজের কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠন করেন। মহিলাদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজে সহানুভূতি সৃষ্টি করা, ফেরারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া, অর্থ সংগ্রহ করা, অস্ত্রশস্ত্র ও গুপ্ত কাগজপত্র নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা, নিরাপদ ঠিকানায় খবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাঁর

উপর ছিল। তিনি কুমিল্লার নানাস্থানে, আগরতলা ও চাঁদপুরে গেছেন ঐ সংগঠনের কাজ করতে। সেসময়ে যতগুলি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল—যেমন ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন, ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন (এ.বি.এস.এ.), চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা সম্মেলন—প্রত্যেকটিতেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এসবেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে দৃঢ় এবং বিস্তৃত করা।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কুমিল্লায় সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল ও পিকেটিং প্রত্যেকটিতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সংগঠন নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায় জেলে যাবার ঝুঁকি সতর্কতার সঙ্গে তিনি এড়িয়ে গেছেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় তিনি প্রকাশ্য ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। কারণ, সেই সময়ের কাজ তাঁর পুরোপুরিভাবে বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৩২ সালে যখন তিনি কুমিল্লায় কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন তখন তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে হিজলী জেলে বন্দী রাখে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তারপর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন মূল কংগ্রেস থেকে সরে গিয়ে আলাদা-ভাবে কংগ্রেস পরিচালিত করেন তখন প্রতিভা ভদ্র সেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং সেই বি.পি.সি.সি.-র সভ্য থাকেন ও তারই মহিলা-সাব-কমিটির সহকারী সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

১৯৩৮ সালে বনলতা সেন প্রভৃতি ছাত্রী-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বনলতা সেন, কল্যাণী মুখার্জী, কিরণ চক্রবর্তী, কিরণ দুগড, নির্মলা রায়, সুষমা রায়, উমা চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে কাজে জড়িত হন। তাঁরা সকলে মিলে প্রতিভা ভদ্রের নেতৃত্বে ছাত্রী-কমিটি গঠন করেন। ছাত্রী-কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রী-সাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তারই মধ্য থেকে সংগ্রামী দল তৈরী করা।

এই ছাত্রী-সংগঠনের এক বিশিষ্ট অংশ ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করে। প্রতিভা ভদ্র ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে থাকেন ১৯৪৫ সালের অগাস্ট পর্যন্ত।

১৯৪৬ সালে দাঙ্গার পর তিনি ত্রিপুরা জেলায় দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে

রিলিফের কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রাদেশিক কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন।

বর্তমানে তিনি 'অঙ্গনা' নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদিকা।

জেলে থাকতেই তাঁর সাহিত্যিক মনের পরিচয় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত এবং বন্দীদের শুষ্কজীবনকে তা আনন্দের চকিত স্পর্শে সরস ক'রে দিত। 'অঙ্গনা'র মাধ্যমে এখন তাঁর সাহিত্যানুরাগ সার্থকতার পথ খুঁজে পাবে, তাঁর জেলের সতীর্থরা এই আশাই করেন।



শোভারাণী দত্ত



১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে শোভারাণী দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা শহরে। দেশ তাঁর খুলনায়। তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ দত্ত। ছোটবেলায়ই তার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর মাতা স্বনামধন্য ও একনিষ্ঠ দেশসেবিকা লাবণ্যপ্রভা দত্ত। লাবণ্যপ্রভা দত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী ছিলেন ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

মায়ের কাছেই শোভারাণীর দেশপ্রেমের প্রথম শিক্ষা। ছোটবয়স থেকেই তিনি যেমন তেজস্বী তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর একটি দুর্লভ বস্তু নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে হৃদয়ের প্রাচুর্য।

১৬।১৭ বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ট্রেনিং পাস করেন। তারপর বৃন্দাবন চলে যান বিপ্লবীবীর রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে' পড়াশুনা করতে। ওখান থেকে পাঞ্জাবের নানা স্থানে তিনি ভ্রমণ করতে থাকেন। এই সময় পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তিনি মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হন এবং বিপ্লবের দিকে তাঁর অন্তরের প্রেরণা জাগে।

১৯৩০ সালে বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে কলিকাতায়

শোভারাণীর পরিচয় হয় এবং তিনি দেশসেবার কাজে গভীরতরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। এই সালেই তিনি এবং তাঁর মা দেশসেবা ও জনসেবার আদর্শে প্রণোদিত হ'য়ে 'আনন্দমঠ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদিকাদের আহ্বানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শোভারাণী দত্ত আন্দোলন পরিচালনা ক'রে যান। নিজে চলে যেতেন তিনি পিকেটিং করতে ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে। তাছাড়া 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'তে যোগ দিয়ে সত্যাগ্রহ করবার জন্য তিনি ও তাঁর মা বহু কর্মী সংগ্রহ ক'রে দিতেন। পরে তাঁর মা লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন দক্ষতার সঙ্গে।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে যাবার পর অনেক বিপ্লবী পলাতক হয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁদের প্রথম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনেককে বেশীদিন একসঙ্গে রাখা নিরাপদ নয় ব'লে মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে অন্যত্র রাখা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। শোভারাণী এই দুইজনকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় দিলেন তাঁরই নির্বাচিত বাড়ীতে টালিগঞ্জের পুটুরিযাতে। সেটা ছিল তাঁর পরিচিত কর্মী লক্ষ্মীমণি দেবী ও সারদামণি দেবীর বাড়ী। শোভারাণীর নির্দেশ তাঁরা নতমস্তকে সানন্দে মেনে চলতেন। পরে জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে সেখান থেকে চন্দননগরে যেখানে চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবীরা ছিলেন সেখানে পাঠিযে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩০ সালের ২৫শে অগাস্ট ডালহাউসি স্কোয়ারে পুলিস-কমিশনার টেগার্টকে দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন বোমা ও রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করেন। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার একজন পলাতক আসামী ছিলেন মনোরঞ্জন রায়। ২৬শে অগাস্ট শোভারাণী দত্ত তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তাঁরই গাড়ীতে ক'রে তাঁকে পাঠিয়ে দেন পুটুরিয়ার সেই আশ্রয়ে। শোভারাণী দত্তের বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী ও তাঁর শাশুড়ী সারদামণি দেবী।

২৮শে অগাস্ট মনোরঞ্জন রায় পুটুরিয়ার সেই বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। ২৯শে অগাস্ট শোভারাণী দত্ত ও লক্ষ্মীমণি দেবী বেহালা থানায় যান যেখানে পুলিস মনোরঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে রেখেছিল।

সেখান থেকে ফিরবার পথে রাস্তায় ২৯শে অগাস্টই শোভারাণী দত্তকে পুলিস গ্রেপ্তার করে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবে। তাঁর গাড়ীও পুলিস আটকে রাখে। কিছুদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালে ৮ই মে দার্জিলিং-এ লেবং-এর মাঠে গভর্নর অ্যাণ্ডারসনের উপর বিপ্লবী আক্রমণ হবার পর উজ্জ্বলা মজুমদার চলে আসেন কলিকাতায় পলাতক অবস্থায়। আশ্রয় নেন তিনি শোভারাণী দত্তের বাড়ীতে। প্রায় তিনদিন সেখানে থাকার পর ১৮ই মে উজ্জ্বলা ও শোভারাণী দুজনে সেই বাড়ী থেকেই গ্রেপ্তার হন। লেবং কেস থেকে মুক্তি পেলেও শোভারাণীকে ডেটিনিউ হিসাবে জেলে বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া হয়। হাজতে থাকা অবস্থায় খবর পাওয়া যায় শোভারাণী পাগল হয়ে গেছেন। গভর্নমেণ্ট পাঠিয়ে দেয় তাঁকে রাঁচীর পাগলা-গারদে। প্রায় বছরখানেক সেখানে থাকার পর তিনি সুস্থ হন। তখন তাঁকে নিয়ে আসা হয় আবার প্রেসিডেন্সি জেলে। অবশেষে বছর দেড়েক আলমোড়ায় অন্তরীণ ক'রে রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৩৭ সালে।

শোভারাণীর মতো অমন একটা দরদী ও পরদুঃখকাতর প্রাণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক তাঁর তেজস্বিতা। নিজের তেজস্বিতায় যেন তিনি অন্যের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা চোখে না-পড়েই পারত না। তাঁর কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, গ্রীবাভঙ্গিমায় প্রকাশ পেত যেন সিংহিনীর বিক্রম। সব সময় রয়েছে মুখে একটি মধুর হাসি। সেই হাসির মধ্য দিয়ে সহজেই মানুষকে আপন ক'রে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর অতিথি-পরিচর্যার স্নেহকোমল স্পর্শ পাননি এমন লোক বোধ হয় শোভারাণীর পরিচিত কেউ ছিলেন না।

অকাতরে কত অর্থসাহায্য যে তিনি বিপ্লবীদের করেছেন তার হিসাব কেউ জানে না। সেজেগুজে ছদ্মবেশে গড়ের মাঠে গিয়েও তিনি বহু অর্থ দিয়ে এসেছেন পলাতক বিপ্লবীকে। তাঁর কাছে অর্থ এবং খাদ্য চেয়ে কেউ কোনোদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাননি। নিজের কাছে না থাকলে, নিজে ঋণ করবেন, তবু না দিয়ে থাকতে পারবেন না—এই ছিলেন শোভারাণী দত্ত।

তাঁর রুগ্নশয্যায় যেসকল স্বনামধন্য মানুষ এসে তাঁকে স্নেহ ও আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিপ্লবীবীর রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ।

দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণা ভোগের পর শোভারাণীর ক্লান্তদেহের মর্ত্যযাতনার অবসান হয় ১৯৫০ সালের ৯ই নভেম্বর।

বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)



১৯১৫ সালে ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের মধ্যে বিদগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা)। পিতৃভূমি তাঁব সেখানেই। তাঁর পিতা হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, মাতা নির্মলাসুন্দরী দাশগুপ্ত।

পিতা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এমনকি বেনামীতে কংগ্রেসকে অনেক সময় অর্থ-সাহায্যও করতেন।

বাড়ীর ভাই-ভগ্নীদের সকলকেই লেখাপড়া করতে দেখে, ছোটবেলা থেকে বনলতা লেখাপড়ায় মনোযোগী হন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি ভালো ছাত্রী হয়েছিলেন। নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট-বেলায় তিনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসায়ও তা আরোগ্য হয়নি। তাঁর ১১।১২ বছর বয়সের সময় নাইডু নামে একজন শরীরচর্চাবিদ তাঁকে হাঁপানির প্রতিষেধক হিসাবে ব্যায়ামের একটি বিশেষ প্রণালী শিখিয়ে দেন। পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও নাইডুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে ব্যায়াম করা বন্ধ করেন। কিন্তু বনলতা সে-অভ্যাসটি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর আর হাঁপানী রোগ ছিল না এবং ব্যায়ামের দ্বারা তিনি একটি সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গড়ে তুলেছিলেন।

নূতন কিছু করবার ও শিখবার দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। একটু বড় হবার পর তিনি সাইকেল ও মোটর চালাতে শিখেছিলেন। এমনকি এরোপ্লেন-চালনা শিক্ষাও আরম্ভ করেছিলেন।

তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পরিচয় ঘটে। তাঁরা একটি ছোট বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন। জীবন-বিস্তারের ও জীবন-বিকাশের সর্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায় ছিল দেশের পরাধীনতা। সেইজন্য যখন বিপ্লবের ডাক এসে ঐ গৃহের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌছাল, তাঁরা সাড়া দিয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হ'ল ঐ ডাকের জন্যই যেন তাঁরা অপেক্ষা ক'রে

ছিলেন। বিপ্লব দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ক'রে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করবে, এই কথা তাঁরা সহজ দৃঢ়তায় বিশ্বাস ক'রে নিলেন। বিপদকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ ক'রে জীবনযাপনে একটা তীব্র আনন্দ আছে। বিপদের পথে মানুষকে ডেকে নেওয়াও কম আনন্দের নয়। জীবনদানের প্রতিজ্ঞা নিয়েই প্রবলভাবে বাঁচবার পথ বাডীর ছেলেমেয়েরা বেছে নিলেন। এই জীবনের আদর্শ ও কর্ম তাঁর দিদি চারু দাশগুপ্ত ও শান্তি দাশগুপ্তের নিকট থেকে বনলতাও গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের শেষের দিকে দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর নানা কারণে দলটি ভেঙে যায়। গভীর চিন্তা ও আত্মসমালোচনার পর দলের কয়েকজন কর্মী সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণ করেন। মেয়েদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করবার পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বনলতা ছিলেন অন্যতম।

বনলতা ডায়োসেসান স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ছিলেন। স্কুলে থাকতে তিনি সপ্তাহে একদিন জর্জেট পরবার নিযম মানতেন না, এবং সকল ছাত্রীকেই বিলিতী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব থেকে একটি স্মার্ট বাঙালী মেয়ে চেয়েছিল। বনলতাকে উপযুক্ত মেয়ে মনে ক'রে কল্যাণী দাস তাঁকে এইখানে এরোপ্লেন-চালনা শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দেন।

এরপরে ১৯৩৩ সালে একটি ঘটনা ঘটে যায় যাতে বনলতা দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হন। এই সময় কয়েকটি পিস্তল রাখার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। সেগুলি তিনি ডায়োসেসান কলেজে তাঁর এক সহপাঠী ও বন্ধু জ্যোতিকণা দত্তর কাছে রেখে দেন। তাঁরা তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। জ্যোতিকণা বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন না—কিন্তু বৈপ্লবিক কাজে তাঁর সহানুভূতি ছিল ব'লেই পিস্তলগুলি রাখতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। জ্যোতিকণা দত্ত ডায়োসেসান কলেজের বোর্ডি-এ থাকতেন। হঠাৎ বোর্ডিং-এ টাকা চুরি যাবার ব্যাপারে সমস্ত মেয়েদের বাক্স ও বিছানা তল্লাসী করা হয়। তখন পিস্তলগুলি ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা পুলিসে খবর দেন।

পুলিস এসে জ্যোতিকণাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। বনলতাকেও পুলিস পরদিন গ্রেপ্তার করে। পুলিস বনলতা দাশগুপ্তের বাড়ী তল্লাসীর সময় তাঁর নামীয় মোটর-লাইসেন্স এবং এরোপ্লেন-চালনা-শিক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র হস্তগত

করে। গ্রেপ্তারের পর বহু চেষ্টা ক'রেও তাঁর কাছ থেকে পুলিস কোনো কথা আদায় করতে পারে নাই।

বে-আইনী পিস্তল রাখার অভিযোগে জ্যোতিকণার প্রতি আদালত কর্তৃক চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বনলতার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে তাঁকে মামলায় জড়াতে পারে নাই। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দী ক'রে ডেটিনিউ রূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটকে রেখে দেয় তাঁকে তিন বছরেরও অধিক।

কারাজীবনের অধ্যায়টি বনলতার জীবনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বাধা-নিষেধ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ঊর্ধ্বে তাঁর দুর্দম তারুণ্য সেদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজনৈতিক বন্দিনীদের সঙ্গে বহুমূল্য নিবিড় বন্ধুত্ব তাঁর কারাজীবনেই ঘটে।

শেষ পর্যন্ত কারাগারে বনলতা অসুস্থ হয়ে পড়েন টক্সিক গয়টার রোগে। রোগ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠল। পুলিস তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইল এই শর্তে যে, তিনি আর রাজনৈতিক কাজ করবেন না এমনি একটি মুচলেকা লিখে দেবেন। বনলতা সম্মত হলেন না। রাজবন্দীর মৃত্যুর দায়িত্ব নেওয়া গভর্নমেণ্টের পক্ষে অসুবিধাজনক। তাই বনলতাকে তাঁর দিদির বাড়ীতে কলিকাতায় অন্তরীণ করা হয় ১৯৩৬ সালে। তখন তাঁর শেষ অবস্থা।

অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে যখন সংশয়ের অন্ত নাই, অথচ না করলেও ভালো হবার সম্ভাবনা খুবই কম—তখন বনলতা অস্ত্রোপচারের সপক্ষে রায় দিলেন। বাঁচতে হ'লে ভালোভাবেই বাঁচবেন। মরণেই বা কি ভয় আছে!

মেডিকেল কলেজের প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ ওয়ার্ডে তিনি ভর্তি হন। ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন তাঁর গলায় অস্ত্রোপ্রচার করেন। অস্ত্রোপ্রচারের ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই ১৯৩৬ সালের ১লা জুলাই তাঁর জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর মাত্র।

মুক্তি-সংগ্রামের একটি নির্ভীক সৈনিক সেদিন জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন।



রেণু সেন (বসু)



১৯০৯ সালেব ২৮শে ডিসেম্বব বেণু সেন মুন্সিগঞ্জে তাঁব মামাবাডীতে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁব দাদু উমাচবণ সেন ছিলেন মুন্সিগঞ্জেব স্বনামধন্য উকিল। তাঁব পিতা বিনোদবিহাবী সেন এবং মাতা কুসুমকণা সেন। তাঁব পিতৃভূমি ঢাকাব বিক্রমপুবেব মধ্যে সোনাবং গ্রামে। বেণুব মা-বাবা মুন্সিগঞ্জের অন্য বাডীতে থাকতেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি আদবে লালিত-পালিত হন তাঁর মামাবাডীতেই।

দাদু উমাচবণ সেন নিজে ছিলেন বিদ্বান, শিক্ষিত ও প্রগতিশীল। তাঁব বিবাট পবিবারের সকলকে নিয়ে তিনি সন্ধ্যাবেলায় বসতেন সান্ধ্যবৈঠকে। বৈঠকে শুধু যে গান, বাজনা ও কাব্য-আলোচনা হ'ত তাই নয়, তিনি নিজে শোনাতেন তাঁদেব পৃথিবীব ইতিহাস, নানাদেশেব ও নানাজাতির উত্থান-পতনেব কাহিনী। উৎসুক শ্রোতারা কান খাডা ক'বে শুনতেন। নিজেদের দেশেব কলঙ্কিত ইতিহাস ও তাব দুঃখময় কাহিনী দাদু উমাচরণ সেন এমনভাবে বর্ণনা কবতেন যে, শ্রোতাদেব মনে দেশের অধঃপতনের জন্য একটা গভীর দুঃখবোধ জেগে উঠত। আবার দেশের অতীত-গৌবব-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের তেমনি বড হ'তে তিনি উৎসাহ দিতেন। ভূগোল শেখাতেন

তিনি ম্যাপ সামনে নিয়ে ব'সে খেলাচ্ছলে। শ্রোতা রেণু ঐসব কথা যেন নিঃশেষে গ্রহণ করতে চাইতেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন যত প্রশ্ন করত, দাদু সব উত্তর দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করতেন।

রেণু সেনের দিদিমার ছিল করুণার্দ্র হৃদয। তাঁর গোপন দানের অন্ত ছিল না। নাতনী রেণুর হাত দিয়ে তাঁর অনেক দান সবার অগোচরে নিঃশব্দে চলে যেতো।

এইভাবে দাদুর জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও দিদিমার সেবাস্পৃহা দুটোই রেণু সেনের মধ্যে দেশাত্মবোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৪।১৫ বছর বয়সে মুন্সিগঞ্জের স্কুলের পাঠ সমাধা ক'বে রেণু ঢাকা গিয়ে লীলা নাগের নতুন প্রতিষ্ঠিত দীপালী স্কুলে ভর্তি হন অষ্টম শ্রেণীতে। বি.এ. পাস করেন তিনি ১৯৩০ সালে এবং পরে জেলে গিয়ে এম.এ. পাস করেন।

দীপালী স্কুলে পড়তে পড়তে তিনি লীলা নাগের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় প্রভাবিত হন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

রেণু সেন যখন কলিকাতায় বি.এ. পড়তে আসেন তখন যাঁরা দেশের কাজ করতে চান সেরূপ কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল কম ছিল। ১৯৩০ সালে লীলা নাগের পরিকল্পনা অনুসারে 'দীপালী'র কর্মী ও ছাত্রীদের জন্য রেণু সেন কলিকাতায় 'ছাত্রীভবন' নামে একটি আবাসিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 'দীপালী ছাত্রীসংঘ'র একটি কেন্দ্রও তিনি কলিকাতায় স্থাপন করেন।

১৯৩০ সালে 'জয়শ্রী' পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় লীলা নাগের সম্পাদনায়। রেণু সেনের উদ্যম ও সংগঠন ক্ষমতা এই পত্রিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক প্রধান স্থান অধিকার করে।

১৯৩০ সালে ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলার সময় ১৬ই সেপ্টেম্বর রেণু সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। ১৬ দিন লালবাজার ও কয়েকদিন প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতে রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে বন্দী রাখে হিজলী প্রভৃতি নানা জেলে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মুন্সিগঞ্জে অন্তরীণ হন। সেই সময় অন্তরীণ বন্দীদের ভাতা অথবা উপার্জনের সুযোগের দাবী গভর্নমেন্টের নিকট রেণু সেন জানান। উত্তর না পেয়ে তিনি অন্তরীণ

আইন ভঙ্গ করেন। এই মামলায় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রেণু সেনের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

মুক্তির পর তিনি কলিকাতা থেকে 'জয়শ্রী' পত্রিকা (প্রায় দেড়বছর বন্ধ ছিল) প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে 'জয়শ্রী' কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ সালের ২৫শে জানুয়ারি খ্যাতনামা বিপ্লবী ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রেণু সেনের বিবাহ হয়।

১৯৪১ সালের ২রা জুলাই প্রাতে অকালমৃত্যু এসে রেণুর মতো একটি জীবন্ত কর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।



হেলেনা দত্ত



এক ভাদ্রমাসেব জন্মাষ্টমীব বাতে হেলেনা দত্ত জন্মগ্রহণ কবেন ঢাকা জেলাব কালীগঞ্জ গ্রামে। তাঁব পৈতৃক দেশও সেখানেই। তাঁব পিতা মুকুন্দলাল গুণ ও মাতা শৈলবালা গুণ।

১৯২২ সালে তাঁব পিতাব মৃত্যু হয। ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলেব বোর্ডিং-এ তিনি থাকতেন। ১৯২৮ সালে বিপ্লবীনেত্রী লীলা নাগের পবিচালিত 'দীপালী ছাত্রীসংঘ'ব তিনি সভ্য হন। তিনি খুব গোপনে লাঠি ও ছোবা খেলা শিখতে থাকেন এবং ঐ স্কুলে 'দীপালী ছাত্রীসংঘ' পবিচালনা করেন। সংঘেব মেযেদেবও তিনি লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন।

১৯৩০ সালে দীপালী-সংঘেব একটি বার্ষিক সম্মেলনে লীলা নাগেব সঙ্গে তাঁর পবিচয ঘটে। তাবপব তিনি 'শ্রীসংঘ' নামক বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। এই সময তাঁব কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'বে বোর্ডিং এর কর্তৃপক্ষ তাঁকে বার বাব সতর্ক করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদিন সমগ্র ঢাকা শহবব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয। সেদিন ইডেন হাইস্কুলের বোর্ডিং-এর

ছাত্রীদের স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা হেলেনা স্কুলে যোগদান করেন নাই।

১৯৩১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। হেলেনা ও তাঁর সঙ্গীদের প্রচেষ্টায় এই সময় বোর্ডিং-এ একটা জাগরণ ও চাঞ্চল্যের জোয়ার দেখা দেয়। নানাপ্রকার বিপ্লবাত্মক পুস্তক যোগাড় ক'রে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। রিভলভার প্রভৃতি বে-আইনী জিনিস তাঁরা লুকিয়ে রাখতেন।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লাতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী ক'রে নিহত করার পর জাতীয় চেতনার আর একটা প্রবল ঢেউ ঢাকা ইডেন বোর্ডিং-এর মেয়েদের মধ্যে এসে ধাক্কা দেয়। "রক্তে আমার লেগেছে আজিকে সর্বনাশের নেশা" প্রভৃতি পোস্টার এইসব কর্মিগণ স্কুল ও বোর্ডিং-এর দেওয়ালে লাগিয়ে দিতেন এবং কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতেন।

১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটা হরতালের দিনে বোর্ডিং-এর মেয়েদের যখন স্কুল ও কলেজে যেতে বাধ্য করা হয় তখন হেলেনা ও লীলা সেনকে কেউ নত করতে পারে নাই। তাঁরা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। তখন হেলেনা ও তাঁর বন্ধু লীলাকে বোর্ডিং থেকে ডি.পি.আই.-র আদেশ অনুযায়ী বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ভেরুলকার তাঁদের এত ভালবাসতেন এবং তাঁর এতখানি সহৃদয়তা ছিল যে, তিনি তাঁর ছাত্রী হেলেনা ও লীলাকে 'আনন্দ আশ্রম'-এ, অথবা সেখানেও জায়গা না হ'লে, তাঁর নিজের গৃহে থাকবার জন্য ব্যবস্থা করবেন কথা দেন। কিন্তু ছাত্রী দুজনের সে প্রয়োজন হয় নাই। এ কাজের জন্য হেলেনা বাড়ীর দিক থেকে বাধা পান নাই, বরং উৎসাহই পেয়েছেন।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে একবার তিনি কলিকাতা থেকে রিভলভার নিয়ে ঢাকা চলে যান। ঢাকাতে নিজেকে তিনি নিরাপদ মনে করেন নাই। তা ছাড়া পলাতক বিপ্লবী কর্মীরা কেউ কেউ এসে সেইসময় তাঁর মায়ের কাছে থাকতেন। এইসব নানা কারণে তিনি কলিকাতার বরানগরে তাঁর মামাবাড়ীতে চলে আসেন ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। তাঁর সঙ্গে তাঁর মামাবাড়ীর সকলকেই গ্রেপ্তার করে এবং বাড়ী পুলিসের হেপাজতে থাকে। তাঁকে ২৮ দিন

লালবাজার হাজতে রাখার পর, ডেটিনিউ ক'রে বন্দী রাখে হিজলী প্রভৃতি জেলে প্রায় পাঁচ বছর। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৯ সালে বিপ্লবীকর্মী সুকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঐ সালেই তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন।

পুনরায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করাতে তাঁকে অসুস্থতার কারণে প্রথমে মাস দুয়েক স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে, পরে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা বন্দীরূপে তাঁকে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। জেলের মধ্যেই তিনি আই.এ. এবং বি.এ. পাস করেন।

বর্তমানে তিনি পি.এস.পি.-র সঙ্গে যুক্ত আছেন।

লাবণ্য দাশগুপ্ত



বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে লাবণ্য দাশগুপ্তের জন্ম। তাঁর পিতা বসন্তকুমার মজুমদার ও মাতা শরৎকামিনী দেবী।

এই পরিবার বদান্যতার জন্য জনপ্রিয় ছিল। শিশু লাবণ্য জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছিলেন যে তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা ক'রে দুঃস্থ ছেলেরা রাত্রে শুয়ে থাকে, তাঁর বাবা তাদের খাওয়া ও পড়াশুনার সম্পূর্ণ খরচ বহন করেন। মা সারাদিন প্রায় রান্নাঘরে কাটাতেন, অবিরাম সেবায় কখনো মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠত না। তাদের কারও অসুখ করলে তিনি নিজে তো সাধ্যমতো সেবা করতেনই আবার সন্তানদের একটু বড় হলে বলতেন, "যাও, বসে বসে বাতাস কর।" এইভাবেই ছেলেমানুষ লাবণ্যকে ছেলেবেলা থেকে রোগীর পরিচর্যা করবার যে আন্তরিকতা মা শিক্ষা দেন তা তাঁর হৃদয়ে গভীর ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। বড় হয়ে তিনি কতরকম রোগীর যে সেবা করেছেন, কত কলেরা-রোগীর পাশে থেকে রাত ভোর করেছেন তার ঠিক নেই।

তাঁদের পাশের বাড়ীটা ছিল দেশগৌরব সতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। এঁদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অনেকখানি। সতীন সেনকে তিনি দেবতার মতো ভক্তি করতেন, তাঁর কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছিলেন তিনি।

"লাবণ্য দাশগুপ্তের পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বলধরা গ্রামে মামাবাড়ী চলে যান। তাঁর মাতামহের অবস্থা সচ্ছল ছিল। সেখানে পাড়ার কয়েকজনের সহায়তায় তিনি ঢাকার লীলা নাগের 'শ্রীসংঘ' নামক বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

তাঁর দাদু ছিলেন বড় কবিরাজ। তাঁর সাথে সাথে নাতনী লাবণ্যও যেতেন রোগীর বাড়ী। দাদুর ছিল দরদী প্রাণ। গরীব রোগীর পথ্য দাদুর বাড়ীতে তৈরী করতেন মামীমা এবং সেই পথ্য নিয়ে রোগীর বাড়ীতে গিয়ে খাইয়ে আসতেন কিশোরী লাবণ্য।

ষোলোবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় সুয়াপুরের এক ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে বীরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে ; বিবাহের দুইমাস পরেই তিনি বিধবা হন।

তিনি পুনবায় বলধরা ফিরে আসেন। নেত্রী লীলা নাগকে তিনি পড়াশুনা করবার ইচ্ছা জানালেন। লীলা নাগ তাঁর স্কুলে বড় মেয়েদের জন্য বিশেষ ক্লাস খুলে তাঁকে ভর্তি ক'রে নেন ১৯২৮ সালে। পড়াশুনা ও দেশের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দিনগুলি তখন আনন্দে কেটে যেতে লাগল। স্নেহপ্রবণ নেত্রী লীলা নাগের স্নেহ ও কর্ম-নির্দেশ তাঁর জীবনে নূতন প্রেরণা এনে দিল। জীবনে নূতন আনন্দের পথ খুলে গেল। লাবণ্য দাশগুপ্তকে সকলেই 'বড়দি' ব'লে ডাকত। আজও পাকিস্তানের সকল হিন্দু-মুসলমানের কাছে তিনি 'বড়দি'।

দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়ে তিনি ১৯৩৪ সালে দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে রাজবন্দী ক'রে প্রথমে দিনাজপুর জেলে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো হয়। এই সময় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। কিছুদিন গ্রামে অন্তরীণ থাকার পর সাড়ে চার বছর বাদে তিনি মুক্তি পান। তখন তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।

পুনরায় ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে ঢাকা, দিনাজপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার পর ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান।

দেশ-বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে যান। সেখানে ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনারের আফিসে 'ইণ্ডিয়ান ট্রানজিট হোম'-এর কাজ গ্রহণ করেন। দুঃখী মেয়েদের উদ্ধারের এবং সেবার কাজের মধ্য দিয়ে বালবিধবা লাবণ্য দাশগুপ্তের ব্যথাভরা জীবন সার্থকতা খুঁজে চলেছে। চিরদিনই দুঃখীর পাশে থেকে তাঁর সেবাপরায়ণ হৃদয় নীরবে পরিচর্যা ক'রে যাবে—এই হচ্ছে তাঁর কোমল হৃদয়ের প্রকৃত প্রকাশ।



পমীলা গুপ্ত

প্রমীলা গুপ্ত ও সুশীলা দাশগুপ্ত

★

প্রমীলা গুপ্তেব জন্ম হয় ১৯১২ সালে লাকসামে। তাব দেশ ঢাকা জেলাব বিক্রমপুবেব মধ্যপাড়া গ্রামে। তাঁব পিতা কুমুদিনী গুপ্ত ও মাতা কাদম্বিনী দেবী।

তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুল ও কলেজে পড়াশুনা কবেন এবং ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পাস কবেন। কলিকাতায এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে তৃতীয বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বাব সময তিনি গ্রেপ্তাব হন ১৯৩২ সালে।

সুশীলা দাশগুপ্তেব জন্ম হয ১৯১২ সালে। তাঁদেব দেশ বিক্রমপুবেব টঙ্গীবাড়ী গ্রামে। তাঁর পিতা হবকুমাব দাশগুপ্ত এবং মাতা নির্মলা দেবী।

তিনি মযমনসিংহ বিদ্যামযী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস কবেন ১৯২৯ সালে। তাবপব ঢাকা ইডেন কলেজে ও কলিকাতাব স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়েন তিনি প্রমীলা গুপ্তেব সঙ্গে। গ্রেপ্তাবও হন প্রমীলা গুপ্তেব সঙ্গেই। তাঁরা দুজনে মাসতুতো বোন।

ঢাকা ইডেন কলেজে পড়বার সময় ইংরেজের উৎপীড়ন ও অত্যাচার তাঁদের বিচলিত ক'বে তোলে। আরেকদিকে ছিল ইংবেজেব বিরুদ্ধে গান্ধীজীর

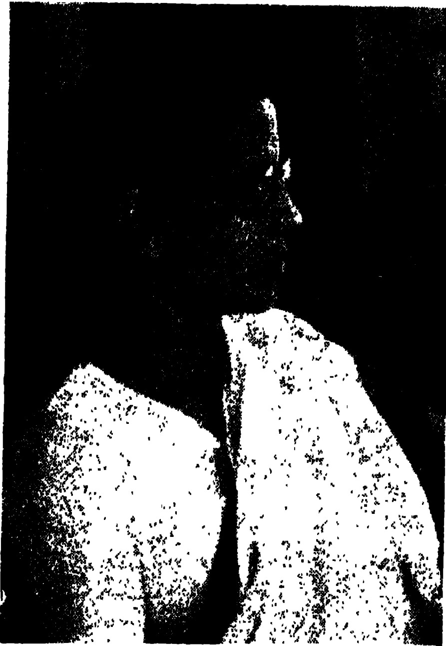
সংগ্রামের আহ্বান ও তার প্রভাব। ক্রমে তাঁরা 'শ্রীসংঘ' নামক বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হন।

তাঁরা অন্য কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা দিতেন, চাঁদা তুলে কংগ্রেসকে দিতেন। ইডেন হোস্টেলের মতো গভর্নমেণ্ট হোস্টেলের মধ্যেও পিস্তল লুকিয়ে রাখতেন এবং সেগুলি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

যাঁরা 'জয়শ্রী' পত্রিকা পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে সুশীলা দাশগুপ্ত ও প্রমীলা গুপ্ত ছিলেন অন্যতম।

১৯৩২ সালে সুশীলা দাশগুপ্ত ও প্রমীলা গুপ্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এ. পড়বার সময় গ্রেপ্তার হন। তাঁরা ডেটিনিউ রূপে বন্দী থাকেন প্রেসিডেন্সি, হিজলী প্রভৃতি জেলে। জেলের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা বি.এ. পাস করেন।

১৯৩৭ সালে তাঁরা মুক্তি পান।



ইন্দুসুধা ঘোষ



ইন্দুসুধা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহে। তাঁর দেশ ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনীতে। তাঁর পিতা সতীশচন্দ্র ঘোষ ও মাতা প্রিয়কুমারী দেবী।

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে আচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্রীরূপে ১৯২৬ সাল থেকে চার বছর কলাশিল্পে শিক্ষালাভ করেন।

১৯২৬ সালে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর-দলের কর্মীদের প্রভাবে এসে রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন। নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা, রিভলভার রাখা, এবং সংগঠন করার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। শান্তিনিকেতন তাঁর পক্ষে নিরাপদ স্থান ছিল।

১৯৩২ সালে ওয়াট্‌সন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক কর্মীদের তিনি চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়দান করেন। পরে পুলিস তাঁর সম্বন্ধেও এত তৎপর হয়ে ওঠে যে, অবশেষে ইন্দুসুধা ঘোষকেই পলাতক হয়ে জলপাইগুড়ির সামসিং নামে এক চা-বাগানে চলে যেতে হয়। পুলিস সেখান থেকে খুঁজে বার ক'রে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি

মামলা থেকে মুক্তি পান। তারপর তাঁকে ডেটিনিউ ক'রে প্রেসিডেন্সি ও হিজলী জেলে আটক রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

হিজলী জেলের কঠিন নীরস দিনগুলি যখন বন্দীদের কাছে দুর্বহ হয়ে উঠত তাঁরা ইন্দুসুধা ঘোষের ছোট্ট সেলটির কাছে গেলে যেন একটি শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর পরিবেশ লাভ করতেন। ছবি সকলে আঁকতে জানে না, বুঝতেও পারে না। কিন্তু ইন্দুসুধা ঘোষের ছবি আঁকবার ঘরখানিতে যে-কেউ যেতেন তাঁর মনটা যেন একটা রসসৃষ্টির ও নূতনত্বের স্বাদ পেত। যে শুষ্ক মন সেই ঘরে ঢুকেছিল সে-মনটা ফিরে আসবার সময় স্নিগ্ধ রসস্নাত হয়ে বেরিয়ে আসত। ইন্দুসুধা জেলে গিয়েছিলেন যেন অন্য বন্দীদের কঠিন জীবনযাত্রায় আনন্দস্পর্শ দান করতে। বন্দীরা ভাবতেন, আচার্য নন্দলালের ছাত্রীই যদি এমন তবে রসের উৎস সেই আচার্য না জানি কি।

শুধু ছবি আঁকা নয়। ইন্দুসুধা ঘোষের ছিল একটি ছোট্ট বাগান। তাঁর রজনীগন্ধার ঝাড় কঠিন লাল মাটিতে তেমন কিছু ঝোপে ঝাড়ে বেড়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু কারাগারে সেদিন দুটি রজনীগন্ধা এবং চারটি বেলফুল ফুটলেও মনে হ'ত স্বর্গের সুষমা যেন বাগানটিতে ছড়িয়ে আছে। তারি মাঝে বসে ইন্দুসুধা ছোট্ট একটি খুরপি হাতে নীরস কঠিন মাটি খুঁড়ছেন, বুঝি ওইখানে পাবেন তিনি অজানা রহস্যের সন্ধান। বন্দী ছাড়া ঐ দৃশ্যের মাধুর্য অন্যের বুঝবার সাধ্য নেই।

ইন্দুসুধা ঘোষের 'এপ্রিল ফুল' করবার কাহিনীটুকু না বললে তাঁর কথা অপূর্ণ থেকে যাবে। ময়দা আর রং দিয়ে প্রকাণ্ড এক সাপ বানিয়ে রেখে এলেন তিনি চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা ইন্দুমতী সিংহের খাটের তলায়। রাতে শুতে গিয়ে সেটা দেখে সকলে মিলে তারস্বরে চীৎকার—"সাপ! সাপ।" বাইরে থেকে ছুটে এল জমাদার, সিপাই। খাটের ডাণ্ডা দিয়ে সিপাইরা ছাতু-ছাতু ক'রে ফেলল সাপটা! ইন্দুসুধা ঘোষ হেসে গড়াগড়ি। জেলের মধ্যে রসের আধার ছিলেন তিনি।

আভা দে



১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলেছিল। বাংলার নারীশক্তি সেই স্রোতে তীব্র গতি এনে দিয়েছিল। যেসব দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনা সেসময়ে ইংরেজের আইন অবজ্ঞা ক'রে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, আভা দে তাঁদের মধ্যে একজন।

১৯৩০ সালে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান ক'রে আভা দে দণ্ডিত হন এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকেন। ইংরেজের জেলের মধ্যে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা ছিল অপরাধ। সেখানে থাকবে ইংরেজদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। কিন্তু আইন-অমান্যকারী বন্দিনীরা প্রেসিডেন্সি জেলে একদিন কেমন ক'রে যেন তৈরী ক'রে ফেলেন একটি ভারতীয় জাতীয় পতাকা। বেপেরোয়া আভা দে ফিমেল ইয়ার্ডের বিরাট অশ্বত্থগাছটার আগায় উঠে উড়িয়ে দিয়ে এলেন সেই জাতীয় পতাকা। বন্দিনীরা সমস্বরে উল্লাসে ধ্বনি ক'রে উঠলেন—'বন্দেমাতরম্', 'জাতীয় পতাকা কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'। কোথায় ছিল জেলের জমাদারনী, মেট্রন সব ছুটে এল। বাইরে থেকে ছুটে এল জেলার, জমাদার, সিপাই। টেনে ছিঁড়ে ফেললো তারা সেই জাতীয় পতাকা। জেলখানা তোলপাড়। অবিরাম জয়ধ্বনি চলেছে—'জাতীয় পতাকা কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'—কে কার তোয়াক্কা রাখে। শাস্তির পরোয়া করা আভা দে-র কর্ম ছিল না। আভা জেলের এই নিয়ম ভঙ্গ করার সাজা ও সম্পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পান ১৯৩০ সালের নভেম্বরের শেষে।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ২৬শে জানুয়ারি মনুমেণ্টের তলায় গিয়েছিলেন আভা দে স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে। সভা ভাঙবার জন্য জনতার উপর দিয়ে পুলিস ঘোড়-সোয়ার চালিয়ে দেয় তাঁদের নিষ্পিষ্ট ক'রে দিতে। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে মরিয়া হয়ে আভা যখন ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে প্রতিরোধ করছেন ঠিক সেই

সময় একটা ঘোড়ার পায়ের নীচে একটি মহিলা প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে তিনি ছুটে গিয়ে তাঁকে রক্ষা ক'রে বাইরে নিয়ে এলেন। সেদিনের বহু গ্রেপ্তারের মধ্যে আভা দে ছিলেন অন্যতম।

অদ্ভুত সাহস ও অটুট স্বাস্থ্য ছিল আভা দে-র। শুধু শরীর নয়, মনও ছিল তাঁর অপর্যাপ্ত উৎসাহ ও আনন্দে ঝলমল। অন্যায় সহ্য করার মেয়ে তিনি ছিলেন না। অথচ প্রাণ ঢেলে লোকের উপকার করতে ভালবাসতেন।

শরীরের শক্তি? টাগ্-অব্-ওয়ার জিততে, হাডুডু খেলতে, গাছে চড়তে, দৌড়ে পাল্লা দিতে, জেলখানা জমিয়ে গরম রাখতে আভা দে-র সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।

এবারে অনেকদিন ছিলেন তিনি বহরমপুর জেলে। একটা কাঁঠালগাছ ছিল সেখানে। একদিন আভা দে গাছে উঠে পেড়ে আনলেন মস্ত একটা কাঁঠাল। বন্দিনীরা হৈ হৈ ক'রে কাঁচা কাঁঠালটি রান্না ক'রে ভোজন সমাধা করলেন। হঠাৎ জেল-কর্তৃপক্ষ তেড়ে এল। গাছে চড়া এবং কাঁঠাল-পাড়া জেলে নিষিদ্ধ। কে এমন কাজ করেছে? আভা এগিয়ে এলেন সামনে। তাঁকে বলা হ'ল—"বলুন, এমন কাজ আপনি আর করবেন না। নইলে শাস্তি পেতে হবে।" আভা দে-র সোজা মাথাটা কিছুতেই নত হ'ল না। শাস্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে।

ঐ বহরমপুরে থাকতেই একদিন আভা দে দেখলেন, ঘরের ভিতর একটা কাঁকড়া-বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা-মাত্রই পায়ের চটি দিয়ে তাকে তিনি শেষ করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি মহিলা তাঁর পিঠে সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত বসিয়ে দিলেন বিছার উপর হিংসার অপরাধে। আরেকদিন ঐ মহিলাটিই ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা সাপ দেখতে পেয়ে কাতরভাবে চেঁচাতে লাগলেন— "আভা দেবী, শীগ্গীর আসুন, সাপ!" আভা দেবী একমুহূর্ত ভাবলেন, সাঁপ মারলে বুঝি হিংসা হয় না? কামড়াক্ সাপ আমাদের। পরমুহূর্তেই আভা দেবী ছুটলেন সাপ মারতে।

ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর এবার তিনি মুক্তি পান।

জেলে ছিলেন তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাস। বাইরে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। 'ছাত্রীসংঘ'র পক্ষ থেকে একবার সাইকেল-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দশজনের মধ্যে, কলিকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত। আভা দে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিপ্লবী কাজ করবাব সময বহু বে-আইনী জিনিস ও অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। সেগুলি লুকিযে বাখবাব বিরাট দাযিত্ব তিনি সগর্বে বহন কবেছেন।

কিন্তু সেই সময ভিতবে ভিতবে তিনি দাবিদ্র্যেব পীড়নে কতখানি পীড়িত ছিলেন সে-কথা কেউ জানত না। এমন অনেক দিন গেছে যখন তিনি শুধু দু'চাব পযসাব তেলেভাজা খাবাব খেযে দিন কাটিযেছেন। তাবই ফলে তিনি বেবিবেবি রোগে আক্রান্ত হন। লোহাব মতো স্বাস্থ্য তাঁব ভেঙে যায়। চেঞ্জে গেলেন দেওঘবে। সেখানেই এই বীব নাবীব জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে যায সকলেব অজ্ঞাতে, সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সালে।

স্বাধীনতা সংগ্রামেব প্রাণপ্রাচুযভবা একটি দুঃসাহসিক সৈনিকেব মৃত্যুতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেদিন কেউ সেখানে ছিল না।



শান্তিসুধা ঘোষ



ববিশাল শহবে ১৯০৭ সালেব ২৭শে জুন শান্তিসুধা ঘোষ জন্মগ্রহণ কবেন। পৈতৃক নিবাস ববিশালেব গাভা গ্রামে হ'লেও শান্তিসুধা বরিশাল শহবেই মানুষ হযে উঠেছিলেন। তাঁব পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও মাতা অন্নদাসুন্দবী দেবী। স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ছোটবেলা থেকে তিনি যেমনই মেধাবী ছাত্রী তেমনি ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন। ছাত্রীজীবনে উচ্চতম বৃত্তিব অধিকাবী হযে তিনি ম্যাট্রিক ও আইএ পাস করেন। অঙ্কে অনার্স নিযে তিনি ১৯২৮ সালে বিএ পবীক্ষায 'ঈশান স্কলাব' হযে পুরুষ ও নারী সমাজকে চমৎকৃত কবেন। সমস্ত ছাত্রছাত্রীব মধ্যে সর্বাধিক নম্বর তিনিই পেয়েছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশ্র-গণিত নিযে এম.এ. পডতে যান। ১৯৩০ সালে অসুস্থ শবীবেও পবীক্ষা দিযে তিনি প্রথম শ্রেণীব দ্বিতীয স্থান অধিকাব কবেন। বরিশাল বি. এম. কলেজে তিনি এবং আবো তিনটি ছাত্রী সহশিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন। পরে ঐ কলেজেই শান্তিসুধা ঘোষ অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন।

শান্তিসুধা ঘোষ ছাত্রীজীবনে রাজনীতির জটিল পথে নামেন নাই। ১৯১৯ সালে জালিযানওয়ালাবাগেব হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর রাজনৈতিক চেতনার

উদ্বোধন হয়। ধীরে ধীরে সেটি ক্রমবিকাশ লাভ করে। সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী তাঁকে প্রবুদ্ধ করে। এককথায় মনে হয়, অরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব ও পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় তাঁকে আকৃষ্ট করে।

এম.এ. পাস কবার পর যখন ববিশাল ফিরে যান তখন তিনি রাজনৈতিক কাজে যোগদান করেন। তাঁব ছোট ভাই রুণু ও বোন অপরাজিতা ঘোষেব মারফত স্থানীয় তরুণসংঘেব কর্মীদের তিনি কিছু কিছু সাহায্য করতে থাকেন। সেই সময় বরিশালে যুগান্তর-দলের শঙ্করমঠ, তরুণসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিপ্লবাত্মক কাজে ব্রতী ছিল। তাদের নীতিনিষ্ঠ আচরণ তাঁকে আকৃষ্ট করে।

তরুণসংঘে যোগদানেব ফলে শান্তিসুধা ঘোষ, রুণু ও অপবাজিতা একত্রে বিপ্লবীকর্মে সহযোগী হন। বন্দুক, বিভলভার প্রভৃতি নিষিদ্ধ জিনিস রাখাব দায়িত্ব নিলেন শান্তিসুধা ও অপবাজিতা ঘোষ।

১৯৩১ সালে শান্তিসুধা ঘোষ ববিশালের মেয়েদের নিয়ে 'শক্তিবাহিনী' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘের কর্মী ছিলেন লীলা চ্যাটার্জী, অনিলা চ্যাটার্জী, মুকুল সেন, নির্মলা ঘোষ, অপবাজিতা ঘোষ প্রভৃতি। এখানে লাঠি ছোরা খেলা, সাইকেল ও নৌ-চালনা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। নানাবিধ শবীবচর্চাব ব্যবস্থাও ছিল। কাজেই পুলিসের কড়া নজর এসে পড়তে দেরী হ'ল না। শাসানি, ধমকানি ও জুলুম চলে কর্মীদেব উপর এবং প্রতিষ্ঠাত্রীর উপব। ছেলে-কর্মীদের পুলিস গ্রেপ্তাব ক'রে আটক রাখতে থাকে।

পুলিসের কড়া দৃষ্টিকে একটু নরম করবার প্রচেষ্টায় তাঁবা নির্দোষ একটি 'হরিজন বিদ্যামন্দিব' প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন শক্তিসংঘের কাযকলাপ যথা-সম্ভব এই বিদ্যামন্দিরেব ঘবে বসেই পরিচালিত হ'ত।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সালেব মধ্যে অহিংসপন্থী ও বিপ্লবপন্থী সক্রিয় পুরুষ কর্মিগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে যান। সুতবাং মহিলা-কর্মীদের মধ্যে শান্তিসুধা ঘোষ প্রভৃতি যাঁরা তখন বাইবে ছিলেন তাঁদের উপরই অনেকখানি কাজের ভার এসে পড়ে। কর্মনির্দেশও তাঁরাই দিতেন। নতুন অনেক কর্মী এগিয়ে এলেন। এইভাবে শান্তিসুধা ঘোষেব কিছুদিন বরিশালে কেটে গেল।

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের অধ্যাপনার কাজ নিয়ে শান্তিসুধা ঘোষ কলিকাতা চলে আসেন। এখানে এসে কল্যাণী দাসের সঙ্গে তিনি কাজে যুক্ত হন। তখন দেশের সর্বত্র ব্যাপক গ্রেপ্তারের পর

যে মুষ্টিমেয় মহিলা-কর্মী পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের সকলকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পান কল্যাণী দাস ও শান্তিসুধা ঘোষ। একদিকে এই সংযোগের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে ছাত্রীসংঘের মারফত মহিলা-সংগঠনের কাজ তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত করেন। কল্যাণী দাসের সাহচর্যে শান্তিসুধা ঘোষ গোপনে দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন।

গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিস অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৩ সালের ১১ই নভেম্বর ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে শান্তিসুধা ঘোষকেও এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে মাসখানেক বাখে প্রেসিডেন্সি জেলে। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে জামীনে খালাস দিতে হয়। ১৯৩৪ সালের ২রা মে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে বরিশালে ও পুরীতে স্বগৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩৮ সালের মাচ মাসে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

সেসময় সেখানকার জনসাধারণের অনুরোধে তিনি বরিশাল মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের সময় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। 'ভারত ছাড' আন্দোলনের সময় ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও জেলে নিয়ে যায়।

কিছুদিন পরে অসুস্থতার দরুন তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। বছর-খানেক পরে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর চিকিৎসার্থে কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় তখন মন্বন্তরের বিভীষিকা চলছে। সে বীভৎস দৃশ্য তাঁর মনকে পীড়িত ক'রে তোলে।

তিনি 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সদস্য হয়ে বরিশাল ফিরে গিয়ে প্রথমে একটি সেবাকেন্দ্র গঠন করেন। সেখান থেকে চাউল, দুধ ও বস্ত্র বিতরণ করা হ'ত। পরে ওই সেবাকেন্দ্রকে 'মহিলা শিল্পভবন' নামে দুঃস্থ মহিলাদের একটি শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করা হয়। তার পরিচালিকা ছিলেন ইন্দুপ্রভা মজুমদার।

সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারী থাকায় শান্তিসুধা ঘোষ তখনো বি. এম. কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিতে পারেন নাই। ১৯৪৫ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর তিনি পুনরায় ঐ কলেজে প্রবেশ করেন।

১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়। শান্তিসুধা ঘোষের পিতামাতার পরলোকগমনের পর তিনি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণ একলা পড়ে যান। ১৯৫০ সালে নিরুপায় শান্তিসুধা মাতৃভূমি ও কর্মভূমি বরিশালকে দূরে রেখে বাধ্য হয়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।

সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ সুপরিচিত। তাঁর রচনা প্রকাশিত হয় 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা' ও অন্যান্য পত্রিকাতে। 'গোলকধাঁধা', '১৯৩০ সাল', 'নারী' প্রভৃতি পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেছেন নানা সময়ে।

শান্তিসুধা ঘোষ বর্তমানে হুগলি মহিলা-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর রুগ্ন শীর্ণ দেহের উপরে মস্তবড় একটা মাথার নীচে বড় বড় চোখদুটোই কথা বলে। মুখের ভাষা দিয়ে কথা বোঝাবার তাঁর বেশী দরকার হয় না। মুখের চাইতে চোখ যে কত বেশী ভাষা প্রকাশ করতে পারে তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শান্তিসুধা ঘোষ।



সুলতা মিত্র (কর)



সুলতা মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায় ১৯০৭ সালে। পৈতৃক দেশ তাদের চন্দননগর। তাঁর পিতা যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা সুহাসিনী দেবী।

সুলতা মিত্রের মা ছিলেন গোঁড়া ও রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে একটি উদারচেতা মহিলা। পরিবারের সকলে যখন তাঁর ছোট ছোট মেয়েদের বিবাহ দিতে প্ররোচনা দিয়েছেন তিনি তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছেন, স্বদেশের দুঃখদুর্দশা তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁদের হৃদয়ে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগাবার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। মামাবাড়ীতে মানুষ হন সুলতা মিত্ররা। মামারা এবং তাঁদের বিরাট পরিবার যখন দশ বছর বয়স হতেই সুলতা মিত্রের বিবাহ দেবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন তখন তাঁর মা এবং মায়ের এক কাকা জোর ক'রে মেয়েদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখান থেকেই সুলতা মিত্র শেষ পর্যন্ত বি.এ. পাস করেন। ১৯২৬ সালে আই.এসসি. পাস করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কুলেশচন্দ্র করের সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৩০ সালে ও ১৯৩২ সালে সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধীজী ও কংগ্রেসের

আইন অমান্য আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। তখনকার রাজনৈতিক কর্মী শোভারাণী দত্ত ও কল্যাণী দাস তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় সুলতা কর ১৯৩২ সালে অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূ হয়েও তিনি প্রকাশ্য রাজপথে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করেন, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করেন। এক নিষিদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগদান করাতে তাঁর ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে মুক্ত হযে তিনি তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাসের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের পথ বেছে নেন। যুগান্তর-দলের বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে কাজ করতে থাকেন।

তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা হ'ত দেশের মঙ্গলের জন্য চিরজীবন তিনি কারাবাস করবেন; স্বামী, সংসার ও পরিবার পরিজন সব ত্যাগ করবেন। এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পরিবারের সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের শয়নকক্ষে বিপ্লবীদের সভা করতে দিতেন, পলাতককে অর্থ সাহায্য করতেন, রিভলভার ও গোপনীয় কাগজপত্র নিজের ঘরে রাখতেন এবং অন্যত্র দিয়ে আসতেন।

পুলিসের সন্দেহ থেকে পলাতক দীনেশ মজুমদারকে রক্ষা করবার জন্য একদিন গভীর রাতে তিনি বধূবেশে গিয়ে নৌকায় ক'রে তাঁকে চন্দননগরের গোপন গৃহে পৌঁছে দিয়ে এলেন। পুলিশ টের পেল না।

গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের টাকা অপসারণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে পুলিস তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করে এবং সুলতা করকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়ে ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে চৌদ্দদিন রেখে দেয় ১৯৩৭ সালে।

'থানার নির্জন হাজতের মধ্যে তাঁকে বই পড়তে অথবা কারও সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হ'ত না। অন্ধকার, দুর্গন্ধে ভরা হাজত-ঘরে একা থাকা এবং কদর্য খাদ্য খাওয়া এই ছিল পুরস্কার। প্রত্যহ তাঁকে নিয়ে যেতো গোয়েন্দা-বিভাগের এস.বি. আফিসে। সেখানে জেরা চলত দিনের পর দিন। ভয় দেখাত, স্বীকারোক্তি না, করলে তাঁকে আজীবন কারাগারে কাটাতে হবে, স্বামীর চাকরী যাবে। স্বীকারোক্তি আদায় করা তবু পুলিসের সম্ভব হয়নি। তখন পাঠিয়ে দেয় তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে একমাস রাখার পর প্রমাণাভাবে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দেয়।

কিন্তু তারপর তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হয় পুরুলিয়াতে, সেখানে তাঁর দুই বছর কাটে।

দশ বছর বাদে তিনি এম.এ. পাস করেন এবং বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতে থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর একেবারে ভেঙে যায়। আজ দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ তিনি শয্যাগত। শুয়ে-শুয়ে তিনি কয়েকখানা শিশু-সাহিত্য রচনা ক'রে জনপ্রিয় লেখিকা হয়েছেন। 'ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন', 'এণ্ডারসনের গল্প', 'অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প,' 'বিদেশী শিশু নাটিকা', 'কাঠের পুতুল ক্ষুদিরাম', প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক পুস্তক তিনি শিশুদের জন্য লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

তাঁর কাছে গিয়ে বসলে প্রথমটা চমকে উঠতে হয়, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে। তিনি বালিশটা একটু উচু ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলেন শান্ত হাসিমুখে। অতি অল্পক্ষণই কথা বলতে পারেন, কিন্তু যতটুকু বলেন তাতে তাঁর আন্তরিকতায় শ্রোতার মনটা ভরে যায়, তৃপ্তি পায়।

সরোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ)



সরোজ আভা দাসচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন বরিশালে। পৈতৃক দেশ তাঁদের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের জামির্তা গ্রামে। তাঁর পিতা রোহিণীকুমার দাসচৌধুরী, মাতা প্রমোদাসুন্দরী দেবী।

১৯৩৭ সালে তিনি বরিশাল থেকে বি.এ. পাস করেন।

১৯২৯ সালে তিনি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির নীতিতে বরিশালে দীক্ষিত হন। তিনি স্থানীয় অনুশীলন দলের মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন তো করতেনই, তার প্রভাবে তার মা-ভাইরাও প্রভাবিত হন এবং সমস্ত পরিবারটাই বিপ্লবীদের একটি প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হয়। তাঁদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য লুক্কায়িত থাকত।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বে সংশ্লিষ্ট আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা সুযোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় সরোজ আভা দাসচৌধুরী ও তাঁর সহকর্মী মেয়েরা অর্থ দিয়ে এবং অলঙ্কার বিক্রি ক'রে বিপ্লবীদের জীবন-যাপনের ও বিপ্লব প্রচেষ্টার সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের আশ্রয়ের একটা গোপন কেন্দ্র ছিল সরোজ আভার গৃহ। এই নিশ্চিত আশ্রয় যদি উন্মুক্ত না থাকত তবে বিপ্লবীদের অনেকেরই সেই সময় বাইরে থেকে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হ'ত।

ক্রমে সরোজ আভা দাসচৌধুরী পুলিসের নজরে পড়ে যান। তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করা, তাঁকে বার বার থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হ'তে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সব সময় পুলিসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন।

অবশেষে ১৯৩৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ডেটিনিউ রূপে দিনাজপুর, দার্জিলিং, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জেলে বন্দী রাখে প্রায় দুই বছর। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩৮ সালে বিপ্লবী কর্মী ধীরেন্দ্রনাথ নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সরোজ আভা দাসচৌধুরী (নাগ)

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ও তিনি নিজের বাড়ীকে কর্মীদের আশ্রয়-কেন্দ্র করেন। কর্মীরা তাঁর আশ্রয়ে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি ও তাঁর স্বামী কলিকাতায় 'মহামানব শিক্ষাসদন' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সরোজ আভা নাগ অনেক বস্তী ও দরিদ্রের মধ্যে সমাজসেবার কাজ করতেন।

১৯৫১ সালের ১৯শে আগস্ট দুরারোগ্য জ্বরে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। একটি নিরভিমান ও নীরব কর্মী সেদিন অকালে বিদায় নিলেন। কত দরিদ্র পরিবার ও অসহায় নারী যে সেদিন অনাথ হয়ে গেলেন তা বলা যায় না।



ইলা সেন

★

১৯০৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ইলা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফেডারেটেড্ মালয় স্টেট্‌স্-এ। পৈতৃক দেশ তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যে সোনারং গ্রামে। তাঁর পিতা ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও মাতা সুরবালা সেন। পিতা ফেডারেটেড্ মালয় স্টেট্‌স্-এর ডাক্তার ছিলেন এবং সেখানেই তাঁরা বসবাস করতেন। পিতামাতা ছিলেন উদারমতাবলম্বী ও শিক্ষানুরাগী।

১৯৩৭ সালে গৌহাটির নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে ইলা সেনের বিবাহ হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সংবাদপত্রসেবী মাখনলাল সেন তাঁর পিতার খুড়তুতো ভাই।

শিশুকাল থেকেই ইলা সেনের শিক্ষা শুরু হয় মালয়ের রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট স্কুলে। অনার্স সহ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করেন তিনি ১৯২৩ সালে।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় এসে ডায়োসেসান কলেজ থেকে তিনি আই.এ. পাস করেন এবং ১৯২৭ সালে বেথুন কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের শোভাযাত্রায় তিনি যোগদান করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম.এ. এবং বি.টি. পাস করেন।

ইলা সেন ফেডারেটেড্ মালয় স্টেট্স্-এ রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট স্কুলে সম্পূর্ণ ইংরেজী আবহাওয়ায় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত ক'রে তারুণ্যে পরিণত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হয়েই লালিতপালিত হয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি কলেজে পড়তে ভারতবর্ষে চলে আসেন তখন ভারতে জাতীয় আন্দোলনের খরস্রোত তীব্রবেগে বয়ে চলেছিল। তীরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দূরে রেখে শুধু লক্ষ্য ক'রে যাবেন সে-মেয়ে ইলা ছিলেন না। আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে, নিজেকে বিপন্ন করেও, লাফিয়ে প'ড়ে তবে তিনি সার্থক বোধ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় বর্ধিত ইলা সেনের ভিতর থেকে ফুটে উঠেছিল স্বদেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী ও অসামান্য এক ভারতীয় নারী।

১৯২৯ সালে তিনি কল্যাণী দাসের ছাত্রীসংঘের সভ্য হন এবং তখন থেকেই তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতা দিবস পালন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাজনৈতিক সভা ও শোভাযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে তিনি 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র পক্ষ থেকে বড়বাজারে বিলিতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে যেতেন এবং অর্ডিনান্সের বিরোধিতা ক'রে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন।

এইসময়কার একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় সভা ও শোভাযাত্রা বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ২২শে জুন দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধতিথি বার্ষিকীতে সত্যাগ্রহীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে মেয়েদের শোভাযাত্রা দেশবন্ধু পার্কের দিকে অগ্রসর হয়। পুরুষ সত্যাগ্রহীরা দু'চারজন ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে আগেই গিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের নিকট অবস্থান করেন। নারী সত্যাগ্রহীদের পিছনে অশ্বারোহী পুলিস ও পদাতিক পুলিস অগ্রসর হ'তে থাকে। ইলা সেন অশ্বারোহী পুলিসের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের উপর আক্রমণ যথাসাধ্য রোধ করবার ইচ্ছা নিয়ে সতর্কভাবে চলতে থাকেন। শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) অতিক্রম করবার পর পুরুষ-সত্যাগ্রহীরা মহিলাদের সম্মুখভাগে শোভাযাত্রা গঠন করেন। পুলিস-অফিসার পুরুষ-সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চার্জ করতে পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিসকে হুকুম দেয়। পাঠান-অশ্বারোহী-পুলিস নারী-সত্যাগ্রহীদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, ইলা সেন সেই

ঘোড়ার লাগাম ধ'রে প্রতিরোধ করলেন এবং অগ্রসর হ'তে বাধা দিলেন। এইভাবে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটায় যখনই কোনো অশ্বারোহী পুলিস তাঁর সামনে দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল তখনই তিনি বাধা দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকেন। অন্যান্য অনেক মহিলাও অনুরূপভাবে বাধা দিতে থাকেন। শোভাযাত্রা দেশবন্ধু পার্কে পৌছাবার পর সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পুলিস লাঠিচার্জ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এক এক স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। যে ইওরোপীয়ান অশ্বারোহী অফিসারটি লাঠিচার্জের হুকুম দেবার জন্য অগ্রসর হ'তে থাকে ইলা সেন তাকে বাধা দেবার জন্য দৃঢ়মুষ্টিতে তার ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফেলেন। ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু তবুও ইলা সেনের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হয়নি। ঘোড়া লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘোড়ার লাগাম ধরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে থাকেন। এবং ঘোড়া নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নেমে আসেন। এইভাবে কিছুক্ষণ ঘোড়ার সঙ্গে ইলা সেনের ওঠানামা চলতে থাকে। তাঁর এই দুঃসাহসিক কাণ্ড দেখে পুলিস ও সত্যাগ্রহী উভয়পক্ষই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান। একটি ক্ষীণাঙ্গী নারীর অভূতপূর্ব সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তা সেদিন অনেক সত্যাগ্রহীর মাথা বাঁচিয়েছিল।

ওদিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সৈন্যদের যোগদান করতে আবেদন জানিয়ে ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা ইস্তাহার প্রচার করছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু হয়। ইলা সেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য কোর্ট ইলা সেনকে আহ্বান করে। কিন্তু তিনি কোর্টে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজের আইন আদালত তিনি মানেন না। এই আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। এই পরোয়ানা জারী করার পূর্বেই তাঁকে পিকেটিং-এর দায়ে গ্রেপ্তার ক'রে চারমাসের সাজা দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে জেলে সতীন সেন প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিস-কমিশনার টেগার্টের প্রহারের প্রতিবাদে তিনি জেলে অনশন অবলম্বন করেন।

অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স্ কনফারেন্সে যোগদান ক'রে ১৯৪৫ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা শাখার ভার গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪৮ সালে দিল্লী যাওয়া পর্যন্ত ঐ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে কলিকাতা দাঙ্গার সময় দাঙ্গাপীড়িতদের উদ্ধার ও সাহায্যকার্যে তিনি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। অদ্যাবধি তিনি নানা সেবা ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে চলেছেন।



প্রভা চট্টোপাধ্যায়



প্রভা দেবীর জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে (বাংলা ১৩০৬ সালে) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক গ্রামে। তার পিতা দুর্গামোহন চক্রবর্তী ও মাতা সরোজিনী দেবী।

তাঁর বিবাহ হয় দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীর প্রেরণায় প্রভা দেবীর মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। পরাধীন দেশের মুক্তিই তার জীবনের সাধনা হয়ে ওঠে।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কিছুদিন পর তিনি বালুরঘাটের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করতেন মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ রাজলক্ষ্মী গুহও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সফর করতেন।

১৯২০ সালে (বাংলা ১৩২৭ সালে), সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রমোদাসুন্দরী দেবীর নেতৃত্বে 'বালুরঘাট মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহিলা-সমিতির ইতিহাসই প্রধানতঃ বালুরঘাট মহিলা-কর্মীদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইতিহাস।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ৬ই এপ্রিল সমিতির সভানেত্রী প্রমোদাসুন্দরী দেবী কংগ্রেস-প্রাঙ্গণের এক বিরাট সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রায় একহাজার মহিলা সেদিনের সভায় পাঠ করেন স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য।

১১ই এপ্রিল মহিলাদের এক বিশাল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে সমবেত হয় কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে। এই সভায় প্রভা দেবী জ্বলন্ত ভাষায় লবণ-আইন আন্দোলনে যোগদান করতে প্রতিটি মহিলাকে আহ্বান করেন।

১২ই এপ্রিল আটজন মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা মদের দোকানের সামনে পিকেটিং ও অবস্থান-সত্যাগ্রহ করেন। এরপর প্রতিদিনই আটজন মহিলা-সত্যাগ্রহী মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতেন।

১৩ই এপ্রিল বালুরঘাট কংগ্রেস লবণ আইন ভঙ্গ করবার প্রস্তাব করে। সেদিন বিকালে কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভায় সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী প্রভা দেবীকে প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করতে আহ্বান করেন। প্রভা দেবীর অনুবর্তী হয়ে সভার প্রায় পাঁচশত মহিলা সেদিন লবণ আইন ভঙ্গ করেন। এই সভা মহকুমা ব্যাপী মহিলাদের মনে বিপুল উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। এরপরই বালুরঘাটে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়।

মহিলা কর্মীদের সহযোগিতায় বালুরঘাটে মদ-গাঁজার দোকানে, আদালতে ও স্কুলে পিকেটিং সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রথম সত্যাগ্রহীদলের নেত্রী প্রভা দেবী ও সমিতির সম্পাদিকা বেলা দেবী গ্রেপ্তার হন। দুজনেরই ১৩ মাসের কারাদণ্ড হয়। তাঁদের পরে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ক'রে অন্যান্য মহিলাগণও কারাবরণ করেন।

বালুরঘাট মহিলা-সমিতির কর্মিগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করেন। সেই সময়ে মহকুমা শাসক (S.D.O.) তাঁদের সমিতির অফিসের যাবতীয় জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। বেলা দেবী ও প্রভা দেবীর নেতৃত্বে সমিতির উৎসাহী কর্মিগণ শোভাযাত্রা ক'রে কংগ্রেস-প্রাঙ্গণের ভিতরে তাঁদের সমিতির অফিস দখল করতে যান। তাঁরা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তাঁরা কারাদণ্ডিত হন। এই সম্পর্কে কারাবরণ করেন বিমলাসুন্দরী সেন, মাতঙ্গিনী দাশগুপ্তা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতিও।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগ সংগঠিত হবার পর 'বালুরঘাট মহিলা সমিতি' তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রভা চট্টোপাধ্যায়

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বছর এই মহিলা-সমিতি, প্রাথমিক অবস্থায় অতি অল্প অর্থ সম্বল ক'রে, ক্রমে হাসপাতালে প্রসূতি-সদনের ব্যবস্থা, অবৈতনিক পাঠশালা, শিল্প-প্রদর্শনী ইত্যাদি নানা জনসেবার কাজ ক'রে চলেছিল।

১৯৪২ সালে ভাবতব্যাপী গণ-আন্দোলনেব আগুন জ্বলে উঠেছিল বালুর-ঘাটেও। শহবেব প্রায অধিকাংশ যুবককে গ্রেপ্তাব কবা হযেছিল। এই আন্দোলনেও মহিলা কর্মীবা অংশগ্রহণ কবেছিলেন কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তাব কবা হয নাই।

তাবপব থেকে ১৯৪৭ সাল পযন্ত তাঁবা কংগ্রেসেব আদর্শ অনুযাযী গঠন-মূলক কাজ ক'বে চলেছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশেব অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ক'বে, এল বহুপ্রার্থিত স্বাধীনতা। সীমান্ত শহব বালুবঘাটেব নানা দুযোগ ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও একালেব কর্মীদেব নিযে আজও প্রভা দেবী বালুবঘাট মহকুমাব সর্বত্র সমাজসেবা ও মানবকল্যাণেব কাজ ক'বে চলেছেন।



চারুপ্রভা সেনগুপ্ত



১৮৯৭ সালেব ২৯শে মাচ মযমনসিংহেব কাঠালিযা গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন চাকপ্রভা সেনগুপ্ত। পিত্রালয বংশী গ্রামে। তাঁব পিতা মহেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও মাতা কুসুমকুমাবী দেবী। আইনজীবী ও সাহিত্যিক ডঃ নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গান্ধীভক্ত ও খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা খ্যাত-নামা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাব ভগ্নীপতি। তাব ভগ্নী হেমপ্রভা দাশগুপ্ত অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কবেন এবং গান্ধীজীব অনুগামী হযে দেশসেবায নিজেকে উৎসর্গ কবেন।

চারুপ্রভা সেনগুপ্তেব বিবাহ হযেছিল ফবিদপুর জেলার লক্ষ্মণদিযা গ্রামেব ভাবতবন্ধু সেনগুপ্তের সঙ্গে। তখন চাকপ্রভা সেন নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

তাঁব শ্বশুববাড়ী ছিল একটি শিক্ষিত পবিবার। তাঁবা স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য 'অন্তঃপুব শিক্ষা সমিতি' গঠন কবেছিলেন। এই শিক্ষাব আবহাওয়াতে বড হযেছিলেন ব'লে চাকপ্রভা সেনগুপ্ত নিজেকে সাহিত্যের দিক থেকে ফুটিয়ে তুলতে পেবেছিলেন। তিনি 'প্রিযপূজা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। নানা পত্রিকায লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেন।

তাঁর পিত্রালয়ের শিক্ষা ছিল স্বদেশীভাবাপন্ন। শ্বশুরালয়ও তাই। সহজেই তাঁব হৃদয়ের গতি এদিকে গ'ড়ে উঠবাব সুযোগ পেয়েছিল।

১৯২৫ সালে তিনি সুতা কাটতে এবং খদ্দব পবতে শুরু কবেন। বাত্রে বাড়ী বাড়ী গিযে তিনি খদ্দর বিক্রি কবতেন। স্বামী ছিলেন ফবিদপুবেব বাজবাড়ীব উকিল। সেখানেই ছিল তাঁব কর্মক্ষেত্র।

১৯২৯ সালেব এপ্রিল মাসে তাঁব স্বামীব মৃত্যু তাঁব জীবনে বিপুল পবিবর্তন এনে দেয।

১৯৩০ সালে তাঁব ম্যাট্রিক পবীক্ষা ও গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান একই সময যোগাযোগ হয। গান্ধীজীব আহ্বান তাকে এতখানি বিচলিত কবে যে, কলেজে না গিযে তিনি পুবোপুবিভাবে বাজনীতিক্ষেত্রে নেমে পড়েন।

বাজবাড়ী শহবে সেসমযে মেযেবা বাইবে বেবিযে এসে আন্দোলনে যোগ দিতে বাধা পেতেন। সেখানকাব প্রথম লবণ সত্যাগ্রহী দলকে আশীর্বাদ কববাব ভাব পড়ে তাঁর উপব। আশীর্বাদ অনুষ্ঠানেব স্থলে তাঁব সঙ্গে যাবাব জন্য তিনি একটি মেযেকেও স গ্রহ কবতে পাবেননি। অবশেষে একাই তিনি অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'বে এলেন। এইভাবে তাঁব ঘবেব গণ্ডী ভাঙলো।

পিকেটিং, বে আইনী সভা ও শোভাযাত্রায যোগদান প্রভৃতি কাজ তিনি ক'বে যেতে থাকেন। বাজবাড়ীব অনেক মেযে এবং বৌ ঘবেব বাধা ভেঙে তখন সাহস ক'বে বেবিযে এলেন। ১৯৩০ সালেব জুলাই মাসে তাকে বাজ-দ্রোহমূলক বক্তৃতা কবাব অভিযোগে গ্রেপ্তাব ও জবিমানা কবা হয।

১৯৩২ সালেব আন্দোলনে আইন অমান্য কবাব অভিযোগে তাকে পুনবায গ্রেপ্তাব ক'বে ১৬ মাসেব সশ্রম কারাদণ্ড দেওযা হয়।

১৯৩৩ সালে বেবিযে এসে তিনি হবিজন-বিদ্যালযেব কাজে ও চরকা খদ্দব ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে আত্মনিযোগ কবেন। ১৯৩৫ সালে তাব ছেলেদেব টিটাগড ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তাব কবে এবং ঘন ঘন তাঁব বাড়ী তল্লাসী কবে। অথচ তাঁদেব বাড়ীব সঙ্গে বিপ্লবীদেব কাযকলাপেব কোনো সম্বন্ধই ছিল না।

তারপব তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তিনি কলিকাতা চলে আসেন ১৯৩৬ সালে। ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে যোগদান কবাতে তিনি এবং তাঁব প্রায সব ছেলেমেয়েরাই গ্রেপ্তার হন। তিনি নিবাপত্তা বন্দীরূপে প্রায ১০ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন।

১৯৪৩ সালে মুক্তি পাবার পর তিনি ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য কাজ করতে থাকেন। রাজবাড়ীতে দুঃস্থ শিশুদের জন্য এ আই ডব্লু সি-র সাহায্যে তিনি একটি শিশুসদন খোলেন। পরে এই শিশুসদন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়—নাম তার 'কস্তুরবা বিদ্যামন্দির'।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গার পর গান্ধীজী নোয়াখালি যাবার পথে তাঁকে সেখানে যেতে আহ্বান করা সত্ত্বেও তিনি নোয়াখালি যান নাই। রাজবাড়ীতে তখন দাঙ্গার পূর্বাবস্থা। তাই তিনি সেখানে থেকেই শান্তি-কমিটি গঠন ক'রে দাঙ্গার সম্ভাবনাকে রোধ করতে সমর্থ হন।

বঙ্গ বিভাগ হয়ে যাবার পরও তাঁর রাজবাড়ীতে যাতায়াত ছিল। কিন্তু পাসপোর্ট প্রথা চালু হবার পর মনে কেমন একটা ধাক্কা খেয়ে তাঁর সারা-জীবনের কর্মক্ষেত্রে তিনি আর যেতে পারেন নাই।

১৯৭৭ সালের পর থেকে অদ্যাবধি তিনি নানা গঠনমূলক কাজে ও কংগ্রেসের কাজে লিপ্ত আছেন।



সরযূবালা সেন

(ভোলা শহরের)



বাংলা ১৩০০ সালের ২২শে ফাল্গুন সরযূবালা সেন জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা-বিক্রমপুরের পূর্ব সিমুলিয়া গ্রামের চন্দ্রকান্ত গুপ্ত তাঁর পিতা এবং মৃন্ময়ী গুপ্তা তাঁর মাতা।

বাংলা ১৩১২ সালে বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের চুনিলাল সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কর্ম উপলক্ষ্যে এই পরিবার বরিশাল জেলার ভোলা শহরে বসবাস করতে থাকেন। পরে ভোলাই হয় তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে চুনিলাল সেন যোগদান করেন। আন্দোলনে যোগদানের ফলে সরযূবালা সেনের শ্বশুর কালীকুমার সেনের সরকারী কাজের কনট্রাক্ট বন্ধ হয়ে যায়। অতিকষ্টে সংসার চলতে থাকে। পরে চুনিলালবাবু ভোলাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন, তাতে কিছুটা সচ্ছলতা আসে।

১৯১৮ সাল থেকে বহুদিন অবধি সরযূবালা সেন মহকুমা সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন। সেবার কাজেই তিনি অধিক আনন্দ পেতেন। তাঁর সেবায় জাতি-ধর্মের প্রশ্নই ছিল না। তাই ভোলার হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধাই তিনি আকর্ষণ করেছেন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অংশগ্রহণ করেন। একদিন নেতা শরৎ ঘোষ যখন অর্থের আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সরযূবালা সেন একে একে তাঁর সকল স্বর্ণাভরণ খুলে দিয়ে এলেন। আর কেউ কখনো তাঁকে অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখেনি।

১৯৩০ সালে তাঁর স্বামী ছিলেন মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি এবং তিনি নিজে তাঁর প্রধান সহায়িকা। স্থানীয় কংগ্রেস স্থির করেন যে, ভোলাতে লবণ তৈরী ক'রে আইন ভঙ্গ করা হবে। পুলিসের দৃষ্টি পড়ল এঁদের বাড়ীর প্রতি। শত শত কর্মী এ-বাড়ীতে তখন আসা-যাওয়া করেন। সুযোগমতো পুলিস গ্রেপ্তার করতে থাকে যাকে ইচ্ছা তাকে। পুলিস এ বাড়ীর নাম দিল 'আনন্দমঠ'।

একদিন স্থানীয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কাছে সরযূবালা সেনের নিন্দা করা হয়। প্রতিবাদে ছাত্রীদের কয়েকজন অভিভাবক ঐ বিদ্যালয়ে কন্যাদের পাঠানো বন্ধ করলেন। তখন প্রধানতঃ সরযূবালা সেনের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়'। সেখান থেকে মেয়েরা প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে থাকে।

১৯৩০ সালে তিনি গঠনমূলক সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেন। দুঃস্থকে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'কর্মকুটির' নামে শিল্প প্রতিষ্ঠান। সুদূর গ্রাম থেকে আসা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন তিনি স্বল্পব্যয়ের ছাত্রাবাস। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সরযূবালা সেন নিজেই। তার স্বামী ও পুত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে কারাগারে বন্দী হন। সরযূবালা সেনকে করা হয় স্বগৃহে অন্তরীণ। অন্তরীণ অবস্থায়ও তিনি নির্দেশ দিয়ে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করেন চারিদিকের হিংসার উত্তেজনার মধ্যেও।

পঞ্চাশের মন্বন্তর। না খেতে পেয়ে মানুষ পথে পথে মরছে, মায়ের বুকে শিশু, শিশু কোলে মা। চুনিলাল সেন এবং সরযূবালা সেন দুজনেই তখন মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা ৩৫।৩৬টি নারী এবং ১৪৩টি শিশুকে 'কর্মকুটিরে' তুলে নিলেন এবং যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে সেবা করতে লাগলেন। হাসপাতালও একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৭টি নারী এবং ২৮টি শিশুকে বাঁচানো গেলনা। ঘরের অর্থ ও জনসাধারণের চাঁদাই তাঁদের সম্বল ছিল। অবশেষে 'শিশুরক্ষা

করো' সমিতির বাংলা-শাখার সম্পাদিকা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু শিশুদের ভার নেন। 'কর্মকুটির'-এর সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'শিশুসদন'। সেখানে স্থাপিত হয় শিশুদের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়। 'কর্মকুটির'ও তখন বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের পর সরযূবালা সেন এবং তাঁর স্বামী প্রথমে দেশত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে যেতে থাকে। 'শিশুসদন'-এর মুসলমান শিশুদের স্থান হ'ল 'ঢাকা সলিমুল্লা অর্-ফ্যানেজ'-এ। অন্য শিশুদের ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু নিয়ে গেলেন কলিকাতার উপকণ্ঠে 'ঠাকুরপুকুর শিশুসদন'-এ। একান্ত অসহায় নারীদের নিয়ে সরযূবালা সেন চলে যান মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রামের রাজ-এস্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের জমি ও অর্থসাহায্যে তিনি ঝাড়গ্রামে আবার 'কর্মকুটির' স্থাপন করেন।

এই 'কর্মকুটিরে' বর্তমানে শিল্পবিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, খাদিকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ পরিচালিত করছেন সরযূবালা সেন। আজ পরিণত বয়সেও তরুণের উৎসাহ নিয়ে তিনি নিরলস কাজ ক'রে চলেছেন। অবস্থা-বিপর্যয় তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারেনি।



ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা



বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে ঘোষ দস্তিদার পরিবারে ১৯০৫ সালে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পৈতৃক দেশও সেখানেই। তাঁর পিতা রজনীনাথ ঘোষ ও মাতা বসন্তকুমারী ঘোষ।

১৯১৬ সালে বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামের কেদারনাথ গুহঠাকুরতাব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর দাদা রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন বরিশাল শঙ্করমঠের কর্মী; এটি ছিল যুগান্তর-দলের বিপ্লবী কর্মীদের একটা ঘাঁটি। সেখান থেকে নৈতিক জীবনের আদর্শে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত বরিশালে। ইন্দুমতী গুহঠাকুরতার দাদার বন্ধু মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, জিতেন কুশারী প্রভৃতি তাঁদের বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করতেন। তাঁদের রাজনৈতিক আলোচনা ইন্দুমতী দেবীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। বরিশালের নেতা শরৎ ঘোষ তাঁর হৃদয়ে দেশসেবায় আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ও মুকুন্দ দাসও তাঁকে দেশসেবায় অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের কয়েকজন মহিলা এবং তাঁর মা ও বৌদির সঙ্গে ইন্দুমতী দেবীও চরকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন।

১৯২৬ সালে তিনি বানরিপাড়া গিয়ে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেসনেতা কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তাঁর প্রেরণায় তিনি প্রকাশ্য কর্মের পথে অগ্রসর হন। এই কাজে তাঁর স্বামীর বিশেষ কোনো আপত্তি না থাকলেও, তাঁকে কুলবধূ হিসাবে তিক্ত সমালোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। কিছুদিনের মধ্যে আরো তিনটি গ্রাম্য-মহিলা তাঁর সহকর্মী হন, তাঁরা হচ্ছেন—সরযূবালা সেন, লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা ও যোগমায়া দত্ত।

১৯২৯ সালে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা ও আরো কয়েকজন মিলে বানরিপাড়ায় 'একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন ও তাঁত প্রভৃতি শিল্পকাজ আরম্ভ করেন। রোগীদের সেবা কাজও তাঁরা কিছু কিছু করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন। তাকে স্থানীয় কংগ্রেসের ডিক্টেটার ক'রে দিয়ে পুরুষ-কর্মিগণ গ্রেপ্তার হন। তিনি বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩০ সালে বরিশালে কোনো মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

১৯৩১ সালে স্থানীয় কংগ্রেসের নির্দেশে বিলাতী কাপড় বিক্রি বন্ধ করবার জন্য ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা এবং সরযূবালা সেন সাতদিন সাতরাত্রি বানরিপাড়া বাজারের মধ্যে অনশন ক'রে প'ড়ে থাকেন। ফলে চারিদিকের হাটবাজার প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। তখন মনে হচ্ছিল যেন ঐ অঞ্চলে বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটেছে। দোকানদারগণ কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা ক'রে বিলাতী কাপড় বিক্রি বন্ধ করতে রাজী হয়। তারপর তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা অংশগ্রহণ ক'রে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তারপর আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইমাস স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। পুনরায় সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি নিজ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে একটি হরিজন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩৮ সালে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস অনুন্নত পল্লীর নিকটে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কিছু জমি দান করেন। ঐ জমিতে সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদের সাহায্যে ও চাঁদায় ইন্দুমতী দেবী বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করান। সেখানেই তিনি বিদ্যালয় ও কংগ্রেসের কাজ পূর্ণ উদ্যমে করতে থাকেন।

১৯৩৫ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। কাজের সুবিধার জন্য এবং কর্মীদের থাকবার একটা স্থান রাখার জন্য ১৯৩৯ সালে তিনি তাঁর পুত্রকন্যা ও কয়েকজন মহিলা-কর্মী সহ ওই প্রতিষ্ঠানেই বসবাস করতে থাকেন।

১৯৩৯ সালে ঢাকার আশালতা সেনের সহকর্মী হয়ে মহিলা-সংগঠনের কাজে তিনি উত্তরবঙ্গের বহু স্থান ভ্রমণ করেন।

ভোলার সরযূবালা সেনের আহ্বানে তিনি সেখানকার কর্মকেন্দ্রের সহায়তা-কল্পে অনেকবার ভোলা যান। ১৯৭০ সালে ভোলা থেকেই তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হন ; দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে।

১৯৪১ সালে তিনি স্বর্গীয় নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নামে ঐ প্রতিষ্ঠান-বাড়ীতে 'মনোরঞ্জন শিল্পসদন' স্থাপন করেন। সেখানে তাঁত, চরকা ও বিভিন্ন শিল্পকার্য পরিচালিত হ'ত। রোগীদের সেবার জন্য একটি বিভাগও ছিল। এই সময় প্রতিষ্ঠান-বাড়ীতে স্থায়িভাবে ১২ জন মহিলা ও পুরুষ কর্মী থাকতেন। তাঁরা গঠনমূলক কাজ ও কংগ্রেসের কাজ করতেন। এটি কংগ্রেসের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। 'মনোরঞ্জন শিল্পসদন' প্রতিষ্ঠা-দিবসে গান্ধীজী তাঁর বাণীতে জানিয়েছিলেন—"ইন্দুমাতা, তোমার কর্মজীবন যেন পল্লীগ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকে। তোমার কর্মপ্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

১৯৪২ সালের আন্দোলনে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা তিনজন মহিলা-কর্মী সহ গ্রেপ্তার হন। প্রতিষ্ঠানের পুরুষ-কর্মীরাও সকলেই গ্রেপ্তার হন। প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

দশমাস কারাদণ্ড ভোগ করার পর ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা ও যোগমায়া দত্তকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা মুক্তি পান।

অন্তরীণ থাকার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য রিলিফের কাজ পরিচালনা করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর কন্যা শান্তিরাণী ঘোষকে দিয়ে পাশের গ্রাম আদালিয়ায় একটি 'কস্তুরবা কেন্দ্র' স্থাপন করেন।

১৯৫০ সালে তাঁকে কর্মভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়।

সুরেন্দ্রবালা রায়



১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে সুরেন্দ্রবালা রায় জন্মগ্রহণ করেন পূর্ণিয়া জেলার দিল্লী-দেওয়ানগঞ্জে মামাবাড়ীতে। তাঁর পৈতৃকভূমি মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে। তাঁর পিতা মোহিনীমোহন মিশ্র ও মাতা জগৎমোহিনী দেবী।

এগারো বছর বয়সে দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার সিংহন্দি গ্রামের দ্যুতিধর রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা ঐ গ্রামেই বসবাস করতেন।

তাঁর স্বামী ছিলেন একজন একাগ্রচিত্ত কংগ্রেস-কর্মী। তাঁর নিকট থেকেই সুরেন্দ্রবালা রায় পেয়েছিলেন দেশসেবার প্রথম প্রেরণা। তারপর পত্নীতলা থানার প্রধান কংগ্রেসকর্মী অবিনাশচন্দ্র বসুর প্রভাবে তিনি এবং তাঁদের বাড়ীর সকলেই প্রভাবান্বিত হন এবং দেশসেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। হিজলীর রাজবন্দীদের উপর গুলী-চালনার পর সুরেন্দ্রবালা রায় গৃহের অন্তরালের পর্দা ছেড়ে দিয়ে সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দেশ সেবায় ডুবিয়ে দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁদের পরিবারের সকলেই অংশ-গ্রহণ করেন। তাঁদের বাড়ীটা ছিল আন্দোলন-পরিচালনার একটা কেন্দ্র। এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে তিনি এবং তাঁর স্বামী, দেওর, ভাশুর ও ভাশুরপো সকলেই গ্রেপ্তার হন এবং কারারুদ্ধ হন। বহু কৃষক-পরিবারের ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা তখন দলে দলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

সুরেন্দ্রবালা রায় একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে তাঁকে তৃতীয়-শ্রেণীভুক্ত ক'রে রাখা হয়। কিন্তু জমিদারবাড়ীর কন্যা ও ধনীর সংসারের বধূ হয়েও তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর কঠিন জীবন সানন্দে ও হাসিমুখে বরণ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে তাঁকে দ্বিতীয়-শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ইংরেজের অনুগ্রহ পাবার জন্য আবেদন করতে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁকে দিনাজপুর জেল, রংপুর জেল ও বহরমপুর জেলে বন্দী ক'রে রাখা হয়। মুক্তি পান তিনি ১৯৩৩ সালে।

মুক্তির পব তিনি পতিপুত্রসহ পিত্রালয় মালদহ জেলার ভালুকা গ্রামে চলে আসেন। সেখানেই তাঁরা বসতবাড়ী স্থাপন করেন। তাঁর ভাইরা, বিশেষতঃ সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র তাঁকে দেশসেবার কাজে সর্বপ্রকার সহাযতা কবেন। পিত্রালযের সকলেই কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন।

সুরেন্দ্রবালা রায এই সময় লাবণ্যলতা চন্দের সহযোগিতায় মালদহে একটি 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠন করেন এবং মেযেদের সচেতন করবার কাজ করতে থাকেন। সংঘের পক্ষ থেকে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়। তা ছাড়া তিনি মেযেদের নিয়ে খদ্দর-বিক্রি ও চরকা-কাটা প্রভৃতি গঠন-মূলক কাজ করতে থাকেন।

সুরেন্দ্রবালা রায তাঁর স্বামী-পুত্র নিযে স্বাধীনভাবে পার-ভালুকায নিজের বাডীতে থেকে মালদহের কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালিত করতেন। ১৯৪২ সালেব আন্দোলনে পুনবায এই পবিবারের প্রত্যেকে এবং তাঁর ভাই সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র যোগদান করেন। তাঁদেব বাডীটাই ১৯৪২ সালের আন্দোলনেব একটি প্রধান কেন্দ্র হযে ওঠে।

প্রায সকল পুরুষ-কর্মীদেব সেইসময বন্দী ক'রে জেলে নিয়ে যাওয়াতে মালদহের কংগ্রেসনেত্রী সুরেন্দ্রবালা রায ঐ স্থান থেকেই মালদহেব আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন।

স্বাধীনতা আসার পর দেখা গেল মালদহ জেলার দশটা থানা পডেছে হিন্দুস্থানে এবং পাঁচটা থানা রইল পাকিস্তানে। দ্বিখণ্ডিত মালদহের দুই অংশে দুই জাতীয পতাকা উডতে দেখে তাঁর হৃদয় যেন দুই টুক্রো হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে নিলেন।



সুশীলা মিত্র



১৮৯৩ সালেব ফাল্গুন মাসে সুশীলা মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রিপুরা জেলাব আশিকাঠি গ্রামে। তাঁর পিতা গুরুচবণ ঘোষ ও মাতা সবলাবালা ঘোষ। 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা' মেযেদের তখন লেখাপডা শিক্ষায উৎসাহ দিত। তিনি পঞ্চম মান পর্যন্ত পডাশুনা করেন।

নোয়াখালি জেলার গাবুয়া গ্রামের কুমুদিনীকান্ত মিত্রের সঙ্গে সুশীলা ঘোষের বিবাহ হয। সাংসারিক নানা দুর্যোগের সময় তাঁরা নোয়াখালি শহরে চলে যান। এখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তাঁরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। বাইবের জগতেব সঙ্গে মিশবার ফলে তাঁর মনে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিছু একটা করবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

১৯১৪-১৫ সালের ভারত-জার্মান ষডযন্ত্রেব সময় বিপ্লবীদেব একটি গোপন আড্ডা ছিল তাঁদেব পর্ণকুটিরে। তাঁর দেবর সত্যেন বসু ও শচীন বসু যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। তাঁদের দেওয়া নিষিদ্ধ জিনিসপত্র সুশীলা মিত্র লুকিয়ে রাখতেন এবং সর্বপ্রকারে তাঁদের সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা সুশীলা মিত্রকে প্রেরণা দিত।

নোয়াখালিতে তখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না; অশিক্ষিত দাইয়ের

হাতে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু ঘটত অহরহ। একদিন কলিকাতার 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' থেকে নোয়াখালিতে একজন ভদ্রলোক ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন দেখাতে যান। তার পরদিনই সুশীলা মিত্র এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে তাঁর সঙ্গে সমিতি গঠন করা সম্বন্ধে আলোচনার পর 'নোয়াখালি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' গঠন করেন; সুশীলা মিত্র সম্পাদিকা, কুসুমকুমারী সেন সভানেত্রী এবং হিরণবালা মিত্র সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। এখানে সেলাই, তাত, ধাত্রীবিদ্যা ও লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং লাঠি-ছোরা খেলার শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। তা ছাড়া ছিল শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিভাগ। সুশীলা মিত্র নিজেও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন। ডাক্তার কিরণ ঘোষ এম.বি. ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। পাস করার পর প্রত্যেককে ওষুধপত্র সহ একটি ক'রে বাক্স দেওয়া হ'ত। ২১ জন মহিলা এখান হ'তে ধাত্রীবিদ্যা পাস করেন এবং স্বাবলম্বী হন। তা ছাড়া তাঁত, সেলাই ও কুটিরশিল্প শিক্ষালাভ ক'রে অনেক মেয়ে এখান থেকে নিজেদের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হন। সমিতি ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তার ৫টি শাখা ঐ শহরেই খোলা হয়। সুশীলা মিত্র প্রায় ১০।১২ বছর সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে কংগ্রেস সর্বত্র শক্তিশালী হয়ে দানা বেঁধে উঠেছিল। সেসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাসন্তী দেবী, সুনীতি দেবী ও উমা দেবী নোয়াখালি যান। দেশবন্ধুর আহ্বানে নোয়াখালির সাধারণ মেয়েরা অনেকে শেষসম্বল গহনাটুকু পর্যন্ত দান ক'রে দিয়েছেন। নোয়াখালির মেয়েরা কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুশীলা মিত্র, কমলকুমারী ঘোষ, জ্যোতি দেবী, শশীমুখী গুহ রায়, চারুবালা কাঞ্জিলাল, কিরণপ্রভা চৌধুরী ও হিরণবালা মিত্র প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রথম মহিলা-সভ্য হয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে সংগঠিত মহিলাগণ লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা বে-আইনী লবণ তৈরী ও পিকেটিং করতে থাকেন। এই সময়ে সুশীলা মিত্র ও অন্যান্য কর্মিগণ বিপ্লবীদেরও গোপনে সাহায্য করতেন। তাঁরা বিপ্লবীদের গোপনে সংবাদ সরবরাহ এবং অর্থসাহায্য করতেন। চারুবালা কাঞ্জিলাল তাঁর গহনা বিক্রি ক'রে বিপ্লবীদের দশখানা সাইকেল কিনতে সাহায্য করেন। সুশীলা মিত্র রাত্রে পলাতক বিপ্লবীদের নিজের ছেলেদের সাথে এক-বিছানায় শোয়াতেন। বিপ্লবীরা দুপুর-বেলা শ্মশানে

অথবা অন্যত্র চলে যেতেন। আবার গভীর রাতে সুশীলা মিত্রই সকলের অগোচরে তাঁদের ভাত খাওয়াতেন।

১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনেও এই মহিলাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারি সুশীলা মিত্র সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সুশীলা মিত্র গ্রেপ্তার হন। সেদিনই জ্যোতি দেবী, শশীমুখী গুহ রায়, কিরণপ্রভা চৌধুরী এবং কমলকুমারী ঘোষও গ্রেপ্তার হন।

সুশীলা মিত্রকে বলা হয়, বণ্ড লিখে দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। আরো বলা হয়, তার আড়াই মাস, তিন বছর ও পাঁচ বছর বয়সের সন্তানরা তার সঙ্গে জেলে গেলে বাঁচবে না। সুশীলা মিত্র জবাবে বলেছিলেন, "দেশের হাজার সন্তানের সঙ্গে আমার সন্তানরাও যদি বলি যায় তবে আমি গৌরব বোধ করব, চোখের জল ফেলব না।" তাঁর প্রতি ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি কুমিল্লা ও বহরমপুর জেলে বন্দীজীবন কাটাবার পর ১৯৩৩ সালে মুক্তি পান।

তিনি ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। ছাত্র ও কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে তিনি সংগঠন করতেন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সুশীলা মিত্র ও তার সঙ্গিগণ অক্লান্তভাবে রিলিফের কাজ করেন। তাঁদের সমিতি কর্তৃক পরিচালিত একটি নারী-দুঃস্থাশ্রম তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫০ জন নারী ও ১৫টি শিশুর ভার তাঁরা গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রাণে বাঁচিয়ে স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দেন। তারা তাঁত বুনত, চাটাই বুনত, পাটের দড়ি, বেতের কাজ ও মাছ ধরবার জাল তৈরী করত।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গার পর তাঁরা দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে গিয়ে সাহস দিতেন, অসহায়দের সংগ্রহ ক'রে রিলিফ-ক্যাম্পে পাঠাতেন। চৌমুহনী রিলিফ-ক্যাম্পে তাঁরা দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের মেয়ে ও শিশুদের তত্ত্বাবধান করতেন।

১৯৪৮ সালে সুশীলা মিত্র কলিকাতায় চলে আসেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতার এণ্টালীতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রেসিডেণ্ট।

সেই যুগে সুশীলা মিত্র ছিলেন নোয়াখালির নারী-জাগরণের অন্যতম উৎস।

দৌলতন্নেছা খাতুন



দৌলতন্নেছা খাতুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৮ সালের জুন মাসে বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক গ্রামে। তাঁর পৈতৃক বাড়ী যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমাতে। তাঁর পিতা মহম্মদ ইয়াসীন ও মাতা নুরুন্নেসা খাতুন।

নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতন্নেছার মাত্র আটবছর বয়সে বগুড়ার ডাঃ হাফিজুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ হয়।

তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা সেইসময়ে স্ত্রীশিক্ষার খুব বিরোধী ছিলেন। তবুও দৌলতন্নেছার পিতামাতা তাঁর লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তারপর তাঁকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়। তাঁর স্বামী গাইবান্ধার ডাক্তার ছিলেন। লেখাপড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ থাকাতে তিনি সেখানেই বাড়ীতে ব'সে লেখাপড়া করতে থাকেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সভা ও শোভাযাত্রায় দৌলতন্নেছা যোগদান করেন। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় দৌলতন্নেছা খাতুন ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে 'গাইবান্ধা মহিলা-সমিতি' গঠন করেন। যদিও বয়স তখন তাঁর মাত্র ১৪ বৎসর, দায়িত্বজ্ঞানে ও কর্মভার-গ্রহণে তিনি পরিণত বয়সের পরিচয় দিতেন। সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন তিনি নিজে, সভানেত্রী ছিলেন মহামায়া ভট্টাচার্য এবং সহ-সভানেত্রী দক্ষবালা দাস।

এই সমিতি সভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং, ১৪৪ ধারা অমান্য ও প্রচারকার্য ইত্যাদি পূর্ণোদ্যমে করতে থাকে। আশেপাশের ৭।৮টি গ্রামের মহিলাগণও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বামুনডাঙা, সুরতখালি, নলডাঙা, বিজয়ডাঙা, ফুলছড়ি, কুপতলা, তুলসীঘাট প্রভৃতি গ্রামে তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান দলে দলে দৌলতন্নেছার বক্তৃতা শুনতে আসতেন। ঘোর পর্দানসীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাতে আবার অত ছোট, তাই সভা লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। দৌলতন্নেছা খাতুন প্রাণের আবেগে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করতেন।

কিছুদিন পরে তাঁর স্বামীকে গাইবান্ধার বাইরে বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁদের গাইবান্ধার বাড়ীও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে যেদিন পুলিস এসে তাঁদের বাড়ী বাজেয়াপ্ত করে সেদিন একটি দেবরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে শহরের রাজপথে এসে দাঁড়াতে হয়। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সযত্নে তাঁকে তাঁর পরিবারে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন।

সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও নির্যাতন হাসিমুখে বরণ ক'রে নিয়ে দৌলতন্নেছা আন্দোলন পরিচালনা ক'রে যান। অবশেষে পুলিস মুলচড়ি গ্রাম থেকে তাঁকে, মহামায়া ভট্টাচার্যকে এবং প্রতিভা সরকারকে গ্রেপ্তার ক'রে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। দৌলতন্নেছা খাতুন রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে বন্দী ছিলেন।

এই সময় দৌলতন্নেছার আত্মীয়া ও সমবয়সী জিয়াউননাহার বকিনা খাতুন এবং সামসুননাহার রোকেয়া খাতুন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের গেপ্তার করা হয় নাই।

মুক্তির পর দৌলতন্নেছা খাতুন দেখলেন আন্দোলন মন্দীভূত। তিনি পড়াশুনায় মন দিলেন। ঘরে বসে পড়াশুনা ক'রে তিনি বি.এ. পর্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা প্রবন্ধ ও গল্প লিখে তিনি তাঁর সাহিত্যরুচির পরিচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমিতির কাজও করতেন।

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অনাথ শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন এবং সমাজসেবামূলক কাজে প্রবৃত্ত হন।

বর্তমানে তিনি স্বামী-পুত্রের সঙ্গে পাকিস্তানে ঢাকায় বসবাস করছেন এবং নানারূপ গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে দেশসেবায় নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চীনে প্রেরিত ডেলিগেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি চীন পরিভ্রমণ ক'রে এসেছেন।

সুলেখিকা, সুবক্তা এবং সমাজসেবিকারূপে তিনি এখন পূর্ব-পাকিস্তানে পরিচিত।

স্নেহশীলা চৌধুরী



খুলনা জেলার বাড়ুলি গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮৬ সালে স্নেহশীলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিত্রালয় যশোহরের পাঁজিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা যোগেন্দ্রনাথ বসু ও মাতা রাজলক্ষ্মী দেবী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর মামাতো ভাই।

খুলনা জেলার সাহস গ্রামের ললিতমোহন চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় বারোবছর বয়সে। স্বামীর প্রেরণা ও উদ্যোগে তিনি দেশসেবার কাজে অগ্রসর হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় স্বামীর উৎসাহে তিনিও বিলাতী দ্রব্য বর্জন করেন। সভা-সমিতি আহ্বান করতে এবং বক্তৃতা দিতে স্বামীই তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের বিলিতী কাচের চুড়ি ভেঙে শাঁখা পরিয়ে দিতেন, বিলিতী জিনিস বর্জন করতে শেখাতেন। কোথাও বন্যা বা দুর্ভিক্ষ হ'লে সাহায্য সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দিতেন। দরিদ্রের পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, কন্যার বিবাহ, পাঠ্যপুস্তক ও বেতনের অর্থ তিনি সবদাই সংগ্রহ ক'রে দান করতেন। জনসেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে।

১৯২১ সালের অসহযোগ অন্দোলনের সময় তাঁর আত্মীয় অনেকে আদালত বর্জন করেন। স্নেহশীলা চৌধুরী তখন সভা-সমিতি আহ্বান ক'রে সরকার-বিরোধী প্রচারে প্রবৃত্ত হন। স্বামীর প্রেরণায় যেমন তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তেমনি স্বামীর চেষ্টায় ও যত্নে তিনি সুলেখিকা হন। ১৯২৮ সালে তার স্বামী পরলোকগমন করেন।

১৯৩০ সালে যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, খুলনা শহরে স্নেহশীলা চৌধুরী, শৈবলিনী দেবী, সরলাবালা রায়, সুরবালা রায়, বসন্তকুমারী পৈ, মেরী পৈ, নীহার পৈ, ঊষারাণী দেবী, ঊধারাণী দাস, কিরণবালা দেবী, সুধারাণী হুই, অমিয়া মিত্র, রেণুকা ঘোষ, রাণী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণ দলে দলে পিকেটিং ও শোভাযাত্রা করতে থাকেন। একদিন শোভাযাত্রা করবার সময় শৈবলিনী দেবী পুলিসের লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিন্তু শোভাযাত্রা দমন করা যায় নাই। পূর্ণ উদ্যমে দিনের পর দিন তাঁরা আন্দোলন

পরিচালনা ক'রে যান। খুলনা জেলার বাগেরহাটের আন্দোলনে নেতৃত্ব ক'রে কারাবরণ করেন লীলাবতী দেবী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী প্রভৃতি।

স্নেহশীলা চৌধুরী আন্দোলন পরিচালনা করতেন পল্লী অঞ্চলে আজুগড়, শাঁফলতলা, পযগ্রাম, ফুলতলা, মহেশ্বরপাশা, খালিশপুর ইত্যাদি গ্রামেও।

সেসময়ে 'মহিলা সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়, এর সম্পাদিকা ছিলেন সরলাবালা রায় এবং সভানেত্রী শৈবলিনী দেবী।

১৯৩১ সালে স্নেহশীলা চৌধুরী একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন গান্ধীজীর আদর্শে। এখানে হরিজনদেরও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তারা বৃত্তি লাভ করত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত এই বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করেন।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্নেহশীলা চৌধুরী পুনরায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তখন খুলনা জেলা কংগ্রেসের ডিক্টেটার ছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজারে গিয়ে বক্তৃতা দিতেন। এই সময়ে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়াতে তাঁর ছয়মাস কারাদণ্ড হয়।

মুক্তির পর তিনি ঐ স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'রে একটি বাড়ী নির্মাণ করান এবং স্কুলের নাম দেন 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সার্বজনীন বিদ্যালয়'। স্কুলে চরকা ও কুটির-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবার পর তাঁর নিজ-হাতে-গড়া সার্বজনীন বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যখন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তখনো পতনোন্মুখ বিদ্যালয়কে অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বহুকষ্টে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর সারাজীবনের কর্মস্থল ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসাতে তাঁর কর্মজীবনের অবসান ঘটেছে।



সুরমা মুখোপাধ্যায়



১৮৮৭ সালের ১লা শ্রাবণ সুরমা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলিকাতায়। তাঁর পিতা সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ঈশানী দেবী।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কালিকাপুর গ্রামের গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অল্পবয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা কাটোয়াতে বসবাস করতেন। তিনি স্বামীর নিকট থেকে দেশসেবার প্রেরণা পান।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সুরমা দেবী চরকা কাটতেন ও খদ্দর ব্যবহার করতেন। 'কাটোয়া মহকুমা মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতি' গঠিত হবার পর তিনি তার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে তিনি ও তাঁর সহকর্মিগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের নিয়ে তিনি পিকেটিং করতেন, সভা-সমিতি আহ্বান করতেন ও বে-আইনী লবণ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করতেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনেও তিনি কাটোয়ার মহিলাদের নিয়ে পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁর দুইবারে ছয়মাস ক'রে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি বর্ধমান জেলে ও বহরমপুর জেলে বন্দীজীবন যাপন করেন। আজীবন তিনি দেশের সেবা ক'রে গেছেন।

সুরমা মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুঃস্থদের সেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা বিস্মৃত হবার নয়। বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার নারী-জাগরণে সুরমা দেবীর অবদান অনেকখানি।

১৯৪৬ সালের ১৬ই নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

নরেশনন্দিনী দত্ত



শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হবিনগর পরগনার এক বিখ্যাত পরিবারে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে নরেশনন্দিনী দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র গুপ্ত ও মাতা নিত্যময়ী গুপ্ত।

অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তারপর ১৯৩১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর অষ্টমবর্ষীয় একমাত্র পুত্রকে মাতুলালয়ে রেখে তিনি 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘে' যোগদান করেন। তদবধি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঐ মহিলা সংঘের কর্মীরূপে তিনি গান্ধীজী-প্রবর্তিত প্রতিটি আন্দোলনে যোগদান ক'রে পাঁচবার কারাবরণ করেন। শুধু তাই নয়, গঠনমূলক ও সমাজহিতকর কাজে তাঁর নিরলস ও নীরব কর্মসাধনা শ্রীহট্টের মহিলাদের কর্মে ও ত্যাগে অনুপ্রাণিত করত।

তিনি ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দুইবার কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার তাঁকে ভয় দেখাতে পারেনি। ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান ক'রে আবার তিনি কারাগৃহে প্রবেশ করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন পরিচালনা করতে করতে পুনরায় কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে সেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। নিরাপত্তা বন্দীরূপে রাজ-অতিথি হ'য়ে রইলেন তিনি শ্রীহট্ট জেলে পঞ্চমবারে। জেলখানা তাঁর হাসিমুখকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল।

নোয়াখালির দাঙ্গার পর উক্ত অঞ্চলে প্রায় চারবছর পর্যন্ত দুঃস্থের সেবায় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

বর্তমানে তিনি আংশিকভাবে ভূদান-যজ্ঞের কাজে ও অভয় আশ্রমের গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত আছেন।



যমুনা ঘোষ

★

যমুনা ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালিকান্দা গ্রামে। প্রখ্যাত নেতা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ছোট ভগ্নী তিনি। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও মাতা বীণাপাণি দেবী। শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন টাঁকশালের উচ্চপদের সরকারী চাকরি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন তখনই তিনি সাত-আট বছর বয়সের ভগ্নী যমুনাকে কলিকাতা নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে চলে যান। সেখানেই যমুনা মানুষ হ'তে থাকেন।

১৯২৯ সালে তিনি চলে আসেন কুমিল্লা নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে।

১৯৩১ সালে যখন লাবণ্যলতা চন্দ এসে কুমিল্লা অভয়-আশ্রমে 'কন্যা শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা করেন তখন যমুনা ঘোষ এসে সেখানে যোগ দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় অভয়-আশ্রমকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। লাবণ্যলতা চন্দ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে জানুয়ারি মাসেই যমুনা ঘোষের কারাদণ্ড হয় পনেরো মাস। মুক্তির পর পুনরায় আন্দোলন পরিচালনা করার অপরাধে আবার তাঁর সাজা হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি মুক্তি পান।

ফিরে এসে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং বি.এ. পাস করা পর্যন্ত লেখাপড়া করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে তিনি কন্যা-শিক্ষালয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে তাঁকে নিরাপত্তা বন্দীরূপে জেলে আটক রাখে একবছর; মুক্তি পান তিনি ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে।

ফিরে এলেন তিনি দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ার মধ্যে। তখন লাবণ্যলতা চন্দের সঙ্গে তিনি রিলিফের কাজ ও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি বাংলাদেশে এইসব নিরভিমান ও যশোলিপ্সাহীন কর্মীরাই গেঁথে তোলেন।

বর্তমানে বলরামপুরের বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অন্যতম অংশ হচ্ছে সবকিছু নিজহাতে সাফাই করা। যমুনা ঘোষ যখন অন্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে বালতি-ভর্তি মলমূত্র সাফাই করেন তখন মনে হয়—গান্ধীজীর শিক্ষা এখনো বাংলাদেশ কোনো কোনো প্রান্তে অনুসরণ করছে—গান্ধীজীকে বাংলাদেশ একেবারে ভোলে নাই।

প্রভানলিনী ভাণ্ডারী

★



১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ২৪ পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার যাদবপুর গ্রামে প্রভানলিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হেমচন্দ্র হালদার।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বর্তমানে ভূদান-যজ্ঞের নেতা চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর সঙ্গে তার অল্পবয়সে বিবাহ হয়। তাঁর শ্বশুরবাড়ীও ডায়মণ্ডহারবারে।

স্বামীর নিকট থেকে তিনি দেশসেবার প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩০ সালের লবণ আইন আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তাঁর কারাদণ্ড হয় নাই। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করাতে তিনি তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তি পাবার পর পুনরায় ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিকেটিং পরিচালনা করার অপরাধে তিনি তিনমাস কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি ডায়মণ্ডহারবার আদালতের মাঠে স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠান পরিচালনা করবার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন ও তাঁর প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। এই নিরলস ও দৃঢ়সংকল্প নারীকে বাধা দেবার সাধ্য ইংরেজ সরকারের ছিল না। যতবারই দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন ততবারই দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি আবার এগিয়ে গেছেন।

স্বামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রতিষ্ঠিত 'খাদি-মন্দির'-এর সূতাকাটা, হরিজন-সেবা প্রভৃতির তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ১৯৩৪ সাল থেকেই।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে সাতমাস কারাদণ্ড নিয়ে রইলেন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে।

বর্তমানে তিনি ভূদান-যজ্ঞের আদর্শে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী এবং স্বামীর সঙ্গে তিনি এই কর্মেই যুক্ত আছেন।



বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী



১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজসাহী জেলার তানোর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনবছর বয়সের মধ্যেই তাঁর পিতা মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র এবং মাতা মনোমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর মেজদির কাছে মানুষ হয়ে ওঠেন।

১১ বছর বয়সে সিরাজগঞ্জের যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ীর প্রায় সকলেই স্বদেশীভাবাপন্ন ছিলেন।

১৯২১ সালে ১৩ বছর বয়সে সিরাজগঞ্জের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী সিরাজউদ্দীন সাহেবের ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিলিতী দ্রব্য বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করেন। অথচ বিলিতী চুড়ি পরিধান করা সম্বন্ধে দু'দিন আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। স্বামী বিলিতী রেশমী চুড়ি পরার বিষয়ে আপত্তি করেন, কিন্তু জেদী, সৌখিন, ছেলেমানুষ বৌ তা শুনলেন না। মনের মতো বেছে বেছে চুড়ি প'রে এলেন। তারই দু'দিন পরে সিরাজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা শুনতে স্বামী পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রীকে, যাতে বিলিতী পরবার স্পৃহা আর তাঁর না-জাগে। ঢিল ঠিক জায়গায় পড়েছিল, কাঁচের চুড়ি ভেঙে গেল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ১৭ বছর বয়সের সময় হঠাৎ তাঁর স্বামী মারা যান। তাঁর সেজ ভাশুর পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন আজীবন কংগ্রেস-সেবী। তিনিই এই হতভাগ্য কিশোরীকে স্বদেশী কার্যের প্রেরণা দেন। তিনি বুঝেছিলেন বিষ্ণুপ্রিযার অশান্ত জীবনে অন্য আর কিছুতে শান্তি আসবে না,—আসবে ত্যাগের পথে, মানবকল্যাণের পথে।

১৯৩১ সালে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে দলে দলে মেয়েরা যখন জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া চলে গেলেন কংগ্রেসনেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্তের কাছে। তিনি তখন মেয়েদের বেছে বেছে নিয়ে আইন অমান্য করতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও আন্দোলনে যোগদানের অনুমতি চাইলেন। প্রায় ২৫।২৬টি সত্যাগ্রহীর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তিনি চলে যান আইন অমান্য ক'রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে। সেখানেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হিজলী, প্রেসিডেন্সি ও বহরমপুর জেলে তিনি বন্দী ছিলেন। জেলের মধ্যে কল্যাণী দাস, সুলতা কর প্রভৃতির সঙ্গে মিশে তাঁদের প্রভাবে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে বেরিয়ে এসে তিনি শোভারাণী দত্তের সঙ্গে যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলে কাজ করেন।

বহরমপুর জেলে তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং তিনি (লাবণ্যপ্রভা দত্ত) তাঁকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করতেন। আজও তাঁদের সেই মাতা ও কন্যার সম্পর্ক অটুট আছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বি.পি.সি.সি.-র সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ সাল পযন্ত কলিকাতায় ২২নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন। তা ছাড়া শোভারাণী দত্ত নিজে তাঁকে বিপ্লবীদলের কাজ করতে শিক্ষা দেন। রিভলভার আদান-প্রদান করা, লুকিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করা, তাঁদের আশ্রয় দেওয়া সবই তিনি শোভারাণী দত্তের নির্দেশে করতেন।

তিনি সরলা-পুণ্যাশ্রমের জন্য ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন নিয়ে নানা জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সমাজসেবার কাজে তিনি ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন নিয়ে মালদহ, রাজসাহী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন।

এইভাবে জীবনের সার্থকতার সাধনায় তিনি জনসেবার কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

সরমা গুপ্তা





সরমা গুপ্তা ১৮৮২ সালে ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র সেন ও মাতা সরলাসুন্দরী সেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে সরমা গুপ্তা সন্তান ও স্বামীহারা হয়ে ঢাকায় পিত্রালয়ে চলে আসেন।

তিনি দেশের সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীজীর ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯২৪ সালে সরমা গুপ্তা আশালতা সেনের সঙ্গে ঢাকায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতি থেকে চরকা ও খদ্দর প্রচার করা, খাদি ও শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, সভা-সমিতি আহ্বান করা এবং নানা গঠনমূলক কাজ করা হ'ত। মহিলাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা—সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে সমিতিতে লাঠি-ছোরা খেলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হয়। শিক্ষাদান করতেন বিপ্লবী আশুতোষ দাশগুপ্ত।

১৯২৯ সালে সরমা গুপ্তা ও আশালতা সেন গেণ্ডারিয়ার দুই মাইল দূরে একটি নিরক্ষর ও নমঃশূদ্রপ্রধান চাষীদের গ্রামে 'জুড়ান শিক্ষামন্দির' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ গ্রামের কোনো কোনো লোক

কংগ্রেস-কর্মীদের সেখানে কংগ্রেসের কাজ করতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। তখন সেই গ্রামের একজন বয়োবৃদ্ধ মাতব্বর অমরচাঁদ মিস্ত্রী তাঁদের কাজে আন্তরিকভাবে সহায়তা করতে থাকেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্যে ঐ অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়টি তারা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। এই স্কুলের প্রথম পুরস্কার বিতরণী সভাতে অমরচাঁদ মিস্ত্রীর একটি পৌত্র পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পুরস্কারস্বরূপ মহিলা-সমিতির পক্ষ থেকে একখানা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পায়। সেই সভাতেই সে যখন পিতামহের হাতে রামায়ণখানি দিয়ে প্রণাম করে তখন সেই বৃদ্ধের চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। বংশানুক্রমে নিরক্ষর একটি পরিবারের বৃদ্ধ অভিভাবকের শিক্ষাপ্রাপ্ত পৌত্রের কাছ থেকে পাওয়া রামায়ণখানা যে কী অমূল্য সম্পদ ব'লে মনে হয়েছিল তা ভাষা দিয়ে বোঝাবার নয়, চোখের জল দিয়েই বুঝবার।

এই বিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্র পরে ম্যাট্রিক পাস করেছেন, কোনো কোনো ছাত্র কলেজেও পড়েছেন। আশেপাশের ৩৪টি গ্রামের ছেলেরাও এই জুড়ান গ্রামে এসে শিক্ষালাভ করত। সরমা গুপ্তা বিদ্যালয়টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার মৃত্যুর পর তারই নামে বিদ্যালয়টি আজও চলছে।

১৯৩০ সালে সরমা গুপ্তা 'সত্যাগ্রহী সেবিকা-দল' এর কর্মীরূপে নোয়াখালি গিয়ে লবণ আইন অমান্য করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

১৯৩২ সালে আন্দোলন পরিচালনা ক'রে তিনি গেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে প্রেরিত হন। মুক্তির পর তাঁর প্রধান কাজ ছিল ঢাকা জেলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত মহিলাদের খোঁজখবর নেওয়া, কারামুক্ত হ'লে তাদের ঢাকা থেকে নিজ নিজ গ্রামে অথবা কর্মকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন বে-আইনী প্রচারপত্র সাইক্লোস্টাইল করিয়ে মহিলাদের দিয়ে তিনি বিলির ব্যবস্থা করতেন। সত্যাগ্রহী সেবিকা-দলের নিজস্ব সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল—এই বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার উপর। তিনি কংগ্রেসের প্রচারের কাজে ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এবং কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

সরমা গুপ্তা ছিলেন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বহু দেশসেবকেরই স্নেহশীলা 'বড়দি', এবং বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী।

১৯৭২ সালে তিনি কঠিন রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য হন। ১৯৭৫ সালে তাঁর দেহাবসান হয়।

সরযূ গুপ্তা





কলিকাতায ১৮৮৮ সালে সরযূ গুপ্তা জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পৈতৃক বাডী ঢাকা-বিক্রমপুবেব সোনাবং গ্রামে। তাঁব পিতা দেবেন্দ্রমোহন সেন ও মাতা কুমুদিনী সেন।

সবযূ গুপ্তা গান্ধীজীর আদর্শে প্রবুদ্ধ হযে সারাজীবন কংগ্রেসেব কাজ ক'বে গেছেন। ১৯২৪ সালে ঢাকার 'গেণ্ডাবিযা মহিলা সমিতি'ব সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন।

সরযূ গুপ্তার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায পারদর্শিতা ছিল। তিনি ঐ মহিলা-সমিতিব স্বাস্থ্য-বিভাগের মাধ্যমে রুগ্নব্যক্তিদের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা দ্বাবা সুস্থ করতেন। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে প্রসূতিদের তিনি প্রসব-কালীন সহায়তা ও শিশুদের পরিচর্যা করতেন।

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি ঢাকা জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল'-এর অন্তর্ভুক্ত হযে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলতে থাকে। তার ফলে সরযূ গুপ্তা, কামিনী বসু, সুনীতি বসু ও প্রতিভা

সেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁদের মধ্যে সুনীতি বসু ভিন্ন অন্য তিনজনই ছিলেন বিধবা। তাঁরা যখন জেলে গেলেন তখন বিধবাদের অখাদ্য সাধারণ লঙ্গরখানার কয়েদীদের রান্না (ফাইলের ভাত) তাঁদের খেতে দেওয়া হয়। তাঁরা সরযূ গুপ্তার নেতৃত্বে স্বহস্তে রান্না ক'রে খাবার দাবী জানান। নানা-প্রকার ভীতিপ্রদর্শনের পরও তাঁদের দৃঢ়তা দেখে জেল-কর্তৃপক্ষ বিধবাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর যখন পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সরযূ গুপ্তা ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটার নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। সেই সময়ে ঘোড়সোয়ার পুলিস তাঁদের ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি জাতীয় পতাকাহস্তে দৃঢ়পদক্ষেপে শোভাযাত্রা নিয়ে অগ্রসর হন। অবশেষে তাঁকে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কারামুক্তির কিছুকাল পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৪৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।



সরযূবালা সেন

(ঢাকার)



সরযূবালা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৯ সালে। তাঁর পৈতৃকভূমি বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে। তাঁর পিতা শ্যামাচরণ সেন ও মাতা সরলাসুন্দরী সেন।

সরযূবালা সেন ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁর মধ্যে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। তিনি খদ্দর-প্রচারের উদ্দেশ্যে 'গেণ্ডারিয়া শিল্পাশ্রমে' বয়নকার্য শিক্ষা করেন।

১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল'-এর সদস্যরূপে। পুনরায় ১৯৩২ সালের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে ঐ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুক্তির পর তিনি বিক্রমপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত। মহিলাগণ ঘরসংসার ছেড়ে এখানে অবস্থান ক'রে আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করতেন। শিবিরে একত্রিত মহিলাদের নিয়ে সরযূবালা সেন ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টে পিকেটিং করতেন ; গ্রামে গ্রামে সভা ও বৈঠক, এমনকি জলপথেও নৌকায় শোভাযাত্রা পরিচালিত করতেন। এঁদের কোর্ট-পিকেটিং-এর ফলে কিছুদিনের জন্য কয়েকটি কোর্ট বন্ধ থাকে এবং মদ-গাঁজার দোকানও বন্ধ হয়ে

যায়। লাঠি-চার্জ করেও এইসমস্ত মহিলা-কর্মীদের নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের ফলে যাঁরা ঐ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেন তাঁদের অনেকের মালপত্র ক্রোক করা হয়।

এইসমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পুলিস বার বার 'নশঙ্কর শিবির'-এর মহিলাদের বিতাড়িত করে এবং বারবারই তাঁরা শিবির দখল ক'রে বসেন।

১৯৩২ সালে সরযূবালা সেন ও তাঁর সহকর্মী মহিলাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় ঘোর বর্ষার সময় পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সম্মেলন'-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকাযোগে সমাগত মহিলাগণ সম্মেলন-স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে রাত্রির অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর নৌকা লাগিয়ে, নৌকাতেই রাত্রিযাপন করেন। পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধ্বনিসহ হঠাৎ সকলে সম্মেলন-ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা হাতে উপস্থিত হন এবং সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করেন। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন ক্ষান্তকালী দেবী। তাঁর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ যখন আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারারুদ্ধ হন তখন এই বয়োবৃদ্ধা মহিলা অগ্রসর হয়ে আসেন কারাবরণ করবার জন্য। সম্মেলন আরম্ভ হবার অল্প পরেই পুলিসবাহিনী সভাস্থল ঘিরে ফেলে এবং সভানেত্রীসহ ৯৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে; এঁদের মধ্যে ক্ষান্তকালী দেবী প্রভৃতি সাতজনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯৩৩ সালে কলিকাতায় বে-আইনী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে। সরযূবালা সেন ঢাকা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে এই বে-আইনী কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

মুক্তির পর পুনরায় তিনি আইন অমান্য করেন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে প্রেরিত হন। কারামুক্তির পর তিনি 'ঢাকা কল্যাণকুটিরে' অবস্থান ক'রে গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হন।

কিরণবালা রুদ্র



১৮৯৯ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পূর্বখিলপাড়া গ্রামে কিরণবালা রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃকভূমিও ঐ স্থানেই। তাঁর পিতা শশীকুমার দে ও মাতা রাজবালা দেবী।

পনেরো বছর বয়সে মুকুন্দদাসের যাত্রা ও স্বদেশী-প্রচার তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। পিতার স্বদেশপ্রেম ও তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী বিক্রমপুরে ও নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন প্রচার করতে যান। তখন থেকেই কিরণবালা রুদ্র চরকা-কাটা ও খদ্দর ব্যবহার করা আরম্ভ করেন, অদ্যাবধি তিনি খদ্দর ছাড়া অন্য বস্ত্র ব্যবহার করেন না।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী বিক্রমপুরে যান। তাঁর আগমনে সমগ্র বিক্রমপুর চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেইসময়ে কিরণবালা রুদ্র শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়েন। তারপর তিনি আশালতা সেনের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁরা একত্রে কাজ করতে থাকেন—বিক্রমপুরের নানা স্থানে মহিলা-শিবির স্থাপিত হ'তে থাকে।

১৯৩১ সালে তাঁরা বিক্রমপুরে স্বদেশী পোস্টাফিস স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই পুলিস সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে। তাঁরা পাইকপাড়ায় মহিলা-সমিতির টাকা দিয়ে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৩২ সালের আন্দোলনে যোগদান করার ফলে পাইকপাড়ায় কিরণবালা রুদ্র সহ ১৮ জন মহিলা সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন ও প্রায় দেড়শত মহিলা হাজতবাসের পর মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে কিরণবালা রুদ্র একবছর আটমাস কারারুদ্ধ থাকেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগদান করাতে তিনি ঐ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর প্রতি দুইবছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে একবৎসর পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পর তিনি 'পাইকপাড়া বিদ্যাশ্রম'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু দেশ-

বিভাগের পর পাইকপাড়ার প্রায় সাতশত চরকা-কাটুনী বাংলার এদিকে চলে আসেন, কিরণবালা রুদ্রও অবশেষে বছরখানেক পরে চলে আসেন। ফলে ওদিকের কাজ তাঁর বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে তিনি ভূদান-যজ্ঞের সঙ্গে জড়িত আছেন।

ঊষা গুহ



১৮৯৯ সাল ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঊষা গুহ। তাঁর পিতা অভয়চন্দ্র ঘোষ ও মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণা পান। ১৯৩০ সালে নোয়াখালিতে তিনি লবণ-সত্যাগ্রহ করেন। ১৯৩২ সালেও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালের আন্দোলনের সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন নবাবগঞ্জ থানার গালিমপুর গ্রামে একটা ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কর্মী সুনীতি বসু ও ঊষা গুহের উদ্যোগে। সেই সময়ে প্রায় দুইশত গুর্খা সৈন্য সেই বাড়ী ঘেরাও করে। তখন বিকাল ৪টা। পুলিস সুনীতি বসু ও ঊষা গুহকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে হাঁটাতে আরম্ভ করে। প্রায় ৬।৭ মাইল হাঁটাবার পর রাত্রি আটটার সময় তাঁদের নবাবগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। থানার দারোগা কনেস্ট-বলদের চুপিচুপি কিছু ব'লে দেয়। তারপর পুলিস আবার তাঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে চললো এক জঙ্গলের দিকে। সেই জঙ্গলের একটা নিবিড় বেতঝোপের মধ্যে তাঁদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে তারা চলে যায়। বেতঝোপটা এত ঘন ছিল যে, আকাশও দেখা যাচ্ছিল না, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব। সারারাত্রি মহিলা দুজন সেখানে নিরুপায়ভাবে আটকে রইলেন। ঊষা গুহ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "সুনীতিদি, আমাদের এ কোথায় ফেলে দিয়ে গেল?" সুনীতি বসু অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি? যাঁর নাম ক'রে বেরিয়েছ তাঁকে স্মরণ কর।" গান্ধীজীর নামের ছিল এমনই প্রভাব।

গালিমপুরের জঙ্গলে বাঘ থাকত। পুলিসরা বলেছিল, সে-রাতে নাকি কেউ কেউ তারা বাঘ দেখেছিল। ভোর হলে পুলিস দেখল যে, ঐ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দুটি গান্ধী-অনুগতা স্বদেশভক্ত নারী তখনও বেঁচে আছেন, বাঘে খায়নি। সেখান থেকে আবার তাঁদের থানায় নিয়ে যায়। থানাতে

নিয়ে গিযে কুৎসিত গালাগালি ক'রেও দারোগা তাঁদের মনোবল বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

কোর্টে মামলা শুরু হ'ল। তিনমাস হাজতবাসের পব তাঁদের প্রতি একশত টাকা জবিমানা দণ্ডের আদেশ হয।

প্রফুল্লমুখী বসু



১৮৯৮ সালের ৩রা নভেম্বর বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে প্রফুল্লমুখী গুহঠাকুরতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা ও মাতার নাম নির্মলাসুন্দরী দেবী।

তাঁর পিতা ছিলেন আজীবন কংগ্রেস-কর্মী, এবং কন্যা পেয়েছিলেন পিতার নিকট থেকে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা।

১৩ বৎসর বয়সে তার বিবাহ হয় এবং ২৮ দিন পরেই তিনি বিধবা হন ও পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। কন্যাকে পুনর্বিবাহে অসম্মত দেখে পিতা তাঁকে সেবামূলক কাজের শিক্ষা দেন।

১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি শ্রীশ্রীসারদামাতা ও স্বামী প্রেমানন্দজীর আশীর্বাদ লাভ করেন। সারদামাতা তাঁকে দেখেই ব'লে উঠলেন—"অত নিরাশ কেন মা? তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।" প্রফুল্লমুখী একথা শুনে প্রাণে নতুন আলোর ইঙ্গিত পান।

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন ঢাকা যান তখন প্রফুল্লমুখী দেবী কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন। তিনি চরকা ও খদ্দরের প্রচারকার্য করতে থাকেন। মুন্সীগঞ্জে গিয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য করাতে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে ৬ ঘণ্টা থানায় আটক থাকেন।

১৯২৫ সাল থেকে তিনি রাজনৈতিক কাজে আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। সেইসঙ্গে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি বক্তৃতা ও প্রচারকার্য করতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে অর্ডিনান্স আইনে একমাস জেলে আটক রাখার পর চট্টগ্রাম বিভাগে প্রবেশ নিষেধ ক'রে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে' কংগ্রেসের ডিক্টেটার হিসাবে ১৪৪ ধারা অমান্য করাতে তাঁকে কুমিল্লায় ৯ মাসের

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কুমিল্লা, হিজলী ও বহরমপুর প্রভৃতি নানা জেলে তিনি বন্দী ছিলেন।

মুক্তির পর শিক্ষয়িত্রী-জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনেকসময় গ্রীষ্মের ছুটিতে আশালতা সেন ও সরমা গুপ্তার সঙ্গে বিক্রমপুরে গঠনমূলক কাজের জন্য পরিভ্রমণ করতেন।

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে গঠনমূলক কাজ, রিলিফের কাজ ও নানা জনসেবার কাজ ক'রে চলেছেন। কুমিল্লার 'সারদা দেবী মহিলা সমিতি'র তিনিই সম্পাদিকা ও প্রাণশক্তি।

শতদল সরকার



১৯০৬ সালের ২৬শে এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার গুমুট নামক গ্রামে শতদল সবকাব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কেদারনাথ বিশ্বাস ও মাতা যুগল-কিশোবী দেবী।

গ্রামের মেযে। তাঁর অল্পবযসেই বিবাহ হয। কিছুদিন পরেই স্বামীব মৃত্যু হয়। তারপব সাধাবণ গৃহস্থবাড়ীব মতো শুধুই শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর টানা-পোড়েনের মধ্যে একঘেযে দিনগুলি গড়িযে চললো।

নানা প্রশ্ন এসে মনকে তাঁর তোলপাড ক'বে তোলে—নারীরূপে জন্ম হযেছে ব'লে কিছুই কি পৃথিবীতে করবার নেই? অত্যাচার যখন চরম অবস্থায় আসে তখনই হয বিদ্রোহ। একদিন বিদ্রোহী হয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে লুকিয়ে যোগ দিলেন তিনি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে।

বিদ্রোহী শতদল সরকার প্রথমে সরসীবালা দেবীর সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অধীন গোপালনগর ক্যাম্পে যান। সেখানে রণজিৎকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় আইন অমান্য আন্দোলন পবিচালনা কবছিলেন। এখানকার আন্দোলনে শতদল সরকার এবং পবে তাঁর ছোটবোন নীরজা বিশ্বাস যোগদান করেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন অনেক মহিলা-কর্মীকেই গ্রেপ্তার করে তখন শতদল সরকার ও নীরজা বিশ্বাস টানাদীঘিতে একটা বাড়ীতে আত্ম-গোপন ক'রে থাকেন। সেখান থেকে তাঁরা দুই বোন এবং লোকপুরের বীণাপাণি দেবী কলিকাতায় এসে আন্দোলনে যোগদান করেন। সেখানে পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করে এবং তাঁরা চারমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীরজার বয়স কম ছিল ব'লে তাঁকে তখন ছেড়ে দেয়, কিন্তু ১৯৩১ সালেব ২৬শে জানুয়ারি পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শতদল সরকার যখন বাড়ী যান তখন তাঁদের নেতা রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে। জেল থেকে বের হলেন তিনি মারাত্মক

রোগ নিয়ে; শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শতদল তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

তারপর তাঁর পদপ্রদর্শক হয়ে দেখা দিলেন কংগ্রেস-নেতা সুশীলচন্দ্র পালিত। শতদল সরকার তাঁর সংস্পর্শে এসে বাঁকুড়া জেলার প্রায় অধিকাংশ থানাতেই কাজ করেন।

ক্রমে পরিচয় হয় তাঁর লাবণ্যলতা চন্দের সঙ্গে। তাঁরই প্রেরণায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মে প্রবৃত্ত হন। শতদল সরকার আহ্বান করেন 'বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন' ১৯৩৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি। তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতিব সম্পাদিকা। সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন লাবণ্যলতা' চন্দ। ১৯৩৮ সালেব মাচ মাসে লাবণ্যলতা চন্দেব নির্দেশমতো তিনি গুম্‌টে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় গঠন করেন; তিনিই তার প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় গোপনে প্রচারের কাজ চলতে থাকে। শতদল সরকারেব ঘরেব মধ্যে ভাগবত মিশ্র ঐ প্রচারপত্র ছাপার কাজ করতেন। পুলিস সন্দেহ করেছে কিন্তু বার বাব হানা দিয়েও হদিস করতে পারেনি।

বালবিধবা শতদল সরকার তার জীবনকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সার্থক ক'রে তোলেন।



মাতঙ্গিনী হাজরা



মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, মতান্তরে ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

মাতঙ্গিনী দেবী মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগ্‌লা গ্রামে এক মাহিষ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস মাইতি ও মাতা ভগবতী দেবী। মাতঙ্গিনী দেবীর পিতা একজন সাধারণ দরিদ্র কৃষক ছিলেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, কিন্তু আরো দুটি কন্যা ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী বাল্যকালে দরিদ্র পিতৃগৃহে শিক্ষার কোনো সুযোগ পান নাই। বালিকা-বয়সে পার্শ্ববর্তী আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিধবা হন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

বিধবা হবার পর প্রথমে তিনি কিছুদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। পরে স্বামীর ভিটার অদূরে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে ধর্মের পথে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপন করেন। ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'রে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। তমলুকের রামকৃষ্ণ-মিশন এবং সেখানকার সাধুদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে।

পর পর কয়েকটি জাতীয় আন্দোলনের ফলে ১৯৩০ সালে মেদিনীপুরের জনগণ রাজনৈতিক চেতনায় এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, নরনারী নির্বিশেষে যেন প্রতিটি মানুষ নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিতে উন্মুখ ছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে এসেছিল লবণ-আইন ভঙ্গ ও আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ। দলে দলে নরনারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গেছেন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পুলিসের নির্মম নির্যাতন, নারীর উপর বীভৎস অত্যাচার, শস্য পুড়িয়ে দেওয়া, বাড়ীঘর জালিয়ে দেওয়া, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন সবই অকাতরে সহ্য করেছেন মেদিনীপুর-বাসীরা ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আন্দোলনে।

মাতঙ্গিনী হাজরাও ব'সে থাকতে পারেননি। আপন হৃদয়ের তাগিদে বেরিয়ে এলেন তিনি আন্দোলনে ঝাপ দিতে।

১৯৩১ সালে তাঁর বাড়ীর সামনে তাঁদেরই জায়গায় একটি স্বেচ্ছাসেবক-শিবির স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্থানীয় কর্মীরা প্রভাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর একটি শোভাযাত্রা বের করেন। কয়েকটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করতে করতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে যাচ্ছিলেন। মাতঙ্গিনী দেবীর কুটিরের সামনে দিয়ে যখন শোভাযাত্রা অগ্রসর হয় তখন তিনিও একটি শঙ্খ বাজাতে বাজাতে তাঁদের সঙ্গে যোগদান ক'রে ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন। জীবনের একটি শুভক্ষণে সেদিন তিনি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঐদিন থেকে ঘটেছিল। বাত-রোগের জন্য অনেকবছর যাবৎ তিনি আফিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করার পর থেকে তিনি আর কখনো আফিম খান নাই। এতকালের অভ্যস্ত নেশার জন্য যখনই তাঁর কষ্ট হ'ত তখনই তিনি 'গান্ধীজী' 'গান্ধীজী' 'গান্ধীজী' ব'লে তিন গণ্ডুষ জল পান করতেন। তাঁর নেশার কষ্ট অচিরে দূর হয়ে যেতো। এতবড় মনোবল এবং গান্ধীজীর প্রতি এমন অটুট নিষ্ঠা ছিল তাঁর। বাতরোগে আর কখনো তাঁর কষ্ট হয় নাই।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। আলিনান লবণ-কেন্দ্রে লবণ 'প্রস্তুত ক'রে তিনি আইন অমান্য করেন। পুলিস তাঁকে অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার ক'রে অনেকদূর পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পথিমধ্যে ছেড়ে দেয়। ঐ বৎসর তমলুক থানার

'চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ' আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের সময় তমলুক শহরে একবার বাংলার গভর্নর দরবার করেন। মাতঙ্গিনী দেবী একটি শোভাযাত্রায় যোগদান ক'রে "গভর্নর ফিরে যাও" ধ্বনিসহকারে দরবারের দিকে অগ্রসর হন। পুলিস তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁকে বহরমপুর জেলে বন্দী রাখা হয়।

মুক্তির পর আরো ঘনিষ্ঠভাবে তিনি কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। তিনি নিয়মিতভাবে সুতো কাটতেন এবং খদ্দর ব্যবহার করতেন। তখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রায় সব কাজেই তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেতো। ১৯৩৩ সালে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি অবৈধ থাকাকালীন তমলুক থানার শ্রীরামপুর গ্রামে একটি 'মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুলিস বেপরোয়া লাঠি-চার্জ করে। এই সম্মেলনে মাতঙ্গিনী হাজরা প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন প্রায় ১২ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে। ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা-সম্মেলনেও তিনি প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়ে যোগদান করেন।

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। দরিদ্রের প্রতি স্নেহ তাঁর সুবিদিত ছিল। পাড়ায় কেউ অভুক্ত আছে জানতে পারলে তখনি ব্যস্ত হ'য়ে তিনি তার আহারের ব্যবস্থা করতেন। আশেপাশের গ্রামে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের সময় তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে রোগীর সেবা করতেন। গ্রামের লোকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'গান্ধীবুড়ী' নামে অভিহিত করেছিল। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাসের তাঁর অন্ত ছিল না। এমনকি অসুখ করলেও তিনি ওষুধ খেতেন না। গান্ধীজীর নামে 'সিন্নীজল' খেতেন—তাতেই নাকি তাঁর অসুখ সেরে যেতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের দমননীতি মেদিনীপুর-বাসীদের দ্রুত বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সভা-সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। যুদ্ধ-তহবিলে টাকা দেবার জন্য ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর ভয় দেখিয়ে চাপ দেওয়া হ'তে থাকে। নৌকা, বাইসিকেল, বাস সব নষ্ট ক'রে বা সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সবকিছুই জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে মরিয়া হয়ে উঠবার প্রেরণা দিয়েছিল।

বোম্বাইতে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করার

পর এবং নেতাদের গ্রেপ্তারের পর মেদিনীপুরের অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হয়। প্রতিটি থানাকে তাঁরা স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করেন। মহিষাদল থানার সামনে প্রায় কুড়িহাজার লোকের মিলিত এক সভা যখন তাদের স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করে তখন তমলুকের এস.ডি.ও. সভার বক্তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করার অদেশ দেয়। কিন্তু জনতা রুখে দাঁড়ায়। এস.ডি.ও. তখন লাঠি-চার্জের হুকুম দেয। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কনেস্টবলগণ লাঠি-চার্জ না ক'রে, চুপ ক'রে দাঁড়িযে থাকে। এস.ডি.ও. সদলবলে পালিয়ে বাঁচল।

তমলুক মেদিনীপুরের একটি মহকুমা। মাতঙ্গিনী দেবী এই মহকুমারই নারী। তাই এখন তমলুকের কথায় আসছি। এখানে তখন ছাত্ররা বহু স্কুল বন্ধ ক'রে দিযেছে। সংগ্রামে সংকট আশঙ্কা ক'রে কংগ্রেস-কর্মিগণ মহকুমাব্যাপী জাতীয ডাক-বিভাগ খুলে ফেলেন। অন্যান্য মহকুমার সঙ্গে তাঁবা যোগাযোগ রাখলেন। যতবাব সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে ততবারই আবো অধিক সংখ্যায শিবির পুনর্গঠিত হযেছে। সরকাবী অফিস ও আদালত প্রভৃতি বযকট করা হয়। ক্রমে জনগণ সরকারী আসন দখল করার জন্য অসহিষ্ণু হযে ওঠে। তখন কর্মিগণ একটি সভায স্থিব করেন যে, ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বব তাবিখে তাঁরা থানা, কোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী কেন্দ্র আক্রমণ ও দখল করবেন। প্রায একলক্ষ নরনারী এই সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রে কংগ্রেস-কর্মিগণ বড বড গাছ ফেলে বাইরে থেকে তমলুক আসবাব প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ ক'রে দিলেন। ২৭ মাইল ব্যাপী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওযা হ'ল; খেযা-পারাপারের নৌকা ডুবিয়ে দেওযা হয়।

তমলুক মহকুমার তিনটি থানা—তমলুক, মহিষাদল ও সূতাহাটা একসঙ্গে আক্রমণ করা হ'ল ২৯শে সেপ্টেম্বর। কেবল নন্দীগ্রাম থানা পরের দিন আক্রমণ করা হয়েছিল। নিহত ও আহত বীরগণ শরীরের সম্মুখভাগে গুলীর আঘাত বহন ক'রে সম্মুখ সংগ্রামে আত্মপরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে সাতদিন পর্যন্ত যা পুড়িয়ে বা ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে একটি থানা, দুটি ফাঁড়ি, দুটি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, তেরোটি ডাকঘর, নয়টি ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, দশটি

পঞ্চায়েত অফিস, বারোটি মদের দোকান, চারটি ডাকবাংলো, মহিষাদল রাজ-এস্টেটের তেরোটি অফিস। বিপ্লবীরা তেরোজন সরকারী ও পুলিস অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন এবং সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ করবেন এই প্রতিজ্ঞা করাতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের মেদিনীপুর জেলার ঘটনা জাতির জীবনে অবিস্মরণীয়।

পাঁচদিক থেকে পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা তমলুক শহরের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে বেলা তিনটার সময়। শোভাযাত্রায় অসংখ্য মহিলা ছিলেন। তমলুক শহর সুরক্ষিত দুর্গের মতো সাদা ও কালো সৈন্যে ছেয়ে গিয়েছিল। শহরের দিকে যাবার প্রতিটি রাস্তা লাঠি-ধারী সিপাহী ও রাইফেল-ধারী সৈন্যদ্বারা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছিল। শোভাযাত্রিগণ অহিংস ও শান্ত ছিলেন।

পশ্চিমদিক থেকে আটহাজার বিপ্লবীসহ এক শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। তাঁরা থানার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড লাঠি-চার্জ আরম্ভ হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আহতদের মধ্যে কয়েকজন মরিয়া হয়ে থানার দিকে ছুটে যান। থানা থেকে গুলী চলে। একজন তৎক্ষণাৎ নিহত হন। আহতদের মধ্যে সংজ্ঞাহীন রামচন্দ্র বেরাকে বন্ধুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সৈন্যগণ থানার সামনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। বুলেট-বিদ্ধ, রক্তাক্তদেহ রামচন্দ্র বেরা একসময় জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি অতিকষ্টে বুলেটে-ঝাঁঝরা-হওয়া দেহটাকে থানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন, তারপর সগর্বে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"আমি থানায় পৌঁছে গেছি, থানা দখল করা হয়ে গেছে।" বিজয়ীবীর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইভাবে সেদিন পাঁচটি দল অগ্রসর হ'তে থাকে তমলুক শহরের দিকে। প্রতিটি দলের হাজার হাজার কর্মীর শোভাযাত্রার উপর লাঠি-চার্জ ও গুলীবর্ষণ চলেছিল।

উত্তরদিক থেকে আসছিল যে বিপুল বাহিনী তার মধ্যে চলেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। বাহাত্তর-বর্ষীয়া বৃদ্ধা থানা দখল করতে চলেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দলের পিছনের দিকে মহিলাদের রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহীদল তমলুক দেওয়ানী আদালতের নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীদল গুলীর ফোয়ারা ছাড়তে আরম্ভ করে। বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে মাতঙ্গিনী দেবী মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন।

তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল বীরাঙ্গনার প্রতিভা। তিনি জাতীয় পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে এসে বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন—"করব অথবা মরব, হয় জয় না-হয় মৃত্যু, তোমরা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কি বলবে?" তাঁর আহ্বানে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীরা ফিরে দাড়ালেন এবং মাতঙ্গিনী দেবীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল-ভাবে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। রক্ষীদল তখন বেপরোয়া গুলীবৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। মাতঙ্গিনী দেবী জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে অগ্রসর হন। পশ্চাতে রয়েছে পাঁচহাজার আবালবৃদ্ধ নর নারীর বিশাল নিরস্ত্র বাহিনী। সৈন্যরা তাঁকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়ল, অব্যর্থ গুলী এসে তাঁর দুখানা হাতই বিদ্ধ ক'রে দেয়। হাত স্খলিত হ'ল কিন্তু জাতীয় পতাকা বীরাঙ্গনার গুলীবিদ্ধ হাতে সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে উড়তে থাকল। মাতঙ্গিনী দেবী অকম্পিত পদে এগিয়ে চললেন। ভারতীয় সৈন্যদের আহ্বান ক'রে ব'লে চলেছেন তিনি—"ভাইয়ের বুকে গুলী চালিওনা, তোমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান কর।" তার উত্তরে আর একটি গুলী এসে তাঁর কপাল ভেদ ক'রে চলে গেল। ভূলুণ্ঠিত রক্তাপ্লুত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তখনো উঁচু হয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা। সরকারী সৈন্য ছুটে এসে তৎক্ষণাৎ সেই জাতীয় পতাকা ধুলায় লুটিয়ে দেয়। শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার পুণ্যদেহের পশ্চাতে ছড়িয়ে পড়েছিল অমনিতর আরো কয়েকজন শহীদের গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ। তাঁদের নাম—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩), পুরীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত (৩৩) এবং জীবনচন্দ্র বেরা (১৮)। বহু আহত বীর রক্তাক্ত কলেবরে সেদিন ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। নারীরা ছুটে গেছেন আহতদের সেবা করতে। পুকুর থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল আনতে গেলে, সৈন্যরা বন্দুক উঁচিয়ে তাঁদের বাধা দিতে এল। একজন নারী চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন—"আমাদের তোমরা গুলী ক'রে মেরে ফেলতে পার—কিন্তু ভয় দেখিয়ে বাধা দিতে পারবে না।" সৈন্যরা গুলী করতে নিরস্ত হয়।

মেদিনীপুরে এইভাবে চলেছিল সেদিন শহীদের আত্মবিসর্জনের বিনিময়ে বিদেশী শাসনের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। মাতঙ্গিনী দেবীর অপূর্ব আত্মাহুতির সেই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত কয়টির দিকে চেয়ে স্বতঃই মনে আসে—

"শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে

সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

ওগো ভারতের গরীয়সী জননী মাতঙ্গিনী দেবী, তুমি আমাদের শতকোটি প্রণাম গ্রহণ কর!



সুচেতা কৃপলানী



১৯০৮ সালের ২৬শে জুন সুচেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাবের স্থায়ী বাসিন্দা। সুচেতা দেবী লাহোরে লেখাপড়া শেখেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এম.এ. পাস করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের সময় তিনি বিহারের গ্রামে মাসের পর মাস রিলিফের কাজ করেছেন।

১৯৩৬ সালে আচার্য জে. বি. কৃপলানীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আচার্য কৃপলানী সেই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

১৯৩৯ সালে সুচেতা কৃপলানী নিখিল ভারত কংগ্রেসের মহিলা-সাব-কমিটির সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। প্রায় বছর দেড়েক তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগেরও সম্পাদিকার কাজ করেন।

১৯৪০ সালে গান্ধীজী-পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান

ক'রে তিনি কারাবরণ করেন। সেখান থেকে মুক্তি পাবার কিছুদিন পরই ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ হয়। যদিও প্রায় সমস্ত নেতাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায় কিন্তু সুচেতা কৃপলানী প্রায় দুই বছর যাবৎ পুলিসের হাত এড়িয়ে পলাতক অবস্থায় থেকে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা ক'রে যান। অবশেষে তিনিও গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান।

বেরিয়ে এসে তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ফাণ্ড'-এর তিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয়ে যায় একতরফা। সেখানকার সংখ্যালঘুদের অধিকাংশের বাড়ীঘর পেট্রলের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের লাঞ্ছিত ও ধর্মান্তরিত করা হয়, হতাহতের সংখ্যাও হয় আতঙ্কজনক। দাঙ্গার পর সুচেতা কৃপলানী ছুটে যান নোয়াখালিতে দাঙ্গাপীড়িত শিশু ও নারীকে উদ্ধার করতে ও অভয়দান করতে। কতবার কত জায়গায় এমন হয়েছে—অসং প্রকৃতির বহু লোকের দল তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে, তাঁকে ঘিরে ফেলবার উপক্রম করেছে, হাসি বিদ্রূপ করেছে—তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়েছেন, ভয়ে লোকগুলি সরে গেছে। যখনই খবর পেয়েছেন, কোনো বাড়ীতে অপহৃতা নারী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি সামান্য দু'একজন জনসেবক কর্মী সঙ্গে নিয়ে, বহু লোকের বাধা সত্ত্বেও বাড়ীতে ঢুকে পড়েছেন, দুঃস্থা নারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেন। তাঁর অসীম সাহসিকতার কাজ নোয়াখালির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। কখনো কোমর অবধি জল ভেঙে, কখনো-বা একাই চলে গেছেন তিনি অজানা গ্রামের অভ্যন্তরে অসহায় নারী ও শিশুদের উদ্ধারের প্রেরণায়। নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত, ভীত, আর্ত নারী বিনাবাক্যে নিঃশব্দে শুধু দূর থেকে তাঁকে দেখেই তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলে এসেছিল দলে দলে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায়। বিভিন্ন ক্যাম্পে এনে তিনি তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দিয়েছেন হাজারে হাজারে। অবিভক্ত ভারতের সেই সংকটতম সন্ধিক্ষণে নির্ভীক নারী সুচেতা কৃপলানীর এই হৃদয়-নিঙড়ানো সেবা ও দান কি ভুলবার?

তারপরেই মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালিতে প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার করতে চলে গেলেন, সুচেতা কৃপলানীও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন শান্তি-স্থাপন ও পুনর্বাসনের কাজে।

বাংলা কংগ্রেসের এবং বাইরেরও অনেক মহিলা ও পুরুষ কর্মী নিয়ে সুচেতা দেবী নোয়াখালির বহু গ্রামে শিবির স্থাপন করেছিলেন গ্রামের লোকেদের মনে সাহস ও শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য। কর্মীবৃন্দের সাহায্যে তিনি নোয়াখালির গ্রামগুলিতে একদিকে রিলিফের কাজ, অন্যদিকে শান্তি-প্রতিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ও পুনর্বাসনের কাজ ক'রে চলেছিলেন অক্লান্তভাবে দীর্ঘদিন।

সেদিন নোয়াখালিতে মহামানব গান্ধীজী চলেছেন খালি-পায়ে গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা ক'রে, অহিংসা ও প্রেমের বাণী ছড়িয়ে। সেই মহাবাণী কেউ শুনেছে, কেউ শোনেনি। গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষিত প্রেম ও অহিংসাপূত বৃহত্তর সভ্যতা আনবার তিল তিল সাধনা একদিন সত্যই সফল হবে, এই বিশ্বাসই সেদিন জেগে উঠেছিল নোয়াখালির মাটিতে গান্ধীজীর কর্মীদের অন্তরে। সুচেতা কৃপলানী সেই কর্মীদেরই একজন। তাঁর কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে এই সুরই বেজে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালের প্রথমভাগে যখন পাঞ্জাবে দাঙ্গা হয়, সুচেতা দেবী সেখানেও ছুটে যান আর্তের সেবা করতে। ভারত-বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শরণার্থীগণ যখন দিল্লী, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে কাতারে কাতারে চলে আসেন তখন সুচেতা কৃপলানী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন।

যেখানেই আর্তের আর্তনাদ ও হাহাকার সেখানেই সুচেতা দেবী ত্রস্তপদে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধুভাবে। দরদী এবং কর্মদক্ষ সুচেতা দেবীর এই পরিচয় ভারতবাসী বার বার পেয়েছে।

বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীরূপেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন।



বেলা মিত্র



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী বেলা বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক দেশ তাঁর ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। পিতা সুরেশচন্দ্র বসু।

যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে ১৯৩৬ সালে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পিতার বাড়ীর আবহাওয়া, এবং বিশেষ ক'রে নেতাজীর প্রভাব গ'ড়ে তুলেছিল তাঁর চরিত্রকে। দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর কন্দরে। শ্বশুরালয় যশোহরে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন একটি মহিলা-সমিতি ১৯৩৮ সালে।

১৯৪০ সালে রামগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশন। নেতাজী তখন মূল কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন। রামগড়ে ঐ কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি নেতাজী আহ্বান করেন এক আপোষ-বিরোধী সম্মেলন। সেই সম্মেলনে নারীবাহিনীর কমাণ্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯ বছরের মেয়ে বেলা মিত্র।

১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারি রাত্রি ১২টার পর নেতাজী স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেন। নেতাজী যখন পূর্ব-এশিয়ায় তখন তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকটি দলকে বিভিন্ন পথে ভারতবর্ষে প্রেরণ

করেন। তারই একটি দল সাবমেরিনে এসে উড়িষ্যার উপকূলে কোনারক মন্দিরের কাছে নিরাপদে নামেন। এই দলের লোকেরা পূর্বনির্দেশমতো বেলার স্বামী হরিদাস মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। হরিদাস মিত্র যখন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তায় নিমগ্ন তখন নির্ভীক বেলা তাঁর সকল সংশয় ঝড়ের বেগে মুহূর্তে উড়িয়ে দিলেন। হরিদাস মিত্র কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। বেলা মিত্রের তত্ত্বাবধানে তাঁদের (হরিদাস মিত্রের) কলিকাতার বাসভবন থেকে হরিদাস মিত্র ও গুপ্ত-বিভাগের লোকেরা সিঙ্গাপুরে নেতাজীর কাছে ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথম ট্রান্স্মিটার যোগে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করেন ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারি। তাঁদের সংবাদ আদানপ্রদান চলে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের সঙ্গে।

ক্রমে বেহালার জঙ্গলের মধ্যে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে এই রেডিও-স্টেশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাঁরা সেখান থেকে গ্রেপ্তার হন। হরিদাস মিত্র প্রভৃতি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গুপ্ত-বিভাগের লোকেরা এই স্থানেই বাস করতেন।

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে হরিদাস মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। সেই সময় তাঁদের গোপন রেডিওতে খবর এসে পৌঁছায় যে, আরেকটি সাবমেরিনে আরো কিছু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোক আসছেন, তাঁদের সঙ্গে আছে প্রভূত অর্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র। তাঁদের উড়িষ্যার উপকূলে কোনারক মন্দিরের কাছ থেকে নামিয়ে আনতে হবে। হরিদাস মিত্রের গ্রেপ্তারের ফলে গুপ্ত-বিভাগের অন্যান্য লোকেরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁরা বিক্ষিপ্ত, সহায়সম্বলহীন। বেলা মিত্র এগিয়ে এলেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি তাঁর সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি ক'রে সেই অর্থ দিয়ে শত বাধাবিঘ্নের মধ্যে লোক পাঠিয়ে উড়িষ্যার উপকূলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবতরণের দু'দিন পরে সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যান।

সংবাদ আদানপ্রদানের সমস্ত যন্ত্রপাতি, দলিলপত্র ইত্যাদি নিরাপদে রাখবার দায়িত্ব এসে পড়ে বেলা মিত্রের উপর। তার মধ্যে কতকগুলি শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে কলিকাতা আলিপুর জেলে আবদ্ধ হরিদাস মিত্রের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আরো ২১ জন বন্দীর

ফাঁসীর আদেশ হয়। ১৯৪৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর হরিদাস মিত্র এবং তাঁর কয়েকজন সাথীর ফাঁসীর দিন ধার্য হয়। ভারতের অন্যান্য কারাগারে বাকী বন্দীরা ফাঁসীর অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর বেলা মিত্র ছুটে গেলেন পুনায় মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই ২২ জনের জীবনরক্ষার প্রার্থনা নিয়ে। গান্ধীজীর চেষ্টার ফলে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের ফাঁসী স্থগিত রইল। বেলাকে তিনি তিনমাস পুনাতে রেখে দিলেন।

তিনমাস ধ'রে গান্ধীজী এবং ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে বহু পত্র-বিনিময় ও বাদানুবাদ চলে এই বন্দীদেব জীবনরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে। গান্ধীজী হরিদাস মিত্র সম্বন্ধে ১৯৪৫ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর একখানি চিঠিতে লর্ড ওয়াভেলকে লিখেছিলেন—"I have perused the petition for mercy by the unlce of the condemned as also of Advocate Carden Noad. I suggést that they furnish cogent grounds for the exercise of mercy. In any event the case for mercy becomes irresistible in that the War with Japan is over. It will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect."

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আরও ২১ জন ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত বন্দীর মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য গান্ধীজী লর্ড ওয়াভেলকে ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর লিখেছিলেন—"I see from legal papers that there are others of the batch awaiting execution. The times when the sentences were pronounced were those of war when calmness was at a discount. Now they are changed. The war is over. The condemned men have, no matter what the cause of delay was, survived the war. Will it be too much if I suggest a reconsideration of all such cases in the shape of commutation of death sentences? In my opinion, justice to be real justice requires extention of mercy to temper it."

কয়েকমাস ধ'রে এমনি সব জোরালো যুক্তিতর্ক দিয়ে বহু চিঠিপত্র আদান-প্রদানের পর অবশেষে গান্ধীজী জয়যুক্ত হলেন। ২২ জন বন্দীরই মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হ'ল।

গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে বেলা হাসিমুখে ফিরে এলেন কলিকাতায়।

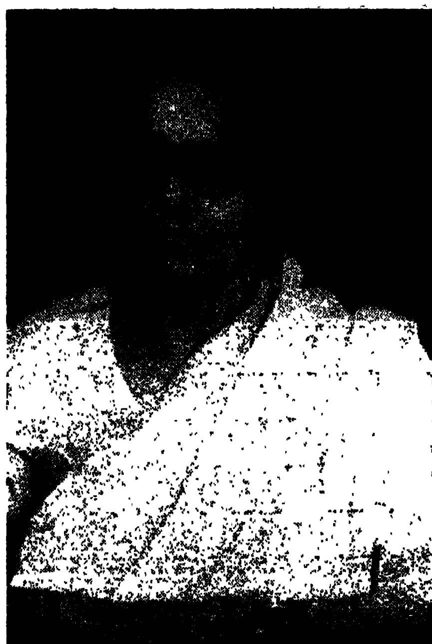
১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলা মিত্র গঠন করেন 'ঝাঁসীর রাণী' বাহিনী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর 'ঝাঁসী রেজিমেণ্ট'-এর আদর্শে। তিনি ছিলেন তার সর্বাধিনায়িকা। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৫০ সালে শিয়ালদা স্টেশনে এবং অন্যান্য কেন্দ্রে রিফিউজিদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৫২ সালের ৩১শে জুলাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সৈনিক বেলা মিত্র অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি যখন পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে শিয়ালদা স্টেশনে কাজ করছিলেন তখন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুসংখ্যক পরিবারকে বালি এবং ডানকুনি স্টেশনের মধ্যবর্তী অভয়নগর নামক স্থানে পুনর্বসতির ব্যবস্থায় সাহায্য করেন। বেলা মিত্রের মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে ঐ স্থানের 'বেলানগর' নামকরণ হয়। পরে ১৯৫৮ সালে তাঁর জন্মদিনে 'বেলানগর' নামে একটি নতুন রেলওয়ে স্টেশন ঐ স্থানেই নির্মিত হয়। ভারতবর্ষে ভারতীয় নারীর নামে রেলওয়ে স্টেশন এই প্রথম।

'বেলানগর' রেলওয়ে স্টেশন





মায়া ঘোষ



গণিতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও 'বীজগণিত'-প্রণেতা কে. পি. বসুর দৌহিত্রী মায়া ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিল্লীতে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর মাতা প্রিয়ম্বদা দেবী ও পিতা যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। মায়ার দু'বছর বয়সের সময় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়াকে মানুষ ক'রে তোলেন তাঁর মাতামহী মেঘমালা দেবী, কে. পি. বসুর স্ত্রী।

মেঘমালা দেবীর ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা তখন দিদি মেঘমালা দেবীর বাড়ীতেই থাকতেন। সেখানে তাঁদের সহকর্মী বন্ধুদের গোপন আনাগোনা ছিল। তাঁদের সকলের প্রতি এবং তাঁদের বিপ্লবী কাজের প্রতি মেঘমালা দেবীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। ফলে পুলিসের বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল এই পরিবারকে।

মায়া তাঁর জ্ঞান হওয়া অবধি একটা বিপ্লবী আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর এই মামাবাড়ীর সঙ্গে যুগান্তর-দলের বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবনলাল চ্যাটার্জী, নলিনীকান্ত কর প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ

সংশ্রব ছিল। এঁদের সংস্পর্শে এসে, এঁদের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী শুনে, এবং এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মায়ার মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। মায়ার ছোটমাসীমা বীণাপাণি মিত্রও বিপ্লবীদের গোপনে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি নিজে কখনো বিলিতী জিনিস ব্যবহার করতেন না এবং মায়াকেও দিতেন না।

১৯৩০ সাল থেকে সশস্ত্র বিপ্লব ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের দুই স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছিল বাংলাদেশ জুড়ে। ঐসব বিপ্লবীরা তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। মায়া ঘোষ তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি ছটফট্ করছিলেন, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ছোট বোন স্নেহলতা দত্তও (সেন) তখন তাঁদেরই বাড়ীতে থাকতেন। তাঁরও প্রবল ইচ্ছা কাজ করবার।

একদিন কংগ্রেস-নেত্রী মোহিনী দেবী এলেন তাঁদের বাড়ীতে। জিজ্ঞেস করলেন, মায়া ঘোষ প্রভৃতি জেলে যেতে রাজী কিনা। মায়া লাফিয়ে উঠলেন। লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিন বন্ধু—মায়া ঘোষ, স্নেহলতা দত্ত ও দীপ্তি ঘোষ, এবং পৌছলেন গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে।

শোভাযাত্রায় যোগদান করাতে পুলিস নিয়ে যায় তাঁদের লালবাজার। পরদিন ছেলেমানুষ ব'লে বিচারে তাঁরা মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে সেদিন কী দুঃখ তাঁদের! বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার কোনো পথই তাঁদের সামনে তখন খোলা ছিল না—বিপ্লবী দাদারা সবাই তখন জেলে। নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা মায়ার মনে বৃথাই কেঁদে ফিরল।

তাঁর বাবা বিয়ের চেষ্টা করাতে মায়া করলেন অনশন। বিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ১৯৩৬ সালে মায়া বি.এ. পাস করেন। ১৯৩৮ সালে বিপ্লবী নেতারা সবাই জেল থেকে মুক্তি পান। গুপ্ত আন্দোলনের দিন তখন শেষ হয়েছে। যুগান্তর-দলের নেতারা তখন গুপ্ত যুগান্তর-দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁদেরই মুখপত্র-স্বরূপ ছিল তখন 'মন্দিরা' মাসিকপত্রিকা। বিপ্লবী রসিকলাল দাস মায়া ঘোষকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'মন্দিরা'র সম্পাদিকা কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে। মায়া 'মন্দিরা'র কাজ করতে থাকেন প্রাণের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে। 'মন্দিরা'র কর্মীদের মনে তখন এই প্রেরণাই ছিল যেন 'মন্দিরা'র কাজ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ।

১৯৩৯ সালে বেধেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে বাড়ীর সকলের

অমতে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিয়ে মায়া চলে যান বীরভূমের রামপুরহাটে নিজের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। এবারের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান তাঁকে করতেই হবে।

তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্কুলে কাজ করতে করতে তিনি বীরভূমের গ্রামেব অভ্যন্তরে সম্প্রদায নির্বিশেষে জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর একটা ঘনিষ্ঠতা, একটা নিবিড় সংযোগের ফলে কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়ে উঠল।

ওদিকে মাযা ঘোষের কাছে মহকুমা-শাসকেব নির্দেশ এল যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা তোলার জন্য স্কুলে সিনেমাব টিকিট বিক্রি ক'রে দেবার। মায়া ঘোষ লিখে পাঠান যুদ্ধ-তহবিলের জন্য টাকা তুলে দেওয়া তাঁর আদর্শবিরুদ্ধ। তবুও চাকরী তাঁর গেল না।

১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের পূর্বেই ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি নেতাগণ আবার কারারুদ্ধ হন। ঐ আন্দোলনের মুখে মায়া ঘোষ কলিকাতা এলেন কমলা দাশগুপ্ত ও বীণা দাসেব সঙ্গে আলোচনা করতে, কিভাবে আন্দোলনের কাজ করা যায়। আলোচনার পব সিদ্ধান্ত হয় যে, যে যার জায়গায় গিয়ে কংগ্রেসেব প্রোগ্রাম অনুযায়ী আন্দোলনের কাজ করবার চেষ্টা করবেন।

মাযা ফিরে যান রামপুরহাটে। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রিগণ—প্রভাসিনী চক্রবর্তী, গুরুমা প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সিনেমা দেখতে গিয়ে বুলেটিনের মতো কংগ্রেসের প্রোগ্রাম বিলি ক'রে এলেন। মায়া ঘোষ সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করবার চেষ্টা করতে থাকেন। স্থানীয় কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। এতদিনে মাযা ঘোষের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে চলেছে। পরদিন শোভাযাত্রা যখন মায়া ঘোষের স্কুলের সামনে এসে থামল, তিনি বেরিয়ে এলেন তাতে যোগ দিতে—সঙ্গে এলেন স্কুলের আরো দুটি শিক্ষয়িত্রী—ঊষা মাহাভা ও মণিপ্রভা মুখার্জী। শোভাযাত্রা ছেলেদের হাই-স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাতে যোগ দেয় এসে ছাত্রের দল। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন বীরভূমের বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্মী লালবিহারী সিংহ ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যারাণী সিংহ, এলেন নীহারিকা মজুমদার।

রামপুরহাটের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল। বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে শহরে

ও গ্রামে। তাঁদের দমন করবার জন্য সেখানে আমদানি করা হয় সশস্ত্র পুলিসবাহিনী। শোভাযাত্রীদল ও সশস্ত্র বাহিনী পাশাপাশি চলতে থাকে ঐ ছোট্ট শহরেও।

৩১শে আগস্ট থানা দখল করা হবে স্থির হয়। মায়া ঘোষ সদলবলে আদালত বন্ধ করতে চলে যান। মহকুমা-শাসক ফৌজদারী আদালত বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেলেন। মায়া ঘোষের নেতৃত্বে কর্মীবাহিনী দ্রুত এসে সিভিল-কোর্টে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

ছেলের দলকে খাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মায়া ঘোষ ফৌজদারী আদালতের বারান্দায় ব'সে ছিলেন। পাশে বসে আছেন সাবিত্রী গান্ধী। এমন সময় সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে ফেললো। পুলিসবাহিনীর শ্বেতাঙ্গ অফিসার মায়া ঘোষকে সেখান থেকে হটাতে না পেরে, তাঁর দৃঢ়তা দেখে চলে যায় মহকুমা-শাসকের কাছ থেকে গুলী চালাবার অনুমতি চাইতে। অনুমতি মেলেনি। গ্রেপ্তারের আদেশ হয়। পুলিসবাহিনীর একজন এসে সাবিত্রী গান্ধীকে ধাক্কা দিয়ে বারান্দা থেকে নামিয়ে দেয়। মায়া ঘোষকে চারিদিক থেকে পুলিস ঘিরে ফেলে। দুজন লোক এমন শক্তভাবে তাঁর হাত ধরেছিল যে, অনেকদিন পর্যন্ত সেই কালসিটের কালো দাগ মিলিয়ে যায়নি। মায়া গ্রেপ্তার হলেন। সাবিত্রী গান্ধী তখনো তেজোময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। উদ্যত বন্দুকের সামনে জনতা নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যারাণী সিংহ দাঁড়ালেন এসে বন্দুকের সামনে। তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সাবিত্রী গান্ধীও।

মায়া ঘোষদের নিয়ে যায় সিউড়ি জেলে। সাজা হয় তাঁর একবছর দশমাস সশ্রম কারাদণ্ডের। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মায়া ঘোষ রাজসাহী জেল থেকে মুক্ত হন।

বেরিয়ে এসেই দেখেন তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়া। রিলিফের কাজ করতে লেগে যান তিনি বীরভূমের গ্রামগুলির মধ্যে।

১৯৪৫ সালে কস্তুরবা-ট্রেনিং নিতে চলে যান তিনি বম্বে।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি-দাঙ্গার পর নোয়াখালিতে গিয়ে রিলিফের কাজ করেন তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রামের অভ্যন্তরে।

অদ্যাবধি নীরবে সমাজসেবার কাজ ক'রে চলেছেন তিনি বীরভূমের গ্রামে গ্রামে। নিরলস, শ্রান্তিহীন তাঁর কর্মপ্রেরণা।

সন্ধ্যারাণী সিংহ



সন্ধ্যাবাণী সিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বালিযা জেলায়। উত্তরপ্রদেশেব মেযে হযেও তিনি কাজ করেছেন বাংলাদেশে। তাঁর বিবাহ হযেছিল বিহারের লালবিহাবী সিংহেব সঙ্গে। লালবিহারী সিংহ বীরভূমে স্থাযিভাবে বসবাস কবেন। তিনি বীবভূমেব প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্মী।

স্বামীর প্রেরণায অনুপ্রাণিত হযে সন্ধ্যাবাণী সিংহ স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ কবেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি বামগড কংগ্রেসেব স্বেচ্ছাসেবিকা হযে কর্মনিষ্ঠার পরিচয দেন। সেখান থেকে ফিবে এসে তিনি গ্রামে গ্রামে গিযে কংগ্রেসেব আদর্শ প্রচাব কবেন।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি যোগদান কবেন। সন্ধ্যারাণী সিংহ আধা-হিন্দী-মেশানো বাংলাভাষায মিষ্টি ক'বে কথা ব'লে বড সরকারী অফিসাব থেকে আবম্ভ ক'বে সহকর্মীদের পর্যন্ত হাসিব খোবাক যোগাতেন।

এই আন্দোলনের সময় সদলবলে বোলপুব কোর্টে গিযে তিনি বিচারককে বলেন—"এইবার দাদা, আপনি ওখান থেকে নেমে আসুন, আমবা গিযে বসব।" শেষপর্যন্ত তাঁরা বোলপুরের কোর্ট বন্ধ ক'বে দিতে সমর্থ হন।

তিনি রামপুরহাটে এসে সেখানকার কর্মী মায়া ঘোষের সঙ্গে মিলিত হন। রামপুরহাটের দেওয়ানী আদালতে গিযে প্রথমে তাঁবা জাতীব পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর ফৌজদারী আদালতের সামনে এসে ব'সে যান তাঁরা কোর্ট বন্ধ ক'রে দেবার জন্য। সশস্ত্রবাহিনী আসে তাঁদের বাধা দিতে। সাবিত্রী গান্ধীকে তারা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। প্রত্যেকটি কর্মী গুলীর সামনে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুকে তাঁদের অসীম বল, সাহসে মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁরা। পুলিস সেখান থেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়—সন্ধ্যারাণী সিংহ, মায়া ঘোষ, সাবিত্রী গান্ধী প্রভৃতিকে।

সন্ধ্যাবাণী সিংহকে একবছর তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রেখে দেয় তাঁকে রাজসাহী জেলে।

তিনি বর্তমানে ভূদান-যজ্ঞের কাজে লিপ্ত আছেন। নিজেদের প্রায় সমস্ত জমি তাঁরা ভূদান-যজ্ঞে দান করেছেন।



রাণী চন্দ



১৯১১ সালে (১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে) পূজোর সময় রাণী চন্দ মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি তাঁর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। কিন্তু দেশ চোখে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি, কারণ পদ্মানদী সেই তল্লাটই ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল।

বড় হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রশিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করতে। ধীরে ধীরে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলেন তিনি শান্তিনিকেতনের চিত্রশিল্পী ও লেখিকা রূপে। তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রিয় ছাত্রী।

অমন সাহিত্য ও শিল্পের পরিবেশের মধ্যে থেকেও তাঁর প্রাণ ভরলো না। তিনি শুনতে পেতেন শৃঙ্খলিত দেশমাতার গভীর ক্রন্দন। তখন দেশের যে অবস্থা ছিল তাতে তাঁর মতো হৃদয়ের সাড়া না দিয়ে চুপ ক'রে শুধু শিল্পচর্চা করা অসম্ভব ছিল। আপন অন্তরের তাগিদেই তিনি দেশসেবার কর্মক্ষেত্রে নেমে এলেন। তাঁর মনে হ'ত এ-কাজ না ক'রে তাঁর যেন উপায় নেই।

বরাবরই খদ্দর পরতেন তিনি। দেশের দরিদ্র সন্তানের হাতের কাজ যে! কংগ্রেসের কর্মীরূপে গঠনমূলক কাজ করতেন তিনি গ্রামের মধ্যে। গ্রামে চরকা পরিচালনা করা, স্কুল গঠন করা, হাতের কাজ শেখানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হ'তে শিক্ষা দেওয়ার কাজ ক'রে চলেছিলেন তিনি বহুদিন থেকেই।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সমগ্র বীরভূম যেন শিকড়সুদ্ধ কেঁপে উঠল। গঠনমূলক কাজে তখন আর তাঁর তৃপ্তি রইলো না। একেবারে সংগ্রামেব সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে একাই বেরিয়ে পড়লেন আপন হৃদয়ের প্রেরণায়। অন্যরাও অনেকে দ্রুত এগিয়ে এলেন আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। এগিয়ে না এসে তাঁরা সেদিন কেউ ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তাই রাণী চন্দের সঙ্গে এমনি ক'রে একে একে এসে যোগদান করেন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপলানী, শিল্পভনের ছাত্রী এলা দত্ত, শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ভবানী সেন, শ্রীভবনের শান্তি দাশগুপ্ত (বনলতা দাশগুপ্তেব দিদি) প্রভৃতি।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণকে আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান করেন। সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করতে করতে গ্রামবাসীদের নিকট থেকে যতই তাঁরা সাড়া পেলেন ততই আন্দোলন গভীরতর হয়ে দানা বেঁধে উঠল।

গ্রামবাসী সাঁওতালরাও এসে তাঁদের সভায় দলে দলে যোগ দিতে লাগলেন। গভর্নমেণ্টের পক্ষে এ-দৃশ্য স্থির হ'য়ে দেখা আর সম্ভব হয়নি। আন্দোলন-পরিচালনারত ঐসব কর্মীদের পুলিস একে একে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। রাণী চন্দের কারাদণ্ড হয় ৯ মাসের। নন্দিতা কৃপলানী, এলা দত্ত, ভবানী সেন, শান্তি দাশগুপ্ত প্রভৃতিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

দেশসেবিকারূপে দেশের লোকে রাণী চন্দকে পেয়েছিল সেদিন জনসাধারণের মধ্যে। সাহিত্যিকরূপে তিনি আজ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত ও সুপরিচিত। যে বইগুলি লিখে তিনি অবিসংবাদিত সুনাম অর্জন করেছেন তার মধ্যে প্রধান —'ঘরোয়া', 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'জেনানা ফাটক', 'পূর্ণকুম্ভ', 'হিমাদ্রি' প্রভৃতি। শুষ্ক জেল-জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি শিল্পীমনে কত যে রসসৃষ্টি করেছিল সেকথা লেখা আছে তাঁর 'জেনানা

ফাটক'-এ। 'পূর্ণকুম্ভ' নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল যখন ১৯৫৩ সালে বইখানি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত হয়।

১৯৩৩ সালে রাণী চন্দেব বিবাহ হয় বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অনিলকুমার চন্দেব সঙ্গে।



বনলতা সেন
(চক্রবর্তী)

*

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বনলতা সেন জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামে। পিতৃভূমিও ঐস্থানেই। তাঁর পিতা কালীপ্রসন্ন সেন ও মাতা সরোজিনী দেবী।

ছোটবেলা থেকেই তাঁদের পরিবারে একটা স্বদেশী পরিবেশ তিনি দেখে আসছিলেন। মায়ের কাছ থেকে স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের কাহিনী এবং ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কাহিনী তিনি তন্ময় হয়ে শুনতেন। বাড়ীর অনেকেই ১৯২১ সালে স্কুল-কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এবং ১৯২৯ সালে যতীন দাসের মৃত্যুর পর দেশব্যাপী যে শোক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তিনি দেশের কাজ করবার জন্য প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩০ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে চলেছিল গান্ধীজীর 'লবণ আইন আমান্য আন্দোলন'। বিপ্লবী আন্দোলনের গতিও সেইসময় প্রবল। চারিদিকের এই আবহাওয়া তাঁকে রাজনীতিক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করে। তিনি বিপ্লবী অনুশীলন-দলে যোগদান করেন।

কার্তিকপুর গ্রামে একটি ক্লাব ও লাইব্রেরি স্থাপনে তাঁর একটা প্রধান

অংশ ছিল। একটি মহিলা-সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টিটাগড ষড়যন্ত্র, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'মহিলা কর্মীসংঘ', 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' প্রভৃতিতে যোগদান ক'রে মহিলাদের মধ্যে তিনি কাজ করেন।

১৯৩৭ সাল থেকে তিনি 'বন্দীমুক্তি আন্দোলন', 'ছাত্র ফেডারেশন' প্রভৃতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 'অল বেঙ্গল গার্লস্ স্টুডেন্টস্ কমিটি'-র তিনি সম্পাদিকা ছিলেন।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন পৃথক কংগ্রেস পরিচালিত করেন—বনলতা সেন তাতে যোগ দেন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে তিনি শোভাযাত্রাসহ অগ্রসর হন। পুলিস লাঠি-চার্জ করতে থাকে। পুলিসেব লাঠির আঘাতে তিনি লাঞ্ছিত হন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রায় তিনবৎসর নিবাপত্তা-বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি আটক থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কারাবাসকালেই পরীক্ষা দিয়ে তিনি এম.এ. পাস করেন। মুক্তির পব অনুশীলন-দলের বিপ্লবী সরোজকুমার চক্রবর্তীব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয।

১৯৪৬ সালে কলিকাতার দাঙ্গার সময তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্তদেব মধ্যে রিলিফের কাজ করেন। নানা স্থানের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁর বন্দী-জীবনের একটি ছবি দেওয়া এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জেলখানা হচ্ছে গতিহীন স্থির জলের ডোবা। এখানে অনেকদিন থাকতে থাকতে সবকিছুই যেন একঘেয়ে হ'য়ে প'চে উঠতে চায়। রাজবন্দীবা ঐ বদ্ধজলকে প্রাণস্পর্শে সঞ্জীবিত করবার প্রয়াসে যতগুলি পন্থা অবলম্বন করতেন, তার মধ্যে পড়াশুনা ও আলোচনা একটা প্রধান স্থান অধিকার করত। কার্ল মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্ প্রভৃতির কঠিন কঠিন নানা বই পড়বার একটা আড্ডা ছিল প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল-ইয়ার্ডে। আড্ডার পাঠকবৃন্দ ঐ কঠিন পুস্তকগুলিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন। তর্ক এবং যুক্তি তখন জাল বিস্তার ক'রে সব-কয়টি পাঠককে জড়িয়ে ফেলত। জাল না-ছেঁড়া পর্যন্ত কারো মুক্তি ছিল না। ঐ তর্কজাল তাঁদের দিনের চিন্তা, রাতের ঘুম সবই বেড়ে ধরত। 'অ্যান্টি ডুহ্রিং' প্রভৃতি পুস্তকের প্রতিটি পঙ্‌ক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তার যুক্তি ও তর্ক বনলতা সেন মাঝে মাঝে এমনভাবে

মেলে ধরতেন যে, অন্যরা সেই জালে অজানিতে জড়িয়ে যেতেন। জাল ছিঁড়ে সাময়িক মুক্তি অবশ্য একসময় আসত মূল সন্ধানের একটা প্রবল চেষ্টার পর। তবু অনন্ত রহস্য অনন্তই র'যে যেতো। বনলতার যুক্তিবাদী মন তাঁর কারাজীবনের সতীর্থদের এমনি ক'রে আনন্দ পরিবেশন করত।



কিরণ চক্রবর্তী

★

১৯২১ সালে কিবণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ কবেন ঢাকা জেলাব নাবাযণগঞ্জে। দেশ তাঁদেব বিক্রমপুবেব পাইকপাডায। তাঁব পিতা হীবালাল চক্রবর্তী ও মাতা স্বর্ণপ্রভা দেবী। তাঁব বডমামা বমেশ আচায 'অনুশীলন' বিপ্লবী দলেব নেতা।

বযস বাডবাব সঙ্গে সঙ্গেই কিবণ চক্রবর্তী দেখলেন তাঁব মা কংগ্রেসেব কর্মী, খদ্দব ছাডা কিছু ব্যবহাব কবেন না, বিলিতী জিনিস বাডীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি নাবাযণগঞ্জ কংগ্রেস মহিলা-সমিতিব সম্পাদিকা ছিলেন। প্রত্যেকটি আন্দোলনের পুবোভাগে তিনি থাকতেন। কন্যা কিবণ ছিলেন তাঁব সকল কর্মেব বাহন। তা ছাডা তাঁর মামাবা সকলে প্রাযই কারারুদ্ধ থাকতেন। কিবণ চক্রবর্তীব ভাইবাও কাবাবরণ কবেছিলেন। ১৯৩০ সালেব আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁব দিদিমা বিধুমুখী দেবীও যোগদান কবেন।

নারাযণগঞ্জে তাঁদের বাডীব পাশেই তাঁর মামাবাডীটি বাজনৈতিক কর্মীদেব একটি আবাসস্থলে পরিণত হয। বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ঐ বাডীটি রাজনৈতিক কর্মীদেব একটি আশ্রয়স্থল হ'যে দাঁডাত। এই পারিপার্শ্বিকে কিরণ

যোগ দিলেন আর.এস.পি. নামক বিপ্লবী দলে। তিনি একটি লাইব্রেরি ও পাঠচক্র গ'ড়ে তোলেন। লাঠি-ছোরা খেলার ক্লাবও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ক্যাপ্টেন-রূপে শিক্ষা দিতে থাকেন। এইভাবে তিনি কর্মী-সংগঠন করেন।

১৯৪১-৪২ সালে কিরণ চক্রবর্তী স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় যখন তাঁর মামারা কারারুদ্ধ তখন আন্দোলন পরিচালনা করাব ভার স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপব এসে পড়ে; অন্তরীণ অবস্থায়ই তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। খুব প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে হ'লে তাঁকে বেশ-পরিবর্তন করতে হ'ত। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে একদিন যখন তিনি থানায় হাজিরা দিতে গেছেন তখন তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে দিনাজপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে।

আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়ে তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে থাকেন। কাজের পবিধি তখন আরো বেড়ে গেছে। পূর্ব্বে কাজ তো ছিলই, তা ছাড়া বস্তীতে গিয়ে বস্তীবাসীদের সচেতন করার কাজ তিনি হাতে নিলেন।

তখন তিনি নাবাযণগঞ্জের আর.এস.পি.-র কাযকরী সমিতির সদস্য। যেসব কর্মী তাঁর সঙ্গে কাজে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম—বাজু সেন, জ্যোতি সেন, প্রণতি সেন, অরুণা সেন, বকুল পাল, মণিকা চক্রবর্তী, কিরণ চক্রবর্তীর বোন প্রভৃতি।

এরপর শুরু হয় সাম্প্রদাযিক হাঙ্গামা। কাজের গতি হ'ল ব্যাহত। তারই পরে এল ভারত-বিভাগের প্রচণ্ড ভূমিকম্প—সহকর্মীরা কে কোথায বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেলেন কে জানে! কিরণ চক্রবর্তী নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে ছিট্‌কে এসে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর গঠনমূলক কর্মধারা এখনও অব্যাহত আছে।

নির্মলা রায় (সান্যাল) ও সুষমা রায় (চক্রবর্তী)



নির্মলা রায় ও সুষমা রায় দুই ভগ্নী। তাঁদের পিতার নাম মনোরঞ্জন রায়। নির্মলা রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামে। সুষমা রায়ের জন্ম হয় ১৯২৩ সালে ঐ গ্রামেই।

পিতা যদিও গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন কিন্তু তিনি বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মের জন্য তাঁকে দৌলতপুর কলেজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিদেশী শাসকদের হাতে পিতার বন্দীজীবনের নির্যাতনের কাহিনী তাঁরা জ্ঞান হওয়া অবধি শুনতেন এবং তাঁদের মন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠত। মায়ের কাছে পিতার কথা শুনে, তাঁর উদার আদর্শের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। আর একটু বড় হ'য়ে চোখের সামনে প্রজাদের প্রতি পিতার সস্নেহ ও উদার আচরণে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ভাবতেন বড় হয়ে ওদের দুঃখকষ্ট দূর না করতে পারলে জীবনের সার্থকতাই নেই।

নির্মলা রায় ১৯৩৭ সালে বি.এ. পাস ক'রে কলিকাতায় আসেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বিপ্লবী নেতা রমেশ আচার্য ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে এসে আর.এস.পি. দলের সভ্য হন। তিনি ছাত্রী-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন'-এর ছাত্রী-সাব-কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে বারাণসীতে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'-এর বার্ষিক সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির তিনি সভ্য নির্বাচিত হন। ছাত্রসমাজের মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা-বন্দীরূপে তিনবৎসর প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকেন। তাঁর গানের ঝরনা জেলখানার অন্যান্য বন্দিনীদের কাছে এক বিশেষ সম্পদ ছিল।

১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভের পরেও তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে পূর্বের ন্যায় কাজ করতে থাকেন। উত্তর-কলিকাতার নানা বস্তীতে তিনি নিরক্ষরতা দূর করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন।

১৯৪৫ সালে ভবেশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

সুষমা রায় ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলিকাতায় কলেজে পড়তে আসেন। সেই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তারপর তিনি পাটনা, খুলনা, রাজসাহী ইত্যাদি স্থানে ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদান করেন। এদিকে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আর.এস.পি.-র সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বস্তীতে কাজ করেন। আগস্ট-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে ১৯৪২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে আটক থাকেন এবং পরে বছরখানেক নিজ গ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দেয় তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে ছাত্রদের মুখপত্র 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তিনি গ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ছায়া গুহ



ছায়া গুহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলার আউটসাহী গ্রামে ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর। তাঁর পিতা সুনেত্রচরণ গুহ এবং মাতা শৈলবালা দেবী।

শিশুকাল থেকে মানুষ হয়েছিলেন তিনি বর্মাদেশে। তাঁর পিতা সেখানেই বসবাস করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প'ড়ে ছায়া গুহের মনে মানুষের প্রতি দরদ ও সেবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

১৯৩২ সালের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী বর্মায় বসে শুনতে শুনতে তাঁর মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগত। তিনি বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে কাজ করবার স্বপ্ন দেখতেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে একখানা চিঠিও লিখে ফেললেন। ছোট মেয়েটির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-ভরা চিঠি নেতাজীর হাতে পৌঁছেছিল কিনা কে জানে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের রাজভক্ত স্কুল 'ওয়ার ফাণ্ড' খোলে। ছাত্রী ছায়া গুহ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য ক'রে, দল বেঁধে ঐ ফাণ্ডে টাকা না দিতে রুখে দাঁড়ালেন।

বর্মাদেশে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বর্মীভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হওয়াতে, ছায়া রেঙ্গুনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প'ড়ে কলিকাতায় চলে আসেন ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। যে দেশের মাটি তাঁকে লালন পালন করেছে, তার উপর মায়া ছিল তাঁর অনেকখানি, হয়তো জন্মভূমির পরেই তার স্থান। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া আর তাঁর সম্ভব হয়নি।

কলিকাতায় এসে পরিচিত হন তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলের নেত্রী লীলা রায়ের সঙ্গে। যোগ দেন তিনি ঐ দলে। কাজের জন্য অন্তরের স্পৃহা এবারে সুযোগ পেয়ে নিজেকে সঁপে দিল।

১৯৪১ সালের শেষে বর্মাদেশে যুদ্ধের ঢেউ উঠল—জাপানের বোমা-বর্ষণ শুরু হ'ল। বর্মার প্রবাসী ভারতীয়গণ দিশাহারা হয়ে ছুটে আসতে লাগলেন ভারতের দিকে। কলিকাতায় জাহাজঘাটে ও হাওড়া স্টেশনে ছায়া গুহ সর্বস্বান্ত ও পথক্লান্ত ভারতীয়দের সেবা করতে ছুটে যেতেন।

অবশেষে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আহ্বান এল। পিছিয়ে রইলেন না ছায়া গুহ। তিনি নিষিদ্ধ সভা-সমিতিতে যোগদান করতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই আগস্ট নিরাপত্তা-বন্দীরূপে কারারুদ্ধ হলেন তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলখানার বন্দীদের তিনি মাতিয়ে রাখতেন তাঁর প্রাণস্পর্শ-করা গানে। মুক্তি পান তিনি ১৯৪৫ সালে। জেলের মধ্যে তিনি আই.এ. পাস করেন।

বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন বর্মা থেকে তাঁর বাবা মা সর্বস্ব হারিয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁদের প্রতি কর্তব্যবোধে কাজ নেন তিনি একটা স্কুলে।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি-দাঙ্গার পর তিনি কলিকাতার কর্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে চলে যান নোয়াখালিতে রিলিফের কাজ করতে।

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ছায়া গুহ কখনো উদ্বাস্তুদের মধ্যে রিলিফের কাজ করতেন, কখনো সরকারী আশ্রমে যেখানে অভাগা ভিক্ষুকদের আশ্রয় দেওয়া হয়—তাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে কাজ করতেন। কখনো শিশু-অপরাধীদের মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করেন তিনি সরকারের 'জুভেনাইল কোর্ট'-এ। এখানে দোষী বড় নয়, দোষকে ও তার কারণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান ক'রে, সাব্যস্ত দোষীকে সংশোধন করবার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে মানুষের সেবাকেই তিনি আপন জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

মেধা ঘোষ



১৯২৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহরে মেধা ঘোষের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মহতাব ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে অকালে দেহত্যাগ করেন। মেধার মাতা তাঁর একমাত্র সন্তানের পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র দেশ একটি বিপ্লবের স্রোতে প্লাবিত হচ্ছিল। তরুণ চিত্তে তখন নিজেরও অজ্ঞাতে বৈপ্লবিক আদর্শের একটা স্পর্শ লাগত। মেধা ঘোষও বাদ যান নাই।

১৯৪২ সালে তিনি বি.এস্.-সি. পডছিলেন। ওদিকে 'ভারত ছাডো' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তিনি উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে আন্দোলনে নেমে পডলেন। অর্থ সংগ্রহ করা, গোপন ইস্তাহার রচনা ও বিলি করা ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাজ ছিল। বি.ভি. দলের কর্মী রাতুল রায়চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত হ'যে তিনি প্রায় আডাই বছর আত্মগোপন ক'রে কাজ ক'রে যান। সেই কাজের জন্য যে মন্ত্রগুপ্তি-সাধনা, সাহস ও বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল—মেধা ঘোষের মধ্যে তা বর্তমান ছিল।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের এক গভীর রাতে তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করা হয়, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিস মেধাকে কোনো ষডযন্ত্রে জডাতে পারে নাই। অবশেষে নিরাপত্তা-বন্দীরূপে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখে।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাস করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর কাজও করতে থাকেন। ছাত্র-আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে তিনি নিজের সংগঠন-শক্তির পরিচয় দেন।

স্বাধীনতা আসার পর লণ্ডনে গিয়ে তিনি 'সোশ্যাল সায়েন্স' কোর্স-এর ডিপ্লোমা নিয়ে আসেন।

বর্তমানে তিনি 'খাপছাড়া' নামক সাপ্তাহিক কাগজের সহযোগী সম্পাদিকা।



মীরা দত্তগুপ্ত



১৯০৬ সালের ৫ই অক্টোবর মীরা দত্তগুপ্ত ঢাকা শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশ ঢাকা বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রামে। তাঁর পিতা শরৎকুমার দত্তগুপ্ত।

তাঁর পিতামাতা মনেপ্রাণে স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে বিদেশী দ্রব্যের স্থান ছিল না। এই পারিপার্শ্বিকে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ব'লে সহজেই মীরা দত্তগুপ্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

তিনি ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বি ভি নামক বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। 'বেণু' পত্রিকার মহিলা-বিভাগের ভার ছিল মীরা দত্তগুপ্তের উপর। ঐ কাগজ পরিচালনা করবার দায়িত্বের একটা অংশও ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর। কিছুদিন তিনি 'দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্রীসংঘ'-র সম্পাদিকা ছিলেন। পরে তিনি ছাত্র-আন্দোলনের প্রকাশ্য কাজ ত্যাগ ক'রে গুপ্তদলের নীরব কাজে ব্রতী হন।

তাঁর পিতা বড় সরকারী অফিসার ছিলেন, কাজেই পুলিস বহুকাল বিশ্বাসই করতে পারে নাই যে, ঐ বাড়ীটি বিপ্লবীদলের একটি গোপন কেন্দ্র।

সেখানে গোপন ইস্তাহার, জরুরী কাগজপত্র ও অস্ত্রাদি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত।

১৯৩১ সালে দলের নির্দেশে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা-বিভাগের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় সম্পূর্ণ বেতনই তিনি দলের কাজে দিযে দিতেন।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দলের পলাতক বিপ্লবীদের গতিবিধির যোগসূত্র যাঁদের মাধ্যমে পরিচালিত হ'ত তাঁদের মধ্যে মীরা দত্তগুপ্ত ছিলেন অন্যতম। শুধু তাই নয়, সেসময় মেদিনীপুরে এবং অন্যত্র কিভাবে কাজকর্ম করতে হবে সে-আলোচনা করবার জন্য বরানগরে দলের যে জরুরী বৈঠক বসে তাতে মীরা দত্তগুপ্ত অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৩ সালে তাঁব গোপন গতিবিধি পুলিসের নজরে আসে। মেদিনীপুরে বার্জ-হত্যার পব তাঁদের বাড়ী বার বাব তল্লাসী ক'রেও কিছুই পাওয়া যায নাই।

১৯৩৪ সালে দার্জিলিং-এ লেবং-এর মাঠে গভর্নর অ্যাণ্ডারসনকে গুলী করা হয়। ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। সেই দলের কর্মী মীরা দত্তগুপ্তকে ইলিসিয়াম রো-তে নিযে গিযে পুলিস নানা প্রশ্ন করতে থাকে। পুলিস তাঁর বাবাকে জানায়—মেয়েকে বাংলাদেশের বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। দলের নির্দেশে মীরা পিতার কথা মেনে নিলেন। দুই বৎসর পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে গিযে রইলেন তিনি।

১৯৩৭ এবং ১৯৫২ সালে তিনি দুইবার বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কর্মলিপ্ত থাকেন এবং প্রচুর অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিপ্লবী সতীর্থদের হাতে দেন।

১৯৪৬ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সহকর্মীরা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করতে থাকেন। মীরা দত্তগুপ্তও 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর সভ্য হন।

দাঙ্গাপীড়িতদের সেবায়, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, আর্তত্রাণ-কল্পে, বাস্তুহারাদের সাহায্যে তাঁর সংগঠনমূলক কাজের অবদান অনেকখানি। ১৯৫৪ সালে সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা-মিশনের সভ্যরূপে তিনি বাংলার তরফ থেকে চীন পরিভ্রমণ করেন। শিক্ষাবিদ্ রূপেও তাঁকে দেশ পেয়েছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহ-অধ্যক্ষা।

অনিতা বসু



১৯৩২ সালের ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে অনিতা বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অম্বিকাচরণ বসুর বাড়ী ছিল ঢাকায় বিক্রমপুর পরগনার রাউতভোগ গ্রামে। এই পরিবারের গর্ব ছিল শহীদ বিনয় বসুকে ঘিরে। সম্পর্কে বিনয় বসু তাঁদের নিকট-আত্মীয়। শিশুকাল' থেকেই অনিতার মনোরাজ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের দিকে একটা প্রবল অনুরাগ ছিল।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পর থেকেই তিনি চারিদিকের রাজনৈতিক উত্তপ্ত হাওযার স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব করেন। তিনি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গঠন করেন 'স্বাতি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী'। তাঁরা প্যারেডও করতেন আবার নাচগানও করতেন। অনিতা বসু ধীরে ধীরে একটি ছোট গ্রন্থাগারও সংগঠন করেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে তবে সে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও যোগ্যস্থান অধিকার করতে পারবে।

বিপ্লবী যতীশ জোয়ারদার যখন ময়মনসিংহ শহরে 'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার কোর' প্রতিষ্ঠা করেন, অনিতা বসু তার 'ঝাঁসী-বাহিনী' শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি 'ফরওযার্ড ব্লক' দলে যোগদান করেন।

কলিকাতায় ভিয়েটনাম দিবস উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রা হয়। পুলিস নির্মমভাবে তার উপর গুলীবর্ষণ করে। প্রতিবাদে ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়; পুলিস ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে বহু ছাত্র ও তরুণদল শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

ট্রেজারি-গ্রাউণ্ডে পুলিসের অবরোধ ভেঙে জনতা ভিতরে ঢুকে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা মাটিতে বসে পড়েন। বন্ধুদের মুক্তি না দিলে তাঁরা উঠবেন না, এই তাঁদের পণ। উত্তেজিত জনতার ইট-পাটকেল ও পুলিসের গুলীবর্ষণ চলতে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রছাত্রীর দল খাঁটী সত্যাগ্রহীর মতো যথাস্থানে বসে রইলেন।

পুলিসের গুলীতে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র অমলেন্দু ঘোষ অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন 'আজাদ হিন্দ্ ভলান্টিয়ার্স'-এর প্লেটুন সার্জেন্ট। তারপর পুলিসের গুলীতে অনিতা বসু ধরাশায়ী হন। তাঁর দুটি পা-ই গুলীবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার ক'রে তাঁর পায়ের গুলী বের করতে হয় এবং দুইমাস হাসপাতালে থাকতে হয়। তারও প্রায় সাতমাস পরে তিনি সুস্থ হন। এঁরা দুজন ছাড়া, লক্ষ্মী দাস, মণ্টু সেন, ভোলা মিত্র ও দোলন গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন।

অনিতা বসু পরে শরৎচন্দ্র বসুর এস্.আর.পি. দলে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে তিনি বি.এ. পাস করেন।

বর্তমানে তিনি 'সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ'-এর সম্পাদিকা এবং 'আজাদ হিন্দ্ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস'-এর সভ্য।

উমা সেন (দাশগুপ্ত)



১৯১৬ সালের ১৮ই অক্টোবর উমা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে। তাঁর পিতা সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও মাতা বিনয়লতা সেন। তাঁর উপর তাঁর দাদা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব ছিল অনেকখানি। ১৯৪৪ সালে উমা সেন এম.এ. পাস করেন।

১৯২৭-২৮ সালে মেদিনীপুরে এলেন তরুণ বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। তিনি 'বেণু' পত্রিকার মাধ্যমে আনলেন একটা নতুন তরঙ্গ। উমা সেনের কিশোর মনের উপর কাগজখানির লেখাগুলি গভীর রেখাপাত করে। বিপ্লবী সত্যভূষণ গুপ্ত, হেমেন গুপ্ত, শান্তিগোপাল সেন, জ্যোতিষ গুহ প্রভৃতি তাঁকে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। সেই বছরেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে উমা সেনের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও, সন্দেহক্রমে ইংরেজ সরকার তাঁর পিতা সত্যেন্দ্রনাথের ২৩ বছরের সরকারী চাকুরী এক কলমের খোঁচায় শেষ ক'রে দেয়। ছেলেমেয়ের জন্য পিতার সহ্য করতে হয় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অত্যাচার। দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং সন্তানদের লিখলেন, এই ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য দুঃখ না করতে। উমা সেনের ভাই অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে হন পলাতক, কিছুদিন পরে রাজবন্দী।

এই দুর্যোগের দিনে ১৭ বছরের মেয়ে উমা এগিয়ে আসেন পরিবারকে আর্থিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। দেশসেবার অপরাধে সেদিন আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁদের পরিত্যাগ করেছিল।

১৯৩৪ সালে তিনি পলাতক বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারকে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন কয়েকদিন। এই আশ্রয়দানের ফলে তাঁর মা, বাবা, এমনকি বৃদ্ধা দিদিমাকেও হাজত বাস করতে হয়েছিল। কিন্তু অবিচলিত মৌনতা দিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করেছেন।

পার্টির খবরের আদান-প্রদান, অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কিছু কিছু কাজের

দায়িত্ব ছিল উমা সেনের উপর। সর্বোপরি তিনি তাঁর দাদার স্থান হাসিমুখে পূর্ণ করেছিলেন পিতামাতার সমস্ত ভার বহন ক'রে।

১৯৪৬ সালে বন্ধু ও নেতৃবর্গ জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁদের সঙ্গে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন। নোয়াখালির দাঙ্গার পর, দাঙ্গাবিধ্বস্তদের মধ্যে গিয়ে তিনি লীলা রায়ের নেতৃত্বে সেখানে কিছুদিন কাজ করেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

শশীবালা দাসী

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রাম চলেছিল মেদিনীপুরে। বহু নারী সেই সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আত্মাহুতি দিতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে খুব কম নারীরই নাম আমরা জানতে পাই। শশীবালা দাসী মেদিনীপুব সদর মহকুমার কেশপুব থানার তোরিয়া নামক গ্রামের এক অজ্ঞাত অখ্যাত নারী। আগস্ট আন্দোলনের সময় এক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ক'রে তিনি থানা দখল করতে ছুটে গিয়েছিলেন কেশপুর থানার দিকে। শত্রুব গুলী এসে তাঁর অন্তিম শয্যা রচনা করেছিল রুধিরাক্ত ধারায়।

'মবণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মবি।'

সিন্ধুবালা দেবী

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সময় তিলজলা রেলওয়ে কেবিনের দেবেন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা দেবী নিজেদের রেলওযে কোয়ার্টার্সের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন যুগান্তর-দলের পলাতক বিপ্লবী অমর চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চক্রবর্তী এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে ১৯১৭ সালে।

তাঁরা এই আশ্রয় ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যাবার পর, পুলিস কোনো সূত্রে খবর পেয়ে দেবেন ঘোষকে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের সেই বাড়ীতে গ্রেপ্তার করে। তাঁর স্ত্রী সিন্ধুবালা দেবী সেসময়ে নিজেদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।

পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নিজে ইন্দাস চলে যান সিন্ধুবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করতে। সেখানে গিয়ে তিনি খবর পেলেন যে, ঐ গ্রামে দুইজন সিন্ধুবালা দেবী আছেন। কিন্তু একজনের নামে ওয়ারেণ্ট। পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তখন দুইজন সিন্ধুবালা দেবীকেই গ্রেপ্তার করে।

আসল সিন্ধুবালা সেসময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খুব বেশী দেরী ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং তাঁকে বাঁকুড়া জেলে আটক রাখে।

এই বর্বরতার জন্য ১৯১৭ বা ১৯১৮ সালে হুগলিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে তাব সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পবে তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ড্‌সে বঙ্গীয় বিধান-পরিষদে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

এইসব আন্দোলনেব ফলে এবং আসন্নপ্রসবা ছিলেন ব'লে সিন্ধুবালা দেবীকে মাসখানেক বাঁকুড়া জেলে আটক রাখার পব মুক্তি দেওযা হয় ১৯১৭ অথবা ১৯১৮ সালে।

বগলাসুন্দরী সোম

ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেতা সূর্য সোমের স্ত্রী বগলাসুন্দরী সোম ১৯২১ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান কবেন। বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী যখন পিকেটিং ক'রে কারাবরণ কবেন তখন মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদাব প্রভৃতি নেত্রীগণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। বগলাসুন্দরী সোম তাঁদের সঙ্গে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেদিনই পরে তাঁরা মুক্তি পান।

প্রভাবতী বসু

ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেতা সূর্য সোমের কন্যা এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী সুধীর বসুর স্ত্রী প্রভাবতী বসু ১৯২১ সাল থেকে ময়মনসিংহের কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সেখানকার মহিলাদের কংগ্রেসে যোগদানের প্রেরণা দেন। কংগ্রেসের সব আন্দোলনেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন।

ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর-দলের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে বিপ্লবীদের নিষিদ্ধ জিনিস ও কাগজপত্র তার হেপাজতে রাখা হ'ত।

কুমার-জননী লাহিড়ী

(পুটিয়া রাজসাহী)

এক জমিদার গৃহিণী হয়েও এবং তাঁর দুই ছেলের গ্রেপ্তারের পরেও তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্বস্ত প্রজাদের গৃহে তিনি বিপ্লবীদের গোপন ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর বাড়ীটি উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

বিপ্লবী সত্যরঞ্জন লাহিড়ী এবং জ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী তাঁর পুত্র।

সত্যরাণী দত্ত

(বরিশাল)

১৯৩০ সালে স্বামী সুরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সত্যরাণী দত্ত কলিকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং হাজত বাস করেন। তাঁর স্বামী ঐ মামলায় দীর্ঘমেয়াদী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

কমলা দাস

কমলা দাস তাঁর বাড়ীতে ১৯৩০ সালে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করতেন এবং অন্যভাবেও সাহায্য করতেন। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু প্রমাণ অভাবে মুক্তি দেওয়া হয়।

কমলা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়)

কমলা চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হিজলী ও অন্যান্য জেলে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের যুগান্তর বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। (তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় নাই।)

সুনীতি দেবী

সুনীতি দেবী ও তাঁর কন্যা মায়া দেবী উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের বিপ্লবীদলের কর্মী। সুনীতি দেবী অস্ত্র-আইনে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। পরে রাজবন্দীরূপে হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী থাকেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪—৩৭ সাল পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি।

মায়া দেবী

সুনীতি দেবীর কন্যা মায়া দেবী। কলিকাতায় একটি বোর্ডিং-এ অবস্থান-কালে ডিনামাইট প্রভৃতি সহ তিনি গ্রেপ্তার হন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। অস্ত্র-আইন অনুযায়ী মায়া দেবীর ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে তাঁকে তৃতীয়-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। থানা ও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর জেদ ভাঙতে সচেষ্ট ছিল। তারা তাঁকে এত যাতনা ও কষ্ট দেয় যে, তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। অবশেষে তাঁকে প্রথমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালে রাখা হয়। তাঁর মুক্তির তারিখ জানা যায়নি।

ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস

৺মহিমচন্দ্র বিশ্বাসের বিধবা পত্নী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে পলাতক হয়ে অবস্থান করছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণীন্দ্র দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত ও ব্রজেন সেনগুপ্ত। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে মিলিটারী সে-বাড়ী ঘেরাও করে। বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিটারী ও পুলিসের খণ্ডযুদ্ধ হয়। (খণ্ডযুদ্ধের বিবরণী কল্পনা দত্তের জীবনীতে দেওয়া হয়েছে।) বিপ্লবীবীর সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন গ্রেপ্তার হন। পরদিন প্রাতে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে। পলাতক বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা প্রভৃতিকে আশ্রয়দানের অপরাধে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বিপ্লবী বীরদের আশ্রয় দেওয়া যে সেদিন কী বিপুল গৌরব এবং কতবড় বিপর্যয় বহন ক'রে এনেছিল তা জানেন সেদিনের এইসব দুঃসাহসী আশ্রয়দাত্রিগণ।

অমিতা সেন

অমিতা সেন রাজবন্দীরূপে হিজলী জেলে ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। তিনি 'অনুশীলন' বিপ্লবীদলের কর্মী ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভ্রাতৃবধূ তিনি।

হাস্যবালা দেবী

(রুদ্রকর, ফরিদপুর)

ও

মায়া নাগ

(বারদী, ঢাকা)

হাস্যবালা দেবী এবং মায়া নাগ দুজনেই কাঁকুড়গাছি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। হাজতবাসের পর ১৯৩৩—৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন।

চারু চক্রবর্তী

চট্টগ্রামের 'অনুশীলন' দলের কর্মী চারু চক্রবর্তী রাজবন্দী হয়ে হিজলী জেলে ছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে।

নির্মলা চক্রবর্তী (ঘোষাল)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর নির্মলা চক্রবর্তী ১৩ বছর বয়সে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালে। চট্টগ্রামের শ্রীপুরে তাঁর পিতার বাড়ী

তল্লাসী ক'বে পুলিস একটি রিভলভাব এবং দলেব কিছু গোপন কাগজপত্র পায়। ফলে নির্মলা চক্রবর্তীব প্রতি দেড়বছব সশ্রম কাবাদণ্ডের আদেশ হয। তখন তাঁব ১৪ বছব বযস। পরে তিনি হিজলীতে দু'বছব রাজবন্দী ছিলেন। তাবপব একবছব স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাব পব পুলিস তাঁকে নিজের জেলা থেকে বহিষ্কাব ক'বে দেয।

নির্মলা দেবী ও নিরুপমা দেবী

(কদকব ফবিদপুব)

নির্মলা দেবী এবং নিরুপমা দেবী স্বগৃহে অন্তবীণ ছিলেন ১৯৩৭ সালে।

অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত (সেন) ও বাসন্তী দাশগুপ্ত (রায়)

অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত ও বাসন্তী দাশগুপ্ত পুরুলিযাব প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা নিবাবণ দাশগুপ্ত ও লাবণ্য দাশগুপ্তেব কন্যা। তাঁবা পিতাব অকৃত্রিম দেশ-সেবাব আদর্শে অল্পবযস থেকেই উদবুদ্ধ হন। অন্নপূর্ণা দাশগুপ্ত আবামবাগেব ১৯৩০—৩২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রিয অংশগ্রহণ কবেন। গ্রামেব কৃষকদেব মধ্যেও তিনি আন্দোলন পবিচালনা কবেন। ফলে দুইবাবে তিনি দেড়বৎসব সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আবামবাগেব কৃষক মেয়েদেব মধ্যে তাঁব সঙ্গে জেলে গিযেছিলেন বরদাময়ী দাসী।

অন্নপূর্ণা দেবী বর্তমানে গঠনমূলক কাজে এবং মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিযাদী বিদ্যালযেব কাজে নিযুক্ত আছেন।

বাসন্তী দাশগুপ্তকে তাঁব পিতা 'ঢাকা কল্যাণ কুটিব আশ্রমে' পাঠিয়ে দেন কংগ্রেস-কর্মীরূপে শিক্ষালাভ কবতে। তিনি ১৯৩০—৩২ সালের এবং ১৯৪২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ক'বে ঢাকায ও পুরুলিযায় চাববার কাবাববণ কবেন। মুক্তির পর 'ওযার্ধা মহিলা মণ্ডলে' গিযে তিনি নানা গঠনমূলক কাজ শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি সিংভূমের নিমডিহতে একটি আশ্রমের কাজ পরিচালনা ও গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন।

নীরব ও নিরলস কর্মী অন্নপূর্ণা দেবী ও বাসন্তী দেবী পিতার সুযোগ্য কন্যা।

চামেলী দেবী গুপ্তা

উত্তরপ্রদেশের চামেলী দেবী গুপ্তা ছিলেন একটি বীরাঙ্গনা। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি কলিকাতার 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'তে যোগদান ক'রে সভা ও শোভাযাত্রা করতেন, বড়বাজারে গিয়ে পিকেটিং করতেন। তাঁকে দেখলে লোকে বিলিতী বস্ত্রের দোকানের কাছাকাছি যেতেও সাহস পেতো না। তিনি জেলে যাবার পর তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে যায়। সরকার প্রস্তাব করে, বণ্ড লিখে দিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তেজোদ্দীপ্তা চামেলী দেবী বণ্ড লিখতে রাজী হলেন না। জেলেই তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শরীর তাঁর ক্রমশঃ এত খারাপ হয়ে যায় যে, সরকার বাধ্য হয়ে অবশেষে তাকে বিনাশর্তেই মুক্তি দেয়। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। কয়েকদিন পরেই মাতা ও পুত্র দুজনেরই জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এমনি ক'রে ভারতের নারী-সৈনিক সেদিন আপন ত্যাগ, বীরত্ব ও দৃঢ়তা দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিজয় ঘোষণা ক'রে গেছেন।

কুসুম বাগ্‌দী

মেদিনীপুরের কুসুম বাগ্‌দীর সাত মেয়ের পর এক ছেলে। দশমাসের সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু বাড়ীতে রেখে তিনি ১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান ক'রে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে গিয়ে তাঁর সন্তানকে খাওয়াবার জন্য অসহ্য কষ্টে তিনি ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। প্রথম রাতটাই তাঁর কেঁদে কেঁদে কেটে যায়। জেলের বন্দিনীরা অনেকেই এতে বিরক্ত হলেন—ছেলের জন্য এতই যদি কাঁদবে তবে জেলে এলে কেন? পরের দিন স্বামী ছেলে নিয়ে জেল-গেটে দিতে আসেন। কুসুম বাগ্‌দীকে জেল কর্তৃপক্ষ জেল-গেটে ডেকে এনে বলেন—"বণ্ড লিখে দিলে ছেলে পাবেন।" কুসুম বাগ্‌দী ছেলে না নিয়ে শূন্যহাতে বন্দিনীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন—"গান্ধীজীর কথায় জেলে এসেছি, আমি কি বণ্ড লিখে দিতে পারি?" বন্দিনীরা তাঁর নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

অম্বু

মেদিনীপুরের মধ্যে কাঁথির ৪ মাইল দূরে পিছাবনী গ্রাম। ১৯৩০ সালে

এখানে প্রথম লবণ সত্যাগ্রহ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। সে-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা মেদিনীপুরে। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে লবণ তৈরী ক'রে লবণ আইন ভাঙতে আরম্ভ করেন। পুলিসের নির্মম নির্যাতন শুরু হয়। লবণ-সত্যাগ্রহ দমন করবার জন্য পুলিস মারপিট করতে থাকে। সত্যাগ্রহী মেয়েদের অনেককে খালের জলে ফেলে দেয়। ক্রমে তাঁদের উপর অত্যাচার ব্যাপক হয়ে ওঠে। তারা ঘরবাড়ী তল্লাসী ক'রে ধান-চাল নষ্ট ক'রে দিতে থাকে। পিছাবনী গ্রামে এমনি ক'বে একটি বাড়ীতে তল্লাসী ও অত্যাচার করবার সময় অম্বু নামে একটি গর্ভবতী নারীকে পুলিস লাঠি দিযে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিল।

নিরুপমা দেবী

নিরুপমা দেবী ১৯৭২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শহব ছেড়ে গ্রামে চলে যান গান্ধীজীর আদর্শে গঠনমূলক কাজ করবার প্রেরণায। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি নদীয়ার সাহেবনগর গ্রামে 'কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা শিক্ষণ শিবির'-এর সঞ্চালিকা ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাহেবনগরে 'কস্তুরবা গ্রামসেবা কেন্দ্র' পরিচালনা করছেন এবং সর্বোদযের আদর্শে গ্রাম-সংগঠন ও ভূদান-যজ্ঞের কাজ ক'রে চলেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মপ্রেরণা অনুকরণযোগ্য।

আশা দাশগুপ্ত ও মাখন দাশগুপ্ত

আশা দাশগুপ্ত ও মাখন দাশগুপ্তের বাড়ী কুমিল্লায়। তাঁদের পিতা সাব-জজ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ঢাকার এক বিপ্লবী দলের সভ্য। তাঁদের একজন আত্মীয় ছিলেন পুলিস-ইন্সপেক্টার। পুলিস-ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে পিস্তল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। পিস্তল সরাবার ইচ্ছায় একদিন এঁরা দুই ভগ্নী একগোছা চাবি নিয়ে ঐ বাড়ীতে যান। ইন্সপেক্টার আফিসে গেছেন। মাখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এক ছুতো ক'রে বেড়াতে চলে গেলেন। আশা অত্যন্ত জরুরী সেলাই করবেন ব'লে ঐ বাড়ীতে রইলেন। তারপর আশা চাবি দিয়ে বাক্স খুলে পিস্তল বার ক'রে নেন। অতি সাবধানে দুই বোনে গিয়ে পিস্তলটি দিয়ে এলেন দলের নেতার হাতে। কিন্তু তাঁরা গ্রেপ্তার হন নাই।

ফুলবাহার বিবি

১৯১৬ সালে ফুলবাহার বিবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুরের সুবাসপুর গ্রামে। তিনি অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তমিজুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। তমিজুদ্দীন ছিলেন কংগ্রেস-কর্মী। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ১৯৩১ সালে কারারুদ্ধ হন।

ফুলবাহার বিবি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকট থেকে দেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেন। তিনি পাইকপাড়ার কিরণ রুদ্রের সঙ্গে আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় তাঁর ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁকে ঢাকা ও বহরমপুরের জেলে কারারুদ্ধ রাখা হয়। মুক্তির পর তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আভা মজুমদার

আভা মজুমদার ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করাতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন।

করুণা ঘোষ (সাহা)

করুণা ঘোষ ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন।

রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন

ময়মনসিংহের দুটি মুসলমান মেয়ে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন অল্প-বয়সেই ১৯৩০—৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। শুধু তাই নয়, ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও নির্যাতন বরণ করেন।

সামছুন্ নেছা বেগম [ঢাকার গোলাম জিলানীর মা],
রওসন্ আরা বেগম [ঢাকার গোলাম জিলানীর স্ত্রী],
রইসা বানু বেগম [ঢাকার আসফ আলি বেগের স্ত্রী],
বদরন্ নেছা বেগম [ঢাকার আক্তার উদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী]

এঁরা ১৯৩০—৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেব সময় সত্যাগ্রহীদের সাধ্যমতো সাহায্য করেন। গোঁড়া ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে সহায়তা ও অর্থসাহায্য করেন। গোলাম জিলানী ১৯৩২ সালেব কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার ফলে ঢাকা জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সময কারাবন্দী অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রোকেয়া বেগম

সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক বোকেযা বেগম ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের বিখ্যাত সাবের পবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য না ক'রে মুস্‌লিম নারী-সমাজের উন্নতির জন্য তিনি সারাজীবন সমাজসেবা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আলোকবর্তিকা বহন ক'রে, অন্ধকারে নিমজ্জিত মুস্‌লিম নারীকে পথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন উদারমনোভাবাপন্ন ও স্ত্রীশিক্ষা-অনুরাগী ছিলেন। স্বামীর নিকট থেকে তিনি সর্বকর্মের প্রেরণা পান।

রোকেয়া বেগমের রচিত পুস্তকের নাম 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন', 'মুক্তিফল' প্রভৃতি।

'মুক্তিফল' পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, নারীর সহায়তা না পেলে একা পুরুষের চেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। 'অবরোধবাসিনী' পুস্তকে তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের যে বেদনাশ্রুর চিত্র তুলে ধরেছেন তা সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানবার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছে। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী। প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসর সমাজের নারীদের মধ্যে দেশানুরাগ জাগাবার যে প্রচেষ্টা তিনি সারাজীবন ধ'রে ক'রে গেছেন তার

মূল্য কম নয়। বর্তমান মুস্‌লিম সমাজের অনেক শিক্ষিতা ও অগ্রণী নারী তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল'-এর ছাত্রী ও তাঁর হাতের তৈরী।

১৯৩২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।



ঢাকা ও ঢাকার গ্রামাঞ্চলে যেসব মহিলা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় সভা-সমিতি ক'রে মহিলাদের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ঃ

১। মুক্তকেশী দেবী (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রূমাতা)
২। সুশীলাসুন্দরী সেন (ঢাকার দীননাথ সেনের কন্যা)
৩। চিন্ময়ী দাস —সোনারং গ্রাম
৪। নবশশী দেবী " "
৫। সুশীলা সেন " "
৬। কমলেকামিনী গুপ্তা —আউটসাহী গ্রাম
(৭৬ বছর বয়সে ১৯৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন।)
৭। প্রিয়বালা গুপ্তা " "
৮। গিরিজা গুপ্তা " "
৯। সুরমা সেন " "

যে-সমস্ত মহিলা ১৯১০ সাল থেকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, তাঁদের পলায়নের ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখা, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ঃ

১। সৌদামিনী দেবী (ফরিদপুর) —১৯১০ সাল থেকে
২। ব্রহ্মময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) —১৯১০ " "
৩। চিন্ময়ী সেন (ঢাকা, বিক্রমপুর) —১৯১০ " "
৪। জগৎতারা সেন (ঢাকা, সোনারগাঁ) —১৯১০ " "
৫। সরোজিনী দেবী (বরিশাল) —১৯১০ " "

৬।	প্রিয়বালা দাশগুপ্ত (বরিশাল)	—১৯১০	সাল	থেকে
৭।	মৃণালিনী দাশগুপ্ত (বরিশাল)	—১৯১০	”	”
৮।	বগলাসুন্দরী দেবী (ঢাকা, চুড়াইল)	—১৯১৪	”	”
৯।	বিন্দুবাসিনী সোম (ঢাকা, বজ্রযোগিনী)	—১৯১৪	”	”
১০।	দুর্গামণি পাইন (ফরিদপুর, হাটুরিয়ার নিশি পাইনের মা, তিনি ঢাকায় স্বগৃহে আটক ছিলেন।)	—১৯১৬	”	”
১১।	অম্বিকা দেবী (ফরিদপুর, পালং)	—১৯২২	”	”
১২।	স্নেহলতা বসু (ঢাকা বাউংভোগ)	—সম্ভবতঃ ১৯২৩	”	”
১৩।	হরবালা ঘোষাল (ছবর্গা)	—১৯৩০	”	”
১৪।	সুষমা দাশগুপ্ত (বরিশাল) (তিনি দুইবার গৃহবন্দী ছিলেন।)	—১৯৩০	”	”
১৫।	সুষমা মজুমদার (ময়মনসিংহ, বারপুর) (তিনি একবার স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন।)	—১৯৩৩	”	”

বিভিন্ন স্থানের নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান ক'রে কারাবরণ করেন ঃ

কলিকাতা (১৯৩০)

১। নির্ঝরিণী সরকার (১৯৩০, ১৯৩২)
২। সরোজবাসিনী সাহা
৩। ছায়ারাণী দেবী
৪। সুরুচি গুহ রায়
৫। পুষ্প নন্দী
৬। লাবণ্য মিত্র
৭। সুন্দর দেবী
৮। গঙ্গা দেবী
৯। কিরণ দেবী
১০। দেশকালী ছেত্রিনী
১১। নারায়ণী কাউর
১২। মলিনা গুপ্ত
১৩। সরযূবালা সেন
১৪। শোভনা রায়
১৫। সুবর্ণ সেন
১৬। গিরিবালা রায়
১৭। কনকলতা দাস
১৮। শতদলবাসিনী দত্ত
১৯। নন্দরাণী ধর
২০। উজ্জয়িনী দেবী

২১। ইন্দুবালা দেবী
২২। দয়াকুল দেবী
২৩। আরতি মুখোপাধ্যায়
২৪। সুনীতি দাস
২৫। হিরণ্ময়ী ঘোষ
২৬। শেখরবাসিনী সাহা
২৭। মায়া নন্দী
২৮। গোদাবরী সেন
২৯। ওয়াজিয়া বাই
৩০। সুপ্রভা দেবী
৩১। সরযূ দেবী
৩২। তারা দেবী
৩৩। ভগবান দেবী
৩৪। যশোদা দেবী
৩৫। লীলাবতী দেবী
৩৬। যমুনা বাই
৩৭। পুষ্প বাই
৩৮। প্রমীলা বাই
৩৯। প্রিয়ম্বদা দেবী
৪০। শৈলবালা দেবী
৪১। কুন্দরাণী সুবিতা
৪২। সুরমা মুখোপাধ্যায় (১৯৩০, ১৯৩২)
৪৩। সুষমা মুখোপাধ্যায় (১৯৩০, ১৯৩২)
৪৪। কমলা বিশ্বাস
৪৫। মথুরা বাই
৪৬। সন্তোষবাসিনী গুহ
৪৭। সোহম্ দেবী
৪৮। বিন্দুবালা দাসী
৪৯। শান্তবালা দাসী
৫০। ক্ষীরোদসুন্দরী দাসী
৫১। মনোরমা দাসী
৫২। অম্বালিকা রায়
৫৩। মানদা সেন
৫৪। সরলা চক্রবর্তী
৫৫। শিউবাসিনী গুহ রায়
৫৬। শান্তা দেবী
৫৭। লাবণ্যপ্রভা দেবী
৫৮। চপলা সেন
৫৯। অম্মা জান
৬০। দুর্গাবতী দাশগুপ্ত (১৯৩০, ১৯৩২)
৬১। কুন্দ মিত্র
৬২। প্রীতিলতা দাস
৬৩। সরলা সরকার
৬৪। সরস্বতী দাশগুপ্ত (মিত্র)
৬৫। অরুণা দাশগুপ্ত
৬৬। অমিতা দত্ত
৬৭। সরযূবালা দত্ত
৬৮। আভা দে
৬৯। ছায়া চট্টোপাধ্যায়
৭০। পুষ্পরাণী নন্দী
৭১। সুরুচি সিংহ রায়
৭২। সরযূ সেন
৭৩। সীতা ঘোষ
৭৪। লক্ষ্মীমণি দেবী
৭৫। বসন্ত বেন
৭৬। যমুনা বেন
৭৭। রতনদেবী জেঠী

৭৮। লক্ষ্মীদেবী কাপুর
৭৯। লক্ষ্মীদেবী শর্মা
৮০। গঙ্গাদেবী মেহতা
৮১। কৌশল্যা বেন
৮২। যজ্ঞেশ্বরী দেবী
৮৩। কৃষ্ণা দেবী
৮৪। দেওকালী দেবী
৮৫। সুন্দর বাই
৮৬। শান্তা বেন
৮৭। প্রমীলা বেন
৮৮। পুষ্পবতী বেন
৮৯। সরস্বতী গুপ্তা
৯০। সজ্জন দেবী মহনোত
৯১। শ্রীমতী মহনোত

কলিকাতা (১৯৩২)

১। জ্যোৎস্না মিত্র
২। গিরিজাবালা দত্ত
৩। রমা দেবী
৪। কুমুদিনী দাসী
৫। ব্রিজরাণী দেবী
৬। কৃষ্ণা মিত্র
৭। রুক্মিণী বেন
৮। হরি বেন
৯। বাচ্চু বেন
১০। সরলাবালা দেবী
১১। রামকুমারী বেন
১২। লক্ষ্মী আচার্য
১৩। বিভা দত্ত
১৪। অনিতা দত্ত
১৫। বিভাবতী দাশগুপ্তা
১৬। কৌশল্যা দেবী
১৭। সজ্জন দেবী
১৮। লক্ষ্মী দেবী
১৯। বাসন্তী দেবী
২০। বীণাপাণি পাল
২১। শীতলকুমারী দেবী
২২। গোদাবরী দেবী
২৩। পদ্মাবতী দেবী
২৪। সুভদ্রা দেবী
২৫। প্রভাবতী দেবী
২৬। হীরামন বিবি
২৭। হাজিমন্নেসা খাতুন
২৮। স্নেহলতা রায়
২৯। সান্ত্বনা রায়
৩০। আভারঙ্গী দেবী
৩১। অনা দেবী
৩২। বিনোদিনী ঘোষ
৩৩। উজ্জম বেন
৩৪। শৈলবালা ঘোষ
৩৫। গৌরী দেবী
৩৬। রাজেশ্বরী দেবী
৩৭। প্রভাবতী সরকার
৩৮। কুঞ্জরাণী দাসী
৩৯। হোসেন্নেসা বেগম
৪০। চন্দ্রাবতী দেবী
৪১। নলিনীবালা মাইতি
৪২। প্রীতিলতা ঘোষ
৪৩। মুন্নী দেবী
৪৪। কমলালক্ষ্মী ঘোষ

৪৫। নলিনীপ্রকাশ ঘোষ
৪৬। সরযূ দেবী
৪৭। গঙ্গাদেবী ক্ষেত্রী
৪৮। কমলা রায়
৪৯। বীণাপাণি সরকার
৫০। চপলাবালা সেন
৫১। সুনীতাবালা দাশগুপ্তা
৫২। সরোজিনী মিত্র
৫৩। রাধারাণী দে
৫৪। সুরারাণী দে
৫৫। অনিমা ভট্টাচার্য
৫৬। বীণা দাশগুপ্ত
৫৭। শান্তি নিয়োগী
৫৮। যামিনীসুন্দরী দাসী
৫৯। তারাদেবী খান্না
৬০। সরোজিনী সেন
৬১। সত্যবালা দাসী
৬২। যশোদাবালা মল্লিক
৬৩। কুমুদিনী মিত্র
৬৪। রাধারাণী দেবী
৬৫। ইন্দুবালা দত্ত
৬৬। কমলিনী দেবী
৬৭। এলোকেশী দাস
৬৮। বীণাপাণি গোস্বামী
৬৯। দনুজদলনী গোস্বামী
৭০। পরিতোষবালা দেবী
৭১। কুশাঙ্গিনী দরাই
৭২। সুশীলাবালা দেবী
৭৩। ননীবালা দেবী
৭৪। লীলাবতী কাপুর
৭৫। দক্ষবালা দেবী
৭৬। মতিবালা দেবী
৭৭। মলিনা দেবী
৭৮। পদ্মা দেবী
৭৯। শহীদা খান
৮০। কমলিনী সরকার
৮১। বীণাপাণি সেতু
৮২। তারাদেবী বিদুষী
৮৩। কমলরাণী সরকার
৮৪। প্রভাবতী দে-সরকার
৮৫। শৈবলিনী দেবী
৮৬। হোসেনারা বেগম

২৪ পরগনা (১৯৩২)

১। শিবকালী দেবী
২। অমলা দেবী
৩। মাতঙ্গিনী করণ

হাওড়া (১৯৩২)

১। সুশীলা দেবী
২। হীরালক্ষ্মী দেবী
৩। লক্ষ্মী বাই
৪। নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। হরিদাসী চট্টোপাধ্যায়
৬। লীলাবতী দেবী
৭। বীণাপাণি দে
৮। কমলিনী সরকার
৯। সুষমা মুখোপাধ্যায়
১০। সুরমা মুখোপাধ্যায়
১১। কুমুদিনী দাসী

১২। সুকুমারী মুখোপাধ্যায়
১৩। করুণাময়ী দেবী

(১৯৩০, ১৯৩২)

হুগলি (৯৩২)

১। চারু দাসী
২। বিনয়বালা দেবী
৩। বরদা দাসী
৪। রতনবালা দাসী
৫। আতরবালা দাসী
৬। এককড়িবালা ঘোষ
৭। বরদাময়ী দাসী

বীরভূম (১৯৩২)

১। সত্যবালা দেবী

বর্ধমান (১৯৩২)

১। বীণাপাণি দেবী
২। সরসীবালা দাসী
৩। নির্মলাবালা সান্ন্যাল
৪। শিবানীবালা দেবী
৫। দুর্গারাণী দেবী
৬। সুবাসিনী চন্দ
৭। জ্ঞানপ্রভা দেবী
৮। কমলেকামিনী দেবী
৯। সুষমা দেবী
১০। মঞ্জুরাণী ঘোষ

বাঁকুড়া (১৯৩২)

১। বসন্তকুমারী দেবী
২। তিনকড়িবালা দাসী
৩। সুহাসিনী দাসী
৪। বিন্দুবাসিনী দাসী
৫। সরোজিনী বাগচী
৬। চারুবালা দাসী
৭। ইন্দুমতী ঘোষ
৮। উষারাণী দেবী
৯। রামদুলালী দেবী
১০। হেমনলিনী দেবী
১১। হিরণ্ময়ী রায়
১২। লক্ষ্মীপ্রিয়া রায়
১৩। চারুবালা দেবী
১৪। সরসী দেবী
১৫। কিরণবালা কর্মকার
১৬। সরযূবালা বাগ্‌লী
১৭। দক্ষবালা দেবী
১৮। রাধারাণী দেবী

নদীয়া (১৯৩২)

১। নির্মলনলিনী ঘোষ
২। অপর্ণা অধিকারী
৩। বিভারাণী দাসী
৪। সুপ্রীতি মজুমদার
৫। সাবিত্রী দেবী
৬। হরিদাসী বৈষ্ণবী
৭। লীলাবতী দেবী
৮। মৃণালিনী দে
৯। উষালতা দেবী
১০। প্রমোদা দাসী
১১। নন্দরাণী বিশ্বাস
১২। সাবিত্রী দাস

১৩। দুর্গারাণী দেবী

১৪। মৃণালিনী সান্ন্যাল

মুর্শিদাবাদ (১৯৩২)

১। জ্যোতির্ময়ী বাগচী

২। বেলারাণী দাসী

৩। প্রেমালা দেবী

৪। কমলা বসু

৫। সরসীবালা দেবী

৬। মৃণালিনী দেবী

৭। কালিদাসী দেবী

৮। কিরণশশী দেবী

৯। কমলা দেবী

১০। হেমনলিনী চৌধুরী

১১। আশালতা দেবী

১২। বীণাপাণি দেবী

যশোহর (১৯৩২)

১। ঊষারাণী ঘোষ

২। মনোরমা বসু

৩। সরোজিনী ঘোষ

৪। রাজপ্রিয়া ঘোষ

৫। শৈলবালা ঘোষ

৬। শৈলবালা আশ

৭। বনলতা বসু

৮। অমিয়ারাণী ধর

৯। হেমনলিনী ঘোষ

১০। সরোজিনী দে

১১। তরুলতা মারিক

১২। কালিদাসী বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলনা (১৯৩২)

১। চারুবালা বসু

বরিশাল (১৯৩২)

১। সরযূবালা সেন

২। লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত

৩। লাবণ্যপ্রভা দত্ত

৪। গোলাপবাসিনী দাস

৫। মনোরমা বসু

৬। শৈলবালা দাস

৭। যোগমায়া দত্ত (১৯৩২, ১৯৪২)

বরিশাল (১৯৪২)

১। সুনীতিবালা দাস

২। পূর্ণলক্ষ্মী চক্রবর্তী

৩। নির্মলা ঘোষ

৪। মানদাসুন্দরী আইচ

৫। কিরণবালা মুখোপাধ্যায়

৬। মায়া গুপ্তা

৭। সুষমা মুখোপাধ্যায়

৮। হাসি সেন

৯। সরলাবালা রায়

নোয়াখালি (১৯৩২)

১। কমলকামিনী ঘোষ

২। কিরণপ্রভা চৌধুরী

৩। বনলতা সরকার

চাঁদপুর (১৯৩২)

১। বিভাবতী ঘোষ

ঢাকা (১৯৩২)

১। কিরণবালা কুশারী

২। বিরজাসুন্দরী বসু
৩। সরোজিনী ঘোষ
৪। অনুপমা ঘোষ
৫। উষাবালা দেবী
৬। সরোজিনী দত্ত
৭। কুসুমকুমারী ঘোষ
৮। সরোজিনী সরকার
৯। স্বর্ণমঙ্গলা দেবী
১০। সুখলতা দাশগুপ্ত
১১। সুরবালা দে
১২। রাধারাণী সাহা
১৩। কিরণবালা সাহা
১৪। প্রতিভা সেন
১৫। ব্রজবালা দেবী
১৬। ছায়া রায়
১৭। লাবণ্যপ্রভা গুহ
১৮। কুসুমকামিনী ঘোষ
১৯। হেমনলিনী গঙ্গোপাধ্যায়
২০। কমলা দেবী
২১। গিরিবালা ঘোষ
২২। শোভনাময়ী সরকার
২৩। প্রভাবতী রায়
২৪। সরযূবালা দেবী
২৫। হেমনলিনী সেন
২৬। নীহারকণা ঘোষ
২৭। চারুবালা দে সরকার
২৮। নৈশপ্রভা দেবী
২৯। মৃণালিনী দেবী
৩০। সরলা দেবী
৩১। হিরণ্ময়ী ঘোষ
৩২। উত্তমা মজুমদার
৩৩। সর্বসুন্দরী পাল
৩৪। সরোজিনী দে
৩৫। তরুবালা পাল
৩৬। শান্তিবালা কর
৩৭। হেমলতা আচায
৩৮। চপলা দেবী
৩৯। মাখনবালা সবকার
৪০। সুরুচি দেবী
৪১। সরমা মুখোপাধ্যায়
৪২। হেমাঙ্গিনী দেবী (২ জন)
৪৩। সুহাসিনী দেবী
৪৪। হিরণবালা দেবী
৪৫। প্রভা সেন
৪৬। সুরবালা সেন
৪৭। সুরবালা দাশগুপ্ত
৪৮। প্রভাবতী দেবী
৪৯। নগেন্দ্রবালা সেন
৫০। বিধুমুখী সোম
৫১। মানদা দেবী
৫২। লাবণ্য দাশগুপ্তা
৫৩। সরযূবালা সরকার
৫৪। প্রভাবতী চন্দ
৫৫। জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী
৫৬। সুরবালা দেবী
৫৭। কাদম্বিনী দেবী
৫৮। প্রভাবতী সরকার
৫৯। পারুলবালা সরকার
৬০। অমিয়বালা সরকার
৬১। সর্বমঙ্গলা দেবী

৬২। সুনীতি সেনগুপ্তা
৬৩। সৌদামিনী শীল
৬৪। ইন্দুমতী দেবী
৬৫। সুতৃষ্ণা বসু
৬৬। চিন্ময়বালা বসু
৬৭। মনোরমা বর্ধন
৬৮। সুহাসিনী সোম
৬৯। জ্যোৎস্নাময়ী মিত্র
৭০। মমতাবালা দে
৭১। টগরবালা সরকার
৭২। স্নেহলতা দেবী
৭৩। হেমনলিনী দেবী
৭৪। সুহাসিনী দাস
৭৫। জগত্তারা দেবী
৭৬। কামিনীবালা দেবী
৭৭। সাবিত্রীবালা দাস
৭৮। প্রিয়বালা দেবী
৭৯। শরৎকামিনী সরকার
৮০। হেনারাণী মজুমদার
৮১। জ্ঞানদাসুন্দরী রুদ্র
৮২। হেমাঙ্গিনী রুদ্র
৮৩। পুটু দে সরকার
৮৪। কিরণবালা দেবী
৮৫। সুরমা মুখোপাধ্যায়
৮৬। নীহারমালা গঙ্গোপাধ্যায়
৮৭। মোক্ষদাসুন্দরী দে
৮৮। যশোদাসুন্দরী দে
৮৯। অবলাবালা দে
৯০। প্রমদাসুন্দরী দেবী
(ওরফে নির্মলা দে)
৯১। শান্তিবালা গুপ্তা
৯২। ষোড়শীবালা দে
৯৩। মানদা মল্লিক
৯৪। উত্তমা ধুপী
৯৫। বিজনবালা দে
৯৬। সুহাসিনী দত্ত
৯৭। চপলা দত্ত
৯৮। সরযূবালা দত্ত
৯৯। কামিনীবালা দত্ত
১০০। পূর্ণিমা দে
১০১। কামিনী দে
১০২। জ্ঞানদা দে
১০৩। প্রমদা দাস
১০৪। নির্মলা দাস
১০৫। মহামায়া দত্ত
১০৬। সুধাবালা দত্ত
১০৭। সুরবালা গুপ্তা
১০৮। শৈবলিনী দাস
১০৯। সুষমা দাস
১১০। শোভারাণী দত্ত
১১১। বীণাপাণি দেবী
১১২। সুনীতি দে
১১৩। বিনোদা দে
১১৪। বাসন্তী দেবী
১১৫। সুকুমারী শীল
১১৬। হিরণপ্রভা সরকার
১১৭। বাসন্তী ঘোষ
১১৮। মৃণালিনী দে
১১৯। শান্তিবালা সেন
১২০। নয়নবালা গুহ

১২১। আশালতা দে
১২২। বিন্দুবাসিনী দেবী
১২৩। সরযূ মুখুটি
১২৪। মনোরমা দাশগুপ্তা
১২৫। প্রমদাসুন্দরী সেন
১২৬। সুবর্ণময়ী সরকার
১২৭। শান্তমণি ভাওয়াল
১২৮। বাইসুন্দরী দেবী
১২৯। ক্ষ্যান্তকালী দেবী
১৩০। সুকুমারী দত্ত
১৩১। আশালতা দেবী
১৩২। রণদক্ষিণা দাস
১৩৩। ক্ষীরোদাসুন্দরী দাস
১৩৪। কুসুমকুমারী দেবী
১৩৫। স্নেহলতা নাগ
১৩৬। হরিদাসী দে
১৩৭। হরিদাসী দত্ত
১৩৮। প্রভাসলক্ষ্মী দেবী
১৩৯। শরৎকামিনী দে
১৪০। সুমতিবালা দে
১৪১। ইচ্ছাময়ী দেবী
১৪২। স্নেহলতা রায়
১৪৩। ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়
১৪৪। প্রফুল্লবালা কুণ্ডু
১৪৫। মনোবাসিনী দেবী
১৪৬। সুনীতিবালা কর
১৪৭। কনকপ্রভা রায়
১৪৮। হেমলতা আচার্য
১৪৯। হরিদাসী দেবী
১৫০। সুরধুনী দেবী
১৫১। স্নেহলতা বসু
১৫২। হিরণ্ময়ী গুহ
১৫৩। সরোজবালা মজুমদার
১৫৪। শচীরাণী দেবী
১৫৫। কিরণবালা দেবী

কুমিল্লা (১৯৩২)

১। গীতারাণী ভৌমিক
২। হিরণ্ময়ী দেবী
৩। অমিয়া রায়
৪। উষারাণী পালিত
৫। সাধনা সরকার
৬। শান্তশীলা পালিত
৭। সুহাসিনী মুখোপাধ্যায়
৮। নির্মলা সরকার
৯। চারুশীলা দেবী
১০। অরুণা মজুমদার
১১। সরযূ বসু
১২। স্নেহলতা পাল
১৩। নবনীতকোমলা সিংহ
১৪। বিভাবতী চৌধুরী

পাবনা (১৯৩২)

১। কুসুমবালা ঘোষ
২। রেবারাণী চন্দ
৩। সরোজনলিনী দত্ত
৪। কুমুদিনী ঘোষ
৫। হেমপ্রভা দেবী
৬। প্রভারাণী দেবী
৭। বিভারাণী দাস

রংপুর (১৯৩২)

১। সুমতিবালা সমাদ্দার
২। দক্ষবালা দাসী
৩। অর্চনা প্রামাণিক
(তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলেও ১৯৪৭ সালে কাজ করেন।)
৪। শান্তিবালা দেবী
৫। অমিয়ারাণী দেবী
৬। মহামায়া দেবী
৭। জ্যোতির্ময়ী দেবী
৮। সুধারাণী সরকার
৯। বীণা সরকার
১০। চারুবালা ভট্টাচার্য
১১। বেলারাণী রায়
১২। আশালতা দেব
১৩। প্রিয়বালা দেব

রংপুর (১৯৪২): অন্তরীণ

১। অমিতারাণী চৌধুরী
২। শেলী দেব
৩। বেলা ভট্টাচার্য
৪। মালতী ভট্টাচার্য
৫। শতদল বসু সরকার

মেদিনীপুর (১৯৩০)

১। ননীবালা দাস
২। অনুরূপা দাস
৩। শতদল অধিকারী
৪। স্বরূপা দাস
৫। সবিতা বসু
৬। চারুশীলা সেন
৭। সুষমা সেন
৮। কমলা বাগ্‌দী
৯। ননীবালা মাইতি
১০। মাখন দাসী
১১। বসন্ত মণ্ডল
১২। নিবারণ দাসী

মেদিনীপুর (১৯৩২)

১। সত্যবালা দাসী (অত্যাচারিত)
২। ইন্দুমতী দেবী
৩। সুহাসিনী দেবী
৪। সুখদা রায়চৌধুরী
৫। লক্ষ্মীরাণী দেবী
৬। কুসুমকুমারী মণ্ডল
৭। বাসনবালা মাইতি
৮। হেমন্তবালা ঢোং
৯। পঞ্চমী ডালনী
১০। ভূতিবালা ডালনী
১১। মগনবালা মাল
১২। কিরণবালা মাইতি
১৩। বসন্তবালা করক
১৪। নীরবালা রায়
১৫। সুবোধবালা কুইতি
১৬। শুভঙ্করী দেবী
১৭। ধীরেনবালা ভুঁইয়া
১৮। চারুশীলা জানা
১৯। চিকণবালা দাসী
২০। কিরণবালা বেরা

২১। চারুবালা পালিত
২২। সৌদামিনী পাহাড়ী
২৩। মায়ালতা দাস
২৪। যমুনাবালা দেবী
২৫। চারু মাঝিনী
২৬। অবনীবালা মাঝিনী
২৭। সরযূবালা দাসী
২৮। মনোরমা দাসী
২৯। সরযূশোভনা বসু
৩০। শতদল দেবী
৩১। বিরাজমোহিনী মাইতি
৩২। মাতঙ্গিনী দাসী
৩৩। ননীবালা দাস
৩৪। হরিপ্রিয়া দেবী
৩৫। সরোজিনী গিরি
৩৬। দময়ন্তী গিরি
৩ । সুষমা পালিত
৩৮। নীরদা দাসী
৩৯। বিজনবালা দাসী
৪০। রাসমণি মাঝিনী
৪১। গঙ্গামণি জানা
৪২। বসন্তকুমারী বেরা
৪৩। লক্ষ্মীরাণী দেবী
৪৪। গিরিবালা হাজরা
৪৫। জ্ঞানদাবালা বার
৪৬। বিন্দুবালা দে
৪৭। সত্যভামা জানা
৪৮। সন্ধ্যাময়ী পাহাড়ী
৪৯। যমুনা বেওয়া
৫০। কিরণশশী দত্ত
৫১। সুশীলাবালা দে
৫২। কুসুমকুমারী মণ্ডল
৫৩। যামিনীবালা সেন
৫৪। জানকী দাসী
৫৫। বন বিবি
৫৬। সার দাসী
৫৭। সজনী দাসী
৫৮। রোহিণী দাসী
৫৯। বসন্ত দাসী
৬০। কুসুম বাগ্‌দী
৬১। পদ্মা দাসী
৬২। বিদ্যুৎ দাস

মেদিনীপুর (১৯৪২)

১। ললিতা দেবী
২। শৈল দাসী
৩। ননীবালা মাইতি
৪। গিরিবালা ভুঁইয়া

শ্রীহট্ট (১৯৩২)

১। হীরাপ্রভা চৌধুরী
২। সুরপ্রভা দেব
৩। প্রভাবতী ধর
৪। সুপ্রবাসিনী দেব
৫। সুকেশিনী দেব
৬। সরোজবালা সেন
৭। সুষমা দাস
৮। মহামায়া দাস (৭০ বৎসর)
৯। ইন্দ্রমণি দেবী (৮০ বৎসর)
১০। নলিনীবালা মিশ্র

১১। সুচিত্রাময়ী দাস
১২। চারুবালা সেন
১৩। নিত্যময়ী দেবী
১৪। কারুণ্যময়ী দেবী
১৫। বিন্দুবাসিনী দাস
১৬। সুরবালা দেব
১৭। গিরিবালা দেব
১৮। কনকলতা নাগ
১৯। সুরবালা দেবী
২০। সরোজবালা দাস
২১। চারুবালা দেবী
২২। শিশিরকণা বিশ্বাস
২৩। সুনীতিবালা দাস
২৪। সরোজিনা পাল
২৫। গিরিবালা গুপ্তা
২৬। মোহিনীবালা সরকার
২৭। কিরণবালা দেবী
২৮। বিনোদিনী পাল
২৯। সৌদামিনী পাল
৩০। চরিত্রবালা নমঃশূদ্র
৩১। বিলাসময়ী কর।
৩২। মাতঙ্গিনী দাস
৩৩। শশীপ্রভা দেব
(ভানুবিল সত্যাগ্রহ)
৩৪। চারুশীলা দেব
(ভানুবিল সত্যাগ্রহ)
৩৫। গিরিবালা দত্ত
৩৬। সরযূবালা দত্ত
৩৭। শৈলবালা দেব
৩৮। হেমন্তকুমারী দেব
৩৯। বসন্তকুমারী দেব
৪০। তারকসুন্দরী পাল।

শ্রীহট্ট (১৯৪২)

১। সুহাসিনী দাস
২। সুনীতিবালা দেব
৩। প্রফুল্লকুমারী দত্ত
৪। যামিনীবালা দাস
৫। হিরণবালা দেবী
৬। ঊষারাণী দাস
৭। উমা চক্রবর্তী
৮। লীলাবতী দত্ত
৯। সুখদা পাল
১০। স্নেহলতা দেব
১১। শোভনা দেব

নিম্নলিখিত মহিলাগণ ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী ছিলেন (আশালতা সেন প্রদত্ত):

১। উষাবালা দত্ত
২। ষোড়শীবালা দত্ত
৩। কুমুদিনী ঘোষ
৪। চারুশীলা পাল
৫। রতনবালা দাসী
৬। ননীবালা রায়
৭। কিশোরীবালা দাসী
৮। রাধারাণী দাসী
৯। নির্মলা দাসী
১০। মাখনবালা
১১। উষারাণী ঘোষ
১২। হেমনলিনী ঘোষ
১৩। কিরণশশী দেবী
১৪। অনুপমা দেবী
১৫। পারুল দত্ত
১৬। কুসুম দাসী
১৭। ক্ষ্যান্তমণি দেবী
১৮। কুমারীবালা
১৯। রাণীবালা
২০। লিচুবালা
২১। সুশীলা দে
২২। কাননবালা পট্টনায়ক
২৩। চারু পালিত
২৪। মেনকা দেবী
২৫। নীরজনলিনী দে
২৬। সাবিত্রী দেবী
২৭। সত্যরাণী হালদার
২৮। সুনীতি সেন
২৯। মহামায়া ঘটক
৩০। সন্তোষ পাল
৩১। যোগিনী পাল
৩২। শৈলসুতা সরকার
৩৩। সিন্ধুবালা কোলে
৩৪। সুনীতি দাশগুপ্ত
৩৫। বিভাবতী দাস
৩৬। সুমিত্রা দেবী
৩৭। রতনমণি দেবী
৩৮। রাধারাণী মণ্ডল
৩৯। চপলা দেবী
৪০। ভানুমতী বিশ্বাস
৪১। রোহিতকুমারী বিশ্বাস
৪২। বৈদ্যবালা মজুমদার
৪৩। শ্রীমতী ঘোষ

—

যা-কিছু পড়ে নিয়েছি

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
১। বেথুন কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল সেন্টিনারী ভলিউম	সম্পাদক—ডঃ কালিদাস নাগ	১৯৫০ খ্রীঃ	বেথুন কলেজ ও স্কুল সেন্টিনারী কমিটি
২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী	গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	১৯২৭ খ্রীঃ	কলিকাতা ইউনিভার্সিটি
৩। নিবেদিতা	মণি বাগচি	১৯৫৫ খ্রীঃ	প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
৪। নিবেদিতা (লিজেল রেমঁ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তক থেকে অনুবাদ)	অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী	অনুবাদ—১৩৬২ বঙ্গাব্দ	প্রধান বিক্রয়-প্রতিনিধি—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
৫। মানুষ চিত্তরঞ্জন	অপর্ণা দেবী	১৩৬১ বঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং
৬। হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (১৮৮৫—১৯৩৫)	ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া	১৯৩৫ খ্রীঃ	পদ্মা পাব্লিকেশনস লিমিটেড, বোম্বাই

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৭। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অথবা রাউলাট রিপোর্ট ১৯১৮	কমিটির প্রেসিডেন্ট—মিঃ রাউলাট, এবং সেক্রেটারী—মিঃ জে. ডি. ভি. হজ	১৯১৮ খ্রীঃ	সুপারিনটেণ্ডেন্ট, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং কর্তৃক মুদ্রিত, ৮ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা
৮। রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬১ বঃ	বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত কুটির, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর
৯। দি লিবারেটার শ্রীঅরবিন্দ—ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ওয়ার্লড	শিশিরকুমার মিত্র	১৯৫৪ খ্রীঃ	জেইকো পাব্লিশিং হাউস
১০। ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ	উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৯৫০ খ্রীঃ	জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির, আড়বালিয়া, ২৪ পরগনা
১১। বিপ্লবী বাংলা (১৭৫৭—১৯১২)	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী		মিত্রালয়
১২। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ	ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩৫৪ বঃ, ভাদ্র	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
১৩। শহীদ যুগল (প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর জীবনচরিত)	নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	১৩৫৫ বঃ, ১লা আশ্বিন	বি. সিংহ ব্রাদার্স
১৪। মুক্তির সন্ধানে ভারত	যোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৫২ বঃ	সলিলকুমার মিত্র

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কাযবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
১৫। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী	যোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৬১ বঃ, ভাদ্র	পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
১৬। ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৩৫৪ বঃ	ভারত বুক এজেন্সি
১৭। ভারতের বিপ্লব-কাহিনী	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১৯৪৮ খ্রীঃ	নিউ মদন প্রেস
১৮। গান্ধীজীস্ করেস্পন্ডেন্স উইথ দি গভর্নমেণ্ট ১৯৪৪—৪৭		১৯৫৯ খ্রীঃ	নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, আমেদাবাদ
১৯। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ইন তমলুক (মিদ্নাপুর) ১৯৩২-৩৩	তমলুক সাব-ডিভিসন ওয়ার কাউন্সিল		
২০। অগাস্ট রেভলিউশান অ্যাণ্ড টু ইয়ার্স ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট ইন মিদ্নাপুর, পার্ট ওয়ান (তমলুক)	(ক) সতীশচন্দ্র সামন্ত (খ) শ্যামাদাস ভট্টাচার্য (গ) অনঙ্গমোহন দাস (ঘ) প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৯৪৬ খ্রীঃ	ওরিয়েণ্ট বুক কোং

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
২১। রেবেল ইণ্ডিয়া	(ক) বিজন মিত্র (খ) ফণী চক্রবর্তী	১৯৪৬ খ্রীঃ	ওরিয়েন্ট বুক কোং
২২। জীবনের ঝরাপাতা (আত্মজীবনী)	সরলা দেবী চৌধুরাণী	১৯৫৮ খ্রীঃ	শ্রী সরস্বতী প্রেস
২৩। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৩৬৩ বঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং, প্রাইভেট লিমিটেড
২৪। বিপ্লবের পদচিহ্ন	ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	১৯৫৩ খ্রীঃ	সরস্বতী লাইব্রেরী
২৫। নমামি	জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী	১৩৯৬ বঃ	শ্রী বিমলারঞ্জন প্রকাশন
২৬। বাংলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ	১৩৬১ বঃ, বৈশাখ	এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা
২৭। বিপ্লবের পথে	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত	১৯৫৮ খ্রীঃ	উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস
২৮। শহীদ স্মৃতিকথা	ঢাকা জিলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি কর্তৃক প্রণীত	১৯৫৭ খ্রীঃ, মার্চ	সমিতির পক্ষ হ'তে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
২৯। শৃঙ্খল ঝঙ্কার	বীণা দাস	১৩৫৫ বঃ, বৈশাখ	সিগনেট প্রেস
৩০। অরুণ বহ্নি	শান্তি দাস	১৩৫৮ বঃ, জৈষ্ঠ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
৩১। জীবন অধ্যয়ন	কল্যাণী ভট্টাচার্য	১৯৫৪ খ্রীঃ	অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
৩২। রক্তের অক্ষরে	কমলা দাশগুপ্ত	১৩৬১ বঃ	নাভানা পাব্লিশার্স
৩৩। অন্তঃপুর (মাসিক পত্রিকা, প্রথম প্রকাশিত ১৮৯৭ সালে। তখনকার দিনের মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র। অনেক বৎসর পর্যন্ত কেবল মহিলাগণই এতে লিখতেন।)	প্রথম সম্পাদিকা—বনলতা দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদিকা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী	১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিল প্রথম প্রকাশ। তারপর অনেক বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।	অন্তঃপুর আফিস—৩২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩৪। তথ্যাবলী সংগ্রহ (১৯০৫ খ্রীঃ হ'তে ১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত)	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত তথ্য লেখিকাকে প্রদত্ত		

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকা হ'তে সংগৃহীত বিভিন্ন কাটিং	আশালতা সেন কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত	১৯৩৮-৩৯ খ্রীঃ	
৩৬। অবরোধবাসিনী	বেগম রোকেয়া হোসেন		
৩৭। বেগম (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ঢাকা—'সাহিত্যিক রোকেয়া'	বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ রচিত 'রোকেয়া জীবনী' থেকে সংকলিত	৮. ১২. ৫৭ খ্রীঃ	ঢাকা থেকে
৩৮। লোকসেবক (পূজা-সংখ্যা) —'সরলা দেবী চৌধুরানী'	সম্পাদক পঞ্চানন ভট্টাচার্য	পূজা-সংখ্যা, ১৩৬৩	
৩৯। দেশ—'প্রবাসীর পত্র ১৮৬৩-৬৪ : দুইখানা পত্র'	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লণ্ডন হ'তে লিখিত	চিঠি লিখবার তাং ১৬.১১.১৮৬৩ এবং ১৮.১.১৮৬৪ খ্রীঃ	
৪০। কলিকাতা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি (মুদ্রিত কার্যবিবরণী)	সম্পাদিকা—বিমলপ্রতিভা দেবী	১৯৩০-এর ১৩ই মার্চ হ'তে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত	

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৪১। ঢাকা সত্যাগ্রহী সেবিকা দল (মুদ্রিত কার্যবিবরণী ১৯৩০—৩৪)	'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল'-এর সম্পাদিকা—আশালতা সেন	১৯৩০—৩৪ সালের কার্যবিবরণী	ঢাকা সত্যাগ্রহী সেবিকা দল কর্তৃক প্রকাশিত
৪২। শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ—দ্বিতীয় বর্ষের মুদ্রিত কার্যবিবরণী (১৯৩০—৩৪)	সরলাবালা দেব—সম্পাদিকা; সমিতির সম্পাদিকাও তিনি।		
৪৩। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপন্থা (মুদ্রিত)		১৯৪২ সালের আন্দোলনের পরে	শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষে মহম্মদ মোবারক কর্তৃক প্রকাশিত।
৪৪। কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি—মুদ্রিত কার্যবিবরণী, ১৩৩৭-৩৮	সমিতির সম্পাদিকা—সুরমা দেবী		সুরমা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত
৪৫। দেশ—'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলায় স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ'	পুলিনবিহারী সেন		
৪৬। মন্দিরা—'বাংলার একমাত্র মহিলা স্টেট-প্রিজনার'	কমলা দাশগুপ্ত	১৩৫৮ বং, কার্তিক	

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কাযবিবরণীব নাম	লেখকের নাম	প্রকাশেব তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৪৭। শারদীয়া দৈনিক কৃষক, ১৩৫৪—'বাংলার রাজনীতিতে নারী'	বীণা দাস	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৪ বঃ	
৪৮। জয়শ্রী—'রেণু সেন'	লীলা রায়	১৩৪৮ বঃ, শ্রাবণ	
৪৯। মহিলা মহল—" '৪২ সালের মুক্তিসংগ্রামে বাংলার নারী"	সাবিত্রী ঘোষাল	১৩৫৪, ১লা ভাদ্র	
৫০। 'বাংলার বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা'	প্রবন্ধটি নাট্যকার মন্মথ রায় কর্তৃক প্রহ্লাদ প্রামাণিকেব নিকট থেকে সংগৃহীত এবং তার নকল লেখিকাকে প্রদত্ত।	২২. ১২. ৫৭ তাং লেখিকাকে প্রদত্ত	
৫১। 'শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা'	প্রবন্ধটি গুণধর ভৌমিক কর্তৃক লেখিকাকে প্রেরিত।	৬. ৩. ৫৮ তারিখে প্রেরিত।	
৫২। আনন্দবাজার পত্রিকা হ'তে সংগৃহীত বিভিন্ন কাটিং	নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত	১৯৩৩-৩৪ খ্রীঃ	

পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কার্যবিবরণীর নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশক অথবা মুদ্রাকরের নাম
৫৩। নিম্নলিখিত স্থানের জেল রেকর্ড হ'তে প্রাপ্ত মহিলা-বন্দীদের নামের তালিকা : (ক) মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল (খ) বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল (গ) প্রেসিডেন্সি জেল (ঘ) হুগলি জেল (ঙ) কৃষ্ণনগর জেল (চ) বর্ধমান জেল (ছ) দার্জিলিং জেল (জ) হাওড়া জেল (ঝ) কাটোয়া সাব-জেল (ঞ) বিষ্ণুপুর সাব-জেল (ট) শ্রীরামপুর সাব-জেল (১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালের মুক্তি-সংগ্রামে এঁরা বন্দী হন।)	জেল-বিভাগীয় মন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিভিন্ন জেল-রেকর্ড হ'তে বন্দীদের নামের তালিকা সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত। এইসমস্ত বন্দীগণের যিনি যে জেলার অধিবাসী, লেখিকা সেইভাবে তাঁদের নাম সাজিয়ে লিখেছেন। তাই পূর্ববঙ্গের মহিলাগণেরও অনেক নাম এখানে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জেল রেকর্ড পাওয়া সম্ভব নয় ব'লে ঐদিককার জেলের বন্দী-দের নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই।		

কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত

পরলোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত
১। সরলা দেবী চৌধুরানী	সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরা-পাতা', 'দেশ', 'লোকসেবক' (পূজা-সংখ্যা) ও অন্যান্য পুস্তক থেকে তথ্য সংগৃহীত।
২। ঊর্মিলা দেবী	অপর্ণা দেবী লিখিত 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' নামক পুস্তক ও অন্যান্য স্থান হ'তে তথ্য সংগৃহীত।
৩। মোহিনী দেবী	মোহিনী দেবীর পুত্র জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
৪। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রধানতঃ সংগৃহীত। বীণা দাস লিখিত 'বাংলার রাজনীতিতে নারী' (শারদীয়া 'দৈনিক কৃষক', ১৩৫৭) নামক প্রবন্ধ থেকে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ দুই দিনের ঘটনার কিছু অংশ সংগৃহীত।
৫। দীনেশ মজুমদার (কল্যাণী দাসের জীবনীতে)	দীনেশ মজুমদারের পলাতক জীবনের তথ্য বিবৃত করেন—তাঁর পলাতক জীবনের সঙ্গী, পলাতক বন্ধু নলিনী দাস। নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত প্রদত্ত 'আনন্দবাজার'-এর কাটিং হ'তে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, রসিকলাল দাস, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী দাস কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করেন। দীনেশ মজুমদার লেখিকার রাজনৈতিক সতীর্থ।
৬। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার	প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের ভগ্নী কনকলতা চৌধুরী কর্তৃক বিবৃত ও লিখিত জীবনী থেকে অংশতঃ, এবং ধলঘাটের কাহিনী ব্রজেন সেন কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী থেকে গৃহীত হয়েছে। পাহাড়তলী ক্লাবের ঘটনার পূর্বদিনে প্রীতিলতা কর্তৃক তাঁর মাতাকে লিখিত শেষ পত্রখানি ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত।

পবলোকগতগণেব নাম	কোথা থেকে জীবনীব তথ্য স গৃহীত
৭। সূর্য সেন (কল্পনা দত্তেব জীবনীতে)	প্রধানতঃ ব্রজেন সেনেব নিকট থেকে ভূপেন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও লেখিকাকে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এবং অংশতঃ কল্পনা দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি অনুসাবে লিখিত।
৮। সাবিত্রী দেবী	পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত লিখিত 'বিপ্লবেব পথে' নামক পুস্তক থেকে এবং ব্রজেন সেন কর্তৃক প্রদত্ত বিববণী ও অন্যান্য কযেকজনেব বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
৯। প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম	প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মেব ভাই ননীগোপাল ব্রহ্ম কর্তৃক পাবিবাবিক ও শান্তি ঘোষ (দাস) কর্তৃক বাজনৈতিক জীবনেব তথ্য বিবৃত।
১০। শোভাবাণী দত্ত	শোভাবাণী দত্তেব জীবনী তাব মাতা লাবণ্যপ্রভা দত্ত, মনোবঞ্জন গুপ্ত, মনোবঞ্জন বায, ভূপেন্দ্রকুমাব দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদাব (বক্ষিত বায) প্রভৃতি কর্তৃক বিবৃত। শোভাবাণী লেখিকাব বন্ধু। 'শোভাবাণী দত্ত মহাপ্রযাণ' নামক পুস্তিকা থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।
১১। বনলতা দাশগুপ্ত	বনলতা দাশগুপ্তেব ভাই জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত। লেখাব পব বীণা দাস (ভৌমিক) লেখাটি প'ড়ে ঠিক ক'বে দিয়েছেন।
১২। রেণু সেন (বসু)	রেণু সেন-এব (বসু-ব) মাতা কুসুমকণা সেন কর্তৃক পাবিবাবিক এবং 'জয়শ্রী'তে লীলা রায় লিখিত প্রবন্ধ থেকে বাজনৈতিক জীবনেব তথ্য সংগৃহীত।
১৩। আভা দে	কল্যাণী ভট্টাচার্য লিখিত 'জীবন অধ্যয়ন' নামক পুস্তক থেকে কিছু কাহিনী সংগৃহীত। আভা দে লেখিকাব বন্ধু ও জেলেব সতীর্থ ছিলেন।

পরলোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত
১৪। সরোজ আভা চৌধুরী (নাগ)	সরোজ আভা চৌধুরীর (নাগের) স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ নাগ কর্তৃক বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৫। সুরমা দেবী	সুরমা দেবীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৬। সরমা গুপ্তা	আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৭। সরযূ গুপ্তা	আশালতা সেন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
১৮। মাতঙ্গিনী হাজরা	মাতঙ্গিনী হাজরার প্রারম্ভিক জীবন এবং ১৯৩০—৩২ সালে আন্দোলনে যোগদানের কাহিনীর তথ্য অনেকাংশে পাওয়া গিয়েছে—(ক) 'বাংলার বীব রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা' প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি নাট্যকাব মন্মথ রাব কর্তৃক প্রহ্লাদ প্রামাণিকের নিকট থেকে সংগৃহীত এবং তার নকল লেখিকাকে প্রদত্ত) এবং—(খ) 'শহীদ মাতঙ্গিনী হাজবা' নামক প্রবন্ধ থেকে (প্রবন্ধটি গুণধর ভৌমিক কর্তৃক লেখিকাকে প্রদত্ত)। কিন্তু মাতঙ্গিনী হাজরার জীবনে ১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী এবং ১৯৩৯ সাল থেকে মেদিনীপুরে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ১৯৪২ সালের আন্দোলনের বিবরণ ইত্যাদি *August Revolution and Two Years National Govt. in Midnapore* নামক পুস্তক থেকে বহুলাংশে সংগৃহীত হয়েছে।
১৯। বেলা মিত্র	বেলা মিত্রের স্বামী হরিদাস মিত্র কর্তৃক বিবৃত ও প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত। তাঁর জীবনীতে গান্ধীজীর চিঠিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে—*Gandhiji's Correspondence with the Government 1944—47* নামক পুস্তক থেকে।

পরলোকগতগণের নাম	কোথা থেকে জীবনীর তথ্য সংগৃহীত
২০। শশীবালা দাসী	'রেবেল ইণ্ডিয়া' পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে যে নিহত ও আহত বীরদের নামের তালিকা আছে সেখান থেকে তথ্য সংগৃহীত।
২১। চামেলী দেবী	সীতারামজী সাক্সেরিয়া কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত।
২২। সিন্ধুবালা দেবী	ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিবৃত তথ্য থেকে সংগৃহীত। সিন্ধুবালা দেবী জীবিত আছেন কিনা জানা যায়নি।